স্বপ্নে নদীর খোঁজ

সুকান্তি দত্ত

করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭০

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮ এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

অক্ষর বিন্যাস :
এস. ডি. প্রিন্টার্স
মধ্যমগ্রাম
কলকাতা-১২৯

প্রচ্ছদ :
দেবাশীষ রায়

মুদ্রাকর :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণি
কলকাতা-৪

সুহৃদয় সাহিত্যিক

শ্রী কিন্নর রায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

গল্পক্রম

এই লেখকের অন্যান্য বই :

গল্পগ্রন্থ

- দহনবেলার পাণ্ডুলিপি
- আলাদিন, ও আলাদিন

উপন্যাস

- যুধান কথা
- বৃষ্টি অবৃষ্টি

জনৈক চরিত্রহীনের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন

স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলে তুমি।

জেগে ওঠা? জেগে ওঠা বলা যায় কি? স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে, যে স্বপ্ন ঘুমের ভেতর দেখা হয়, পৃথিবীর তাবৎ সফল, কৃতী, মহাকর্মী মানবপুত্ররা বাস্তবে ফিরে আসে, কিন্তু তোমার কোন বাস্তব নেই। শুধু আছে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন থেকে ফের আরেক স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নে পাড়ি দেওয়া। তা ছাড়া, তুমি শুধু ঘুমিয়েই নয়, জেগেও স্বপ্ন দ্যাখো, নয় কি?

তোমার স্বপ্ন-জাহাজ যাত্রাপথে ক্ষণিক বিরতির মুহূর্তে যে বন্দরে নোঙর করে তাও কি স্বপ্ন নয়?

জেগে ওঠা নয়, বরং বলা যায় তোমার এক স্বপ্নের ছেদ হল, ফের নতুন কোন স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের জগতে ঢুকে পড়বে তুমি—হয়তো ঢুকে পড়েছ, স্বপ্নরা বাস্তব পৃথিবীর সভ্য-শিষ্ট নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে নাকি!

বাস্তব শব্দটাই খুব গোলমেলে লাগে তোমার। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কিংবা গোষ্ঠী বা সমাজ-নিরপেক্ষ কোন বাস্তবের আদৌ কি অস্তিত্ব আছে?

তোমার ছোট বোন মলি, পনেরো বছর আগে কিডনির অসুখে টাকার অভাবে চিকিৎসার আকালে ঝরে গিয়েছিল, দেশ-বিদেশের কিছু মানুষের কাছে এক টিপ নস্যির মতো সে টাকা, চিকিৎসার আকালে এ ধরনের মৃত্যু তাদের কাছে এক অবাস্তব দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিংবা ধরা যাক পাঁচতারা জীবনযাপনের কল্পনাও কি পৃথিবীর অগণিত মানুষের মতো তোমার কাছেও আদৌ নিদেনপক্ষে কোন বাস্তব-কল্পনা?

চিত হয়ে শুয়ে আছ। বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাঁজ করা দুটি হাত। রোগা লম্বা, আরও লম্বা কাঠির মতো পা দুটির পারস্পরিক দূরত্ব দেড়-দু'ফুটের কম নয়। মাথা ভর্তি একবোঝা চুল নেমে এসেছে ঘাড়ের কাছে। মুখময় দাড়ির জঙ্গল। রংচটা ময়লা বহু ব্যবহৃত টি শার্ট, তালিমারা জিনসের প্যান্ট।

ধীরে ধীরে চোখ মেলো তুমি। সেই চোখজোড়া—কোন এক সময় যার দৃষ্টিতে সুদূরের আভাস পেয়ে প্রাণ দিতে চেয়েছিল কোন কিশোরী! প্রাণ! প্রাণই কি সবচেয়ে মূল্যবান মানবজীবনে? নাকি, ডুব দিয়ে চেয়েছিল গহীন স্বপ্ন-সায়রে, তাতে মৃত্যু এলেও ক্ষতি ছিল না, তবে কি প্রাণের থেকেও স্বপ্ন মূল্যবান হয়ে ওঠে নিঃস্বপ্ন আঁধারে?

এ সব কথা কখনও কখনও ভাব তুমি, কিন্তু এখন অন্য স্বপ্নের উড়ান মুহূর্তে এ সব ভাবছ কি না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না, কী-ই বা নিশ্চিত করে বলা যায় এ মহাবিশ্বে!

চোখ মেলে তুমি অনুভব কর বারান্দায় পড়ে আছ। গত রাতে চুল্লু-বাংলা-বিদেশি-মদের বিচিত্র ককটেল গিলে টলমল পায়ে তালা খুলে চেনা ঘরটিতে ঢোকা হয়নি তোমার—যে ঘর গভীর রাতে রোগগ্রস্ত কুকুরের চড়া সুরের বিলাপের মতো অসহ্য একঘেয়ে বিরক্তিকর মনে হয় তোমার—বারান্দাতেই এলিয়ে পড়েছিল শরীর।

ঘরে ঢোকা হয়নি তোমার, হয়তো বা মাতাল হয়ে নয়, সজ্ঞানে সচেতনভাবেই ঘরে ঢুকতে চাওনি তুমি, আশৈশব তুমি তো ঘর—তোমার স্বপ্নের ঘর—খুঁজে পেতে চেয়েছ, হয়তো যে ঘরের অস্তিত্ব শুধু স্বপ্নেই সম্ভব!

চোখ মেলে বারান্দাতেই শুয়ে থাক তুমি। কয়েক মিনিট পরে পাশ ফিরতে পার আবার নাও পার, কিংবা উঠে দাঁড়াবে, ঘরে যাবে, প্রতিদিনের কাজ সেরে ফেলবে যন্ত্রের মতো একের পর এক। আজ, কাল, পরশু বা তার পরের দিন বা কোনদিনই তোমার জীবনে এমন কিছু হয়তো ঘটবে না যা নাটকীয়, অপ্রত্যাশিত। একঘেয়ে দিনগুলো কেটে যাবে। কোন জমজমাট গল্পের, ঘটনার ঘনঘটাতাড়িত গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠার কোন যোগ্যতাই নেই তোমার।

ঠিক কি? ফেলে আসা জীবনপঞ্জীর ভেতর কি নাটকীয় উপাদান নেই কিছু? সে সব নিয়ে কোন গোল কি লম্বা, সরু কি মোটা গল্প বুনে তোলা যায় না কি?

তোমার জীবনে কোন গল্প নেই আর, জান তুমি, একদিন কি ছিল না? নাকি তোমার অনুভব আর স্বপ্ন, ভাবনা আর স্মৃতির বুনোটেও জন্ম নিতে পারে আশ্চর্য এক গল্প, যে গল্পের এখনও কোন লেখক নেই, যে গল্প একমাত্র লিখে উঠতে পার তুমি নিজে, পার কি?

সব গল্প শেষ হয়ে গেছে তোমার, নাকি অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে তোমার স্বপ্নের বাস্তবে অথবা বাস্তবের স্বপ্নে, যে গল্পের এখনও কোন কথক বা লেখক নেই, আছে কি?

শুয়ে শুয়ে এসব কি ভাব তুমি?

দক্ষিণ-পশ্চিম জানলা দিয়ে একফালি চরিত্রহীন রোদ মাতাল হয়ে নুয়ে পড়েছে তোমার মুখে। মহানগরের প্রান্তে, লাস্যময়ী তরুণীর অন্তর্বাসের তলায় লুকিয়ে থাকা ক্ষতের মতো খুচরো বস্তি। বস্তির এক প্রান্তে তোমার ঘর।

টালির চাল, তিন ইঞ্চি ইঁটের দেওয়াল, চুনকামহীন, প্লাস্টারহীন, সিমেন্ট-খসা মেঝে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এক চিলতে জানলা। পুবে গলি, ওপারে সারি সারি বহুতল, দক্ষিণ-পশ্চিমে এক ফালি ঘরবাড়িহীন জমিতে ভাগাড়, আবর্জনার স্তূপ, বাকি সবদিক বস্তিঘেরা।

ভাগাড় থেকে গা-গুলোনো গন্ধ ছুটে আসে, তবু রোদ লোভ দেখায়, বে-আব্রু রোদ বড় চরিত্রহীন। স্যাঁতসেঁতে ঘরে কেমন লম্পট হয়ে সেঁধিয়ে গেছে।

তোমার মনে পড়ে, চরিত্রহীন শব্দটা যখন প্রথম অর্থবহ হয়ে উঠেছিল তোমার জীবনে, অনুষঙ্গে উপরি জুটেছিল তর্জন গর্জন সহ চড়, লাথি এবং জুতোপেটা!

'হারামজাদা পোলা, [illegible]ুতিয়ে তোমায় সিধে করে দেব, পিটিয়ে তোমার চামড়া তুলে নেব—চরিত্রহীন!'

ভাবতে ভাবতে তোমার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। সে বোধহয় চৌদ্দ-পনেরো বছর আগের কথা! ক্লাস এইট তখন, পাশের বাড়ির মিতুল আসত বোনের সঙ্গে খেলতে, মিতুলের ক্লাশ সেভেন। সবে জোয়ার আসছে অঙ্গে অঙ্গে, আধবোঝা রহস্যমোচনের অপার কৌতূহলে যেন 'অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।' এক দুপুরবেলায় ফাঁকা বাড়িতে মিতুলকে পেয়ে শরীর-

মনে হঠাৎ আসা জোয়ারের উৎস বুঝে নেওয়ার ডানপিটে ইচ্ছেতেই বুঝি জড়িয়ে ধরলে তাকে। তারপর, দীর্ঘ ও নিবিড় চুম্বন। শুধু ওখানেই শেষ হলে হয়তো সেন্সরের ছাড়পত্র পেতে অসুবিধা হত না। তোমার সাধ হল 'দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন'। মিতুলের ফ্রক তো ছিঁড়লই, ইজেরও ছিঁড়ল, 'এ' মার্কা পাওয়ার 'বই'। না, শেষ পর্যন্ত ভিলেন ধর্ষণ করতে পারেনি! শক্তিশালী যুবক তো নয়, মোটে কিশোর, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল মিতুল!

তারপর—ধাপে ধাপে চরিত্রহীন কিশোর থেকে ক্রমে চরিত্রহীন যুবক হয়ে উঠলে। এতদিন পরে মিতুলের মুখও অস্পষ্ট—কেমন আছে মিতুল? ওই দুপুরের পর থেকে মিতুল তো আর কোনদিন তোমাদের বাড়ি আসেনি, দু বছর পর ওরা পাড়া ছেড়ে চলে গেল কোথায় যেন—আর দেখা হয়নি। ফর্সা, ঘাড় অবধি দুলতে থাকা খোলা চুল, চাপা নাক, থরথর কেঁপে ওঠা ঠোঁট, বন্ধ দু চোখ—তবুও সব মিলিয়ে মুখ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে! না। এমন স্পষ্ট নয় যে ফের কোথাও দেখা হলে এক নজরেই বলে দেওয়া যাবে, এই সেই মিতুল!

চরিত্রহীন রোদের হাত থেকে বাঁচতে তক্তপোশের ধার ঘেঁষে দেওয়ালের কাছে সরে আস তুমি। ভাগাড় থেকে পচা গন্ধ—রোদের লোভ তবু, জানলা বন্ধ কর না।

চরিত্রহীন মানুষের চরিত্র বলতে ঠিক কী বোঝায় আজও জেনে-বুঝে উঠতে পারনি তুমি। 'চরিত্র' শব্দটা কেবল নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কেন লম্ফঝম্প করে বারবার? স্বার্থপর নিষ্ঠুর এক পুরুষ বা নারী যদি সারাজীবন ধরে কেবল একটি আইনসিদ্ধ যৌনসঙ্গীর সঙ্গেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারে, তবে তারা চরিত্রবান অথবা চরিত্রবতী! সভ্য সমাজের যুক্তি-ব্যাকরণ বোধগম্য হয় না তোমার।

নির্বাচন জেতার আগে দেওয়া ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়া মাননীয় নেতৃবৃন্দ তাদের কেউ যদি বিবাহিত জীবনযাপনে একজন সঙ্গীর সঙ্গেই কাটিয়ে যেতে পারেন—তিনি বুঝি চরিত্রবান। যে শ্রমিক-নেতা তার বাড়ির কাজের লোকটির প্রতি ঠিক তার প্রতিষ্ঠানের অত্যাচারী মালিকের মতোই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, ব্যাংকঋণ আত্মসাৎকারী যে শিল্পপতি প্রগতি ও কর্মসংস্কৃতি বিষয়ে গুরুগম্ভীর জ্ঞান বিতরণ করেন কিংবা যে রিক্সাচালক মওকা বুঝে ডাবল ভাড়া—

পচা গন্ধ সহ্য হয় না আর। তক্তপোশে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে জানলা বন্ধ কর তুমি। কাছেই কোথাও লাউডস্পিকারের চিৎকার, কেউ কেউ যাকে গান বলে! ওই চিৎকার থেকে বাঁচতে কাঠের র‍্যাকে রাখা টেপ-রেকর্ডার অন কর, পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে সরোদ বাজান আমজাদ আলি।

সুইচ টিপে বাল্বটা জ্বেলে নাও। তক্তপোশের এককোণে ছেড়ে রাখা প্যান্টের পকেট থেকে মনিব্যাগ বার কর, শ তিন-চার টাকা আছে এখনও, কয়েকদিন চলে যাবে, তারপর?

সশব্দে নিঃশাস ছাড়লে কি তুমি? ফের কাজ খুঁজতে হবে। শেষবারটা ধরে এই নিয়ে বোধহয় দশবার চাকরি ছাড়লে তুমি! দু-একবার অবশ্য তুমি ছাড়নি, ছাঁটাই হয়েছ!

কুরিয়র কোম্পানির চাকরিটা মন্দ লাগছিল না, ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি আর টি.এ. থেকে

কিছু বাঁচিয়ে সব মিলিয়ে মাসে হাজার দেড় হয়ে যেত। কিন্তু একটু-আধটু ভুলচুক হলে ম্যানেজার এমন চোখা চোখা গালাগাল—যাক, সামনে বইমেলা আসছে, মাস দু-তিন কিছু কাজ পাওয়া যাবে, ঘোরাও হবে এদিক সেদিক, সঙ্গে উপরি পাওনা কিছু বই পড়া।

এইসব ভাবতে ভাবতেই টেবিল ফ্যানের প্লাগটা থ্রি-পিন প্লাগের ভেতর ঢুকিয়ে সবে একটা চাপড় মেরেছিলে ওটার গায়ে, দু-তিনটে চাপড় না খেলে চলতে চায় না, কিন্তু পাওয়ার কাট। ভেজা জামা ফ্যানের সামনে মেলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলার ইচ্ছে ছিল, না হলে ফের জানলা খুলে রোদে মেলতে হবে।

প্রায় অন্ধকার ঘরে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফের শুয়ে পড় তক্তপোশে। কেমন শীত শীত লাগে, সভ্য পৃথিবীতে শীত আসতে অনেক দেরি এখন, কিন্তু শীত বোধ কর। শীত ঋতুতেই তোমার স্বপ্ন দেখা সবচেয়ে শিহরণময়!

হাঁটু ভাঁজ কর, কুঁকড়ে যায় শরীর, ফের উঠে পড়। দুপুরে রামুর হোটেল থেকে আনা আলুর তরকারির খানিকটা রেখে দিয়েছিলে রাতের জন্যে, এখন হাতে তুলে নাও তরকারির বাটি, অন্য হাতে প্লাস্টিকের কৌটোর মধ্যে রাখা চোলাই মদ ভরা পলিপ্যাকটা নিয়ে দাঁতে ছিঁড়ে ঢকঢক করে ঢেলে দাও, তরল আগুন গলা দিয়ে নামতে নামতে চোখ-মুখ কুঁচকে যায়। তরকারিটুকু মুখে পুরে দাও।

বাইরে গোলমাল। খিস্তিখেউড়, দৌড়ঝাঁপ, মেয়ে-কান্না; বিকটআওয়াজ করে বোমা ফাটে। ঘরের সামনে দিয়ে ধুপধাপ ছুটে যায় একদল।

তুমি কোন কৌতূহল বোধ কর না। বাইরে গিয়ে উঁকি মারতে এতটুকু উৎসাহ হয় না তোমার। আবছা, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু ছবি, প্রায়ান্ধকার ঘরে ফুটে উঠে জ্বলে নেভে—ঝিম নেমে আসে তোমার শরীর জুড়ে, তক্তপোশে উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফের শুয়ে পড় তুমি।

স্পষ্টভাবে মুখ দেখা না গেলেও ওই মহিলাকে চিনতে তোমার একটুও ভুল হয় না। উনিই তোমার জন্মদাত্রী। অবজ্ঞা, করুণা ও ঘৃণার এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে উনি তাকিয়ে আছেন তোমার দিকে। করুণা কি আছে? বোধহয় অবজ্ঞা আর ঘৃণা।

আলো-আঁধারি বা প্রায়ন্ধকার পর্দায় সেই দৃষ্টির মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে না তোমার, চোখ বোজ তুমি।

বাইরে গোলমাল থেমে গেছে অনেকক্ষণ। তবে বস্তিজীবনের স্বাভাবিক হট্টগোল চলছেই। ওসব কানে যায় না তোমার। নিজস্ব পৃথিবীর ভেতর ঢুকে পড়েছ তুমি, স্মৃতিময় স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নময় স্মৃতির ঘোরে আচ্ছন্ন এক ভুবন!

তিন সন্তানের মধ্যে দাদাকে নিয়েই মায়ের একমাত্র তৃপ্তি। বোন চলে গেছে সেই কবে, সে শোক হয়তো ফিকে হতে হতে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু তোমার জন্যে সামান্য সহানুভূতি নেই, থাকলে দৃষ্টিতে এত অবজ্ঞা আর ঘৃণা কেন? একটু করুণাও তো থাকতে পারত, নাকি একটুও করুণার যোগ্য নও তুমি?

দাদা ছিল সব ব্যাপারেই গুডবয়। পড়াশোনায় ভালো, ক্লাসে প্রতিবার ফার্স্ট না হোক দশের মধ্যে থাকত। ইঁচড়ে পাকা ছিল না। আচার-ব্যবহারে বেশ ভদ্র-সভ্য চিরকাল। চেহারাও মায়েরই মতো, ছোটখাট গোলগাল।

দাদাকে নিয়ে কোন জ্বালা ছিল না মায়ের। পাতে যা বেড়ে দেওয়া হত, সোনামুখ করে খেয়ে নিত। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ভালো মাইনের চাকরি। নো ফস্টিনস্টি কেস, মায়ের পছন্দ করা পাত্রীকেই বিয়ে!

তোমার মনে পড়ে দাদাকে পাড়ার উঠতি মস্তানদের হেনস্তা থেকে বাঁচাতে একবার মারামারি করে হাত-পা কাটল, মুখ ফুলল। বাড়ি ফিরে কিছু শোনার আগেই মায়ের গালিগালাজ আর চড়চাপড়, অবশ্য মাঝে মাঝেই এবাড়ি ওবাড়ি থেকে নালিশ আসত—আপনার ছেলে গুণ্ডামি করেছে, অসভ্যতা করেছে, তাই মাকে কিছু দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু দাদা চুপ, একবারও মাকে বলল না যে—

দাদা বড় ভালো ছেলে, সোনা ছেলে! আর তুমি? ছোটবেলায় বোধহয় এমন একটা দিন যেত না যেদিন তুমি মায়ের গালিগালাজ অথবা চড়-থাপ্পড় থেকে বাদ পড়েছ। আচ্ছা, মা কি গোড়া থেকেই দাদাকে বেশি ভালোবাসত? মায়ের উপেক্ষা, অনাদর আর দাদার প্রতি পক্ষপাতিত্ব কি তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকেই অবাধ্য, একগুঁয়ে, উচ্ছৃঙ্খল—

না—এমন ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে চাও না তুমি। আজকে তুমি যা, তার জন্যে পরিবেশ-পরিবার-সমাজকে দায়ী করা, তোমার মনে হয় এ এক ধরনের আত্মপ্রতারণা, নিজের দুর্বলতাকে আড়াল করার অপকৌশল, তা না হলে একই পরিবারে একই পরিবেশে তোমার দাদা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারল কী ভাবে?

ছোটবেলার কথা না হয় আলাদা, বুঝতে শেখার বয়েসের পরেও তুমি সচেতনভাবেই নিজেকে সংশোধন করতে চাওনি। পুড়তে চেয়েছ তুমি। সমাজের চোখে যা অন্যায় অসভ্যতা, পাপ; যে আগুনের সামনে নিষেধের তর্জনী উঁচিয়ে রেখেছে সভ্য সমাজ, তুমি সেই নিষিদ্ধ আগুনেই ঝাঁপ দিয়ে পোড়াতে চেয়েছ নিজেকে এবং পোড়া দেহ লুকাতে চাওনি, চিৎকার করে বলেছ—এই দ্যাখো, আমি পুড়েছি, পুড়িয়েছি নিজেকে, কিন্তু কেন? যা কিছু নিষিদ্ধ, তার প্রতি সেই শৈশব থেকেই কেন অমোঘ আকর্ষণ তোমার? কেন?

এসব ভাবতে ভাবতেই তুমি কি একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইলে তোমার মা-কে? তুমি কি বলতে চাইলে, মা আমাকে তুমি ঘৃণা কর আমি চরিত্রহীন অসভ্য বলে নাকি আমার অসভ্যতা আমি লুকোইনি বলে?

মায়ের দৃষ্টি কি আরও কঠিন হিমজমাট হয়ে এল? মায়ের সঙ্গে পাশের বাড়ির বিজু কাকার হিজিবিজি সম্পর্কের কথা জানতে তুমি। বাবা অফিসের কাজে প্রায়ই ট্যুরে যেত, সে সময় বিজু কাকার সঙ্গে মা কেমন উচ্ছল হয়ে উঠত, সে সব স্পষ্ট মনে পড়ে যায় তোমার। একদিন বিছানায় ওদের লুটোপুটি জড়াজড়ির নিষিদ্ধ দৃশ্যটা দেখে ফেলেছিলে। দরজা ফাঁক করে দেখতে দেখতে হঠাৎ মায়ের চোখে চোখ পড়ে গেল। পালিয়ে গেলে। কিছুক্ষণ পরেই

পিছু পিছু ছুটে এল মা, বেশ আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, যা দেখেছিস, খবরদার, বাবাকে বলবি না কিছু, এই নে, আইসক্রিম খাস।

আইসক্রিম কিনে খেলে, কিন্তু মায়ের ওই 'খবরদার' শব্দটাতেই কেমন এক রোখ চেপে গেল তোমার। বাবা ফিরতে না ফিরতেই গড়গড়িয়ে সব বললে তুমি। কিন্তু হায়, এক বর্ণ বিশ্বাস করল না বাবা, আর মা কেঁদেকেটে শাপশাপান্ত করল—এ কী ছেলে পেটে ধরলাম, এমন বানিয়ে কথা বলে, মিথ্যুক, ছিঃ ছিঃ!

লাঠির বাড়ি পড়ছে পিঠে আর তুমি হাসছ হিঃ হিঃ করে—বাবার রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে, লাঠি ভাঙল, কিন্তু তোমাকে দিয়ে একথা কবুল করানো গেল না যে তুমি মিথ্যে বলেছ!

এখন শুধু আঁধার, আলো নেই এক ফোঁটা। অন্ধকার পর্দায় মা-কে দেখতে পাও না আর। মদ্যপ, জুয়াড়ি, জেলখাটা আসামি—এমন সন্তানকে কে আর করুণা করবে? তবু মায়ের করুণা পাওয়ার জন্যে মন এত আকুল হয়ে উঠছে কেন বুঝতে পার না তুমি। মা যখন গান গাইত আপন মনে, 'কে আবার বাজায় বাঁশি, এ ভাঙা কুঞ্জবনে....', সন্ধ্যায় তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করত —সা-রে-গা-পা-সা..., কী স্নিগ্ধ বিষণ্ণ মুখ মায়ের—করুণা পাওয়ার জন্য বুঝি আকুল হয়ে ওঠ।

যে তার চরিত্রহীনতা লুকোতে শেখেনি, সে করুণা পাবে কেন?

নিজেকে এক চরিত্রহীন, পাজি, একগুঁয়ে, বদমাস ভাবতে ভাবতেই তোমার মনে হয় মায়ের কাছে যা প্রাপ্য হয়তো তুমি তাই পেয়েছ, তাই?

ঘুম নামে, শরীর-মন দখল করে নিতে থাকে ঘুম, যেন এক মহাঘুমের ভেতর নতুন কোন স্বপ্নের সন্ধানে ক্রমশ ডুবে যেতে থাক তুমি!

মদের ঠেক ঘিরে নরকগুলজার! রেললাইন থেকে সামনে একটু ফাঁকা জায়গা রেখে ঝুপড়ি। খাটিয়ায়, বেঞ্চে বসে কয়েকজন। কেউ কেউ মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, কেউ বা চিতপাত।

দেশি মদের একটা পাইট তোমার হাতে, দুজনে মিলে শেষ করেছ অর্ধেক। অবিরাম বকবক করে চলেছে লোকটা। মাঝে মাঝে 'ঠিক কি না?' বলে সায় চাইছে তোমার। মাল যখন খাওয়াচ্ছে লোকটা, প্রায়ই খাওয়ায়, তুমি সেভাবে কিছু না শুনেও খুব মনোযোগী শ্রোতার মতো ঘাড় হেলিয়ে সায় দিয়ে যাচ্ছ। বছরখানেক আগে লোকটা, অমল না কমল, কী যেন নাম—মনে পড়ে না তোমার। ওই যা হয় হল, ধরা যাক অমল, বারাসাত বইমেলায় ওর সঙ্গে পরিচয়। পদবীটা কী যেন? মনে নেই, মনে রাখার প্রয়োজনও বোধ করনি।

তুমি কিন্তু আমার উপন্যাসের একটা চরিত্র।

কথাটা শুনে তোমার ঠোঁটে মৃদু হাসি এবং সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় হেলাও।

মানে, তুমি জানতে নাকি?

কথা না বলে ফের ঘাড় হেলাও।

কী করে জানলে?

এবার একটু বিরক্ত বোধ কর—কথা না বলিয়ে ছাড়বে না! অল্প মৌতাত আসছে। খুব কম জল দিয়ে মাল খাওয়ার অভ্যাস, খরচ কম নেশা বেশি। শুয়োরটার বকবকানির ঠেলায় মৌতাত ফরসা হয়ে যেতে বসেছে। বিরক্তি চেপে তবু তুমি বল, আমি জানি না—পৃথিবীর কিছুই জানি না আমি, কিন্তু বুঝতে পারি।

আন্দাজ?

কথা আর কানে যায় না। মধু মাসির পাশে দাঁড়ানো নয়া ছুকরিটা, তার দিকেই নজর চলে গেছে তোমার। মধু মাসি! কে দিয়েছিল নামটা! বেড়ে নাম! রোজ সন্ধেয় মধু বেচে যে মাসি, সেই তো মধু মাসি! তুমি ভাব, এই ঠেকটার নাম মধুশালা দিলে কেমন হয়।

নয়া ছুকরিটা কে হয় মধু মাসির? নাকি মেয়েটাকে দিয়েই নতুন ধান্দা খুলতে চাইছে?

মাসি মদ বেচছে আর ছুকরিটা চাট এগিয়ে দিচ্ছে—পাঁপর পোড়া, শশা, শুয়োরের মাংস—যে যেমন চায়।

মাজা রং, ঘাড় অবধি খোলা চুল, হাতকাটা ফুলছাপ ম্যাক্সি, ছিপ্‌ছিপে শরীর-ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া মুখরা বুক—মাঝে মাঝে খদ্দেরদের কথায় হি হি হেসে ওঠে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোমার শরীরের ভেতর কেমন চনমনে আগুনে-বাতাস বয়, টের পাও তুমি। একটু নিট গলায় ঢেলে দাও।

নিট খেয়ো না, কী করছ?

লোকটার আর্তনাদ কানে যায়, লেখক নামক সেই পতঙ্গটার বকবকানি দেখে বেশ মজা লাগে, তার বাড়িয়ে ধরা মাটির ভাঁড় থেকে এক টুকরো শুয়োরের মাংস তুলে মুখে পুরে নাও।

মজা লাগে পতঙ্গটার নকল মমতা দেখে, বন্ধুত্বের অভিনয় দেখে। শিশুর কাঁচা অভিনয় দেখে হেসে যেমন কুটিপাটি হয় বয়স্করা, তেমন হাসতে ইচ্ছে করে তোমার। তোমাকে নিয়ে উপন্যাস লেখার সাধ হয়েছে পতঙ্গটার, তা বেশ।

তা বেশ! তা বেশ! বলতে বলতে ডাইনে-বাঁয়ে ধীরে মাথা দোলাও তুমি।

ফের চোখ চলে যায় নয়া ছুকরিটার দিকে। বহুদিন পর শরীর-চুল্লির সামান্য আঁচ টের পাও। পাকা চরিত্রহীনের মতো ড্যাব ড্যাব করে ছুকরির শরীর চাটতে চেষ্টা কর। এ ছোট্ট জীবনে পাকা চরিত্রহীনের মতোই বহু মেয়েমানুষকে কামনা-সঙ্গী করেছ তুমি, কলেজের সহপাঠী থেকে বাউলিনী, হাড়কাটা থেকে সোনাগাছি, সল্টলেকের ফ্ল্যাটে মধুচক্র থেকে রেললাইনের ঝুপড়ি—কত বিচিত্র কামনাসঙ্গী তোমার! শরীর-চুল্লির আগুন তাই সচরাচর জ্বলতে চায় না যেন আর।

তুমি তাকিয়ে থাক, ক্রমশ এক ঘোরের ভেতর ঢুকে পড়তে থাক। মধুমাসির পাশে ছুকরিটাকে দেখতে পাওনা আর। বদলে যাকে দেখ কত চেনা মনে হয় তাকে তবু চিনতে পার না! এই কি সেই নারী যাকে এক সহপাঠীর বুকে এলিয়ে পড়া অবস্থায় দেখে ঠিক থাকতে না

পেরে সহপাঠীর নাকে মুখে কিল-চড় মেরে, স্টিলের জাগ তুলে তার মাথায় বাড়ি মেরে—তারপর জীবনে প্রথম জেলে যেতে হয়েছিল? সেই কি? সেই নারী? যে নারী কলেজে অনেকেরই প্রেমিকা অথচ সেই তরুণ বসন্তবেলায় মনে হয়েছিল সে কেবল তোমারই—অর্পিতা কি তোমার সেই ধারণা গড়ে তুলতে—সেই স্বপ্নময় প্রেমপ্রাসাদ গড়ে তুলতে দিনের পর দিন তিলতিল করে প্রশ্রয় দিয়ে হঠাৎ একদিন—

সেই অর্পিতা কি? আর সকলেই ছিল তোমার কামনাসঙ্গী কিন্তু অর্পিতাই ছিল একমাত্র—

অর্পিতার মতো মুখ—হয়তো বা অর্পিতাই, বিবসনা অর্পিতা পুতুলের মতো এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসে ধীরে, তোমার সামনে, তোমার খুব কাছে, তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও তার হাতে পায়ে শিকলের দাগ। শিকলের ঝনঝন শুনতে পাও, পুতুল-অর্পিতা আরও কাছে এগিয়ে আসে, হাঁটু মুড়ে বসে, তোমার পুরুষাঙ্গে তার তীব্র চুম্বন, বড় তিক্ত-মধুর চুম্বন!

তুমি শিহরিত হতে হতে সহসা লক্ষ কর লাল হয়ে যাওয়া তার ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে—তুমি চিৎকার করে ওঠ।

চিৎকারে গোঁজিয়ে ওঠা ঠেক কয়েক মুহূর্ত নিঝুম হয়ে যায়, ফের জেগে ওঠে হাসি-খিস্তি-খিউড়-টিপ্পনিতে—'খানকির ছেলে এমন ককিয়ে উঠল যেন ইজ্জত লিয়ে লিচ্ছে', 'এক পাত্তির মাল টেনে শ পাত্তির বাওয়ালি'—।

সেই লেখক-পতঙ্গটা ফের ফরফর করে ওঠে, তোমার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে চায় আর তুমি সপাটে তার গালে চড় কষিয়ে দাও—আমায় নিয়ে উপন্যাস লিখবে! আমি তোমার উপন্যাসের চরিত্র! চরিত্রহীনের চরিত্র হয় নাকি রে শুয়ারের...

শূন্য বোতলটা একটু দূরে রেললাইনে পড়ে চুরমার হয়ে যায়।

নিঝুম বস্তি। আকাশ জুড়ে কালো মেঘে ঢেকে গেছে কি চাঁদ? কত রাত? জান না তুমি। জানার ইচ্ছাও নেই তোমার। তক্তপোশে কাঠ হয়ে শুয়ে আছ, নাকি বুঁদ হয়ে আছ তোমার অলীক-পৃথিবীতে?

কত চরিত্র ভিড় করে আসে সেই অলীক পৃথিবীতে আর অন্তর্ঘাত করে জাগরণের বাস্তবে নিয়ে আসতে চায় তোমায়। প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তোল তুমি। ওদের সঙ্গে অবিরাম সংলাপ-যুদ্ধে মেতে ওঠ।

দেওয়ালের ওপারে ওরা কেউ বলে—শালা, মায়ের অসুখ বাপের অসুখ নিজের অসুখ বলে অনেকটাকা নিয়েছিলি, শোধ দে।

এপারে ফিকফিক হাস তুমি। তোমার মনে পড়ে, মাল কেনার পয়সা জোগাড় করতে একদিন বাপের হাতঘড়িটাও ঝেড়ে বেচে দিয়েছিলে।

জুয়ায় বাজি রেখেছিলে আলমারিতে বাপের রেখে যাওয়া একতাড়া একশোর নোট্—রেখেছিলাম তো বেশ করেছিলাম, এভাবেই ওদের মুখে কথা ছুঁড়ে দিতে থাক তুমি,—ধর্ম্মপুত্তুর বউকে বাজি রেখেছিল পাশার জুয়ায় আর আমি তো বাপের [illegible] পাওয়া একতাড়া—

ফের ফিকফিক হাস! নিজের সাফাই গাওয়া তো তোমার চরিত্রহীনতার সঙ্গে মানানসই নয়, নিজের কাজটি কোন ঘোরতর অপরাধ নয় প্রমাণ করতে ধর্ম্মপুত্তুরকে টেনে আনা কেন?

নিজেকে এসব প্রশ্ন করতে করতেই দেওয়ালের এপার থেকে বল, যা করেছি বেশ করেছি।

কাত হয়ে ডানদিকে ফের, মৃদু শব্দ হয় তক্তপোশে। তুলো ঝরা বালিশ থেকে মাথা গড়িয়ে তোমার হাতের তালুতে। দেওয়াল নেই, দেওয়ালের এপার-ওপার নেই এখন! তোমার অলীক পৃথিবীর মঞ্চে ভিড় করে আসা চরিত্ররা কেউ নেই, আপাতত। বহুদূর থেকে ভেসে আসে সুর, বীণার ঝংকারময় আশ্চর্য সুর! তুমি ফের বল, যা করেছি বেশ করেছি। তুমি অনুভব কর, তুমি আজ যা, তার জন্যে তুমিই দায়ী, আর কেউ নয়। নাকি? ভাব, ফের ভাব, সমাজ-সংসার যতটা দায়ী, তুমিও তার থেকে কম দায়ী নও—তবু, তুমি যে চরিত্রহীন তা আড়াল করতে চাও না, চাও নি কোনোদিন। সেই বালকবেলা থেকেই কি তুমি অনুভব করে এসেছ যে সভ্য মানুষের পৃথিবী কেবল এক ভণ্ডামি আর প্রতারণার প্রাসাদ!

তুমি কি ভাব যে পৃথিবী আসেনি এখনও তাই সবচেয়ে সুন্দর! হয়তো বা সে পৃথিবী আসবে না কোনদিন তাই সে সবচেয়ে সুন্দর—শুধু স্বপ্নে থেকে যাবে, তাই স্বপ্ন দ্যাখো তুমি, স্বপ্ন দেখে যাও—নাকি সভ্য দুনিয়ার উলটো পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখে নিতে চাও স্বপ্নপূরণ না হওয়ার বেদনাই কি মানুষকে মানুষ করে তোলে?

তক্তপোশে শব্দ তুলে চিত হও, দীর্ঘনিঃশ্বাস—এই সভ্য ভদ্র [illegible] পৃথিবীতে কোন ঘর নেই তোমার, কোন ঘর নেই!

এখন অন্ধকার। যা তোমার সবচেয়ে প্রিয় সেই অন্ধকার তোমায় জড়িয়ে শুয়ে আছে। কত শতাব্দীর ধীর স্থির শান্ত অন্ধকার তোমার চারপাশে—অন্ধকারেই বুঝি স্বপ্ন দেখা যায় সবচেয়ে ভালো!

কোন ঘর নেই তোমার, এ পৃথিবীতে কোন ঘর নেই।

অন্ধকার এখন। অন্ধকারে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। কল্পনা করা যায়, তাই বুঝি অন্ধকার বড় প্রিয় তোমার।

ঘরহীন তুমি অন্ধকারে স্বপ্ন দ্যাখো—ঘরের স্বপ্ন। ঘর, যে ঘরে প্রবেশ-প্রস্থান পথ খোলা, বাধাহীন। মাটির সে ঘরে তীব্র আলো নেই, প্রদীপের মৃদু আলো। বীণার আশ্চর্য সুর আর এক নারী। নারীর বিষাদঘন চোখ মৃদু আলোয় আরও বিষণ্ণ আর—

আর তুমি এক পালক, পাখির পালক হয়ে ভেসে ভেসে এসে পড় সেই ঘরে।

বীণায় রাগ হেমকল্যাণ—সা রে গা পা সা...

বাতাস কিনুন

বয়েস আমার সাতাশ
বেচি আমি বাতাস।

ও দাদারা, দিদিরা, বৌদি ও জামাইবাবুরা, একটু শুনবেন, একটু দেখবেন এদিকে, কী দেখবেন? আমাকে? না, না আমাকে আর দেখার কী আছে? আমি কি শাহরুখ না শচিন? কী শুনবেন? আমার কথা? না, না, আমার কথা নয়, আমি কি আজ্ঞে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যে আমার ভাষণ শুনতে যাবেন!

শুনুন আপনার নিজের কথা, আপনারই বাঁচা-মরার কথা, আপনার কথা—বলছি আমি, একটু রসিয়ে বলছি, না বৌদিদিরা, এ রসকথায় ভেজাল নেই, তবে কি না আই এস আই ছাপ মারাও নয়, শুনুন, শুনতে থাকুন, এই যে দাদু ও মাসিমা—এইদিকে দেখুন, এই আমার হাতে ধরা এই বোতল—

বয়েস আমার সাতাশ
বেচি আমি বাতাস।

আজ্ঞে না, সত্যি সত্যি বয়েস আমার সাতাশ না। তবে আমাদের পাড়ার খুকুমণির মতোও নয়—খুকুমণির বয়েস প্রতি পাঁচবছরে একবার করে বাড়ে, থুড়ি বাড়ত, হ্যাঁ, বেচারি আর নেই এ জগতে, যমদূতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছে, বুকের ভেতর জমিদারি পত্তন করেছিল কী এক কালরোগ, কাশতে কাশতে হাঁপাতে হাঁপাতে রক্ত তুলে বেচারি—যাক সে কথা, এমন তো ঘটেই থাকে। সে কথা বলে এই সুন্দর বিকেল মাটি করে কেউ, নাকি রাজা তার রাজকার্য বন্ধ রাখেন!

যে কথা বলছিলাম, সত্যি সত্যি বয়েস আমার সাতাশ নয়, সত্যি সত্যি কথাটা কি ঠিক হল? কারণ ধরুন দাদারা, এই যে সময়ের হিসেবে বয়েসের বিচার, তার নিয়ম তো মানুষের বানানো, ষাট মিনিটে একঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর—এ হিসেব তো হাল আমলের, কিন্তু এ হিসেবের কী মানে আছে ধরুন দুই কি তিন হাজার বছর আগে যারা বাংলা কি বার্মায় বেঁচেবর্তে ছিল? সময়ের ওই বানানো নিয়মটা পাল্টে নিলেই মানুষের বয়েসের অংকটাও বদলে যাবে—না, না, ঘণ্টা মিনিটের অংক কষতে বসছি না, ধরুন, ও দাদু হাল আমলের নিয়মটাই একটু বদলে নিয়ে যদি যেদিন প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম সেদিন থেকে হিসেব করি তাহলে বয়েস আমার সাতাশই হয়—আসলে মানুষের বানানো হিসেব নিয়ম-কানুনের কোনটা যে সত্যি আর কোনটা মিথ্যে—পৃথিবীর নিয়ম দেখুন, যারা রোদে পুড়ে জলে ভিজে মুখে রক্ত তুলে খাটে—

রোদে জলে খাটেন যারা
তাদের জোটে ছাই

আর ঠাণ্ডা ঘরে বাবুরা সব
ফূর্তি মারেন ভাই!

তা, যাক সে সব সত্যি-মিথ্যের গোলমাল, চালু নিয়মমতো আজ্ঞে আমার বয়েস সাতাশ নয়, বাতাসের সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্যেই সাতাশ লাগালাম, তা হলে বয়েস কত? ও খোকাবাবু —

তিরিশ যোগ দুই
বাতাস দিয়ে ধুই।
সাতাশ যোগ পাঁচ।
বাতাস কিনে বাঁচ।
বয়েস বত্তিশ
বাতাস কিনে নিস।

হ্যাঁ খোকাবাবু বাতাসা নয় কিন্তু বাতাস, বাতাস! অবশ্য তোমরা এখন আর বাতাসা খাও না, হরির লুঠের বাতাসা কী জানই না বোধ হয়, মেলায় গিয়ে পাঁপর ভাজা খাও? সে সব ছিল আমাদের ছোট বেলায়। তোমরা এখন চিপস্ কেন, কেন কোল্ড ড্রিংকস, সাংহাই থেকে সানফ্রানসিসকো, ক্যানবেরা থেকে কলকাতা, তোমরা সবাই—

কলা নয় কোলা খাও
পিজা খাও খাও চিপস্
টিভি থেকে জেনে নাও
বাঁচবার নানা টিপস্।

তা ভালো, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি বদলায়, বদল তো দুনিয়ার মহাসত্য, কিন্তু সব বদল কি একরকম? কী বলেন দাদারা? কিছু বদল আছে যাকে বলি স্বাভাবিক, কালের নিয়ম প্রকৃতির নিয়ম, আবার কিছু বদল মানুষের তৈরি, তা কোন সময় হয়তো মানুষের ভালোভাবে বেঁচেবত্তে থাকাকেও তোয়াক্কা করে না, নাকি কী বলেন? সব বদল কী বেশিরভাগ মানুষের ভালোর কথা ভেবে হয়? নাকি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গতি ও চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে হয়? কোন বদলে কার লাভ কাদের লাভ—একটু তলিয়ে দেখলে বদলের তাল লয় লাভক্ষতির হিসেব বেশ খানিকটা বুঝে নেওয়া যায়, ধরুন গে, এই কলকাতা মুম্বাই বন প্যারিস কিংবা জাকার্তা সব শহরেই যদি একধরনের খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, কোথাও পাঁপর ভাজা কোথাও ভুট্টাভাজা না হয়ে সবই যদি একরকম হয়, তবে যে-সব কোম্পানি খাওয়ার জিনিসের ব্যবসা করে তাদের কত সুবিধা বলুন দেখি? দুনিয়ার সবাই যদি কোলা চিপস্ ক্যাডবেরি খাওয়া অভ্যাস করে ফেলে তা হলে কোম্পানির পক্ষে মাল তৈরি ও বেচার কত সুবিধা!

তারপর ধরুন গে, এসব একটু আধটু খেলে তো হবে না, যত বেশি খাবেন, ততই

লাভের কড়ি বাড়ে, তাই—

সকালে উঠিয়া তারা মনে মনে বলে
সারাদিন সবে যেন কোলা খেয়ে চলে।

বিক্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির লাভের খাতা কেমন উপচে পড়ে, তাই না? তাই ওরা বলে—কোলাহল নাকি হলাহল, সরি, কোলাময়, চিপস্-ক্যাডবেরিময় এক নয়া জীবনধারা গড়ে তোল, একদেশ, একবিশ্ব, গ্লোবাল ভিলেজ, বন্ধুকে ভালোবাসা জানাবে কী করে? তাকে ক্যাডবেরি উপহার দিয়ে। ডাবওয়ালা, পাঁপরওয়ালাদের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও!

ও দিদি রাগ করলেন নাকি? পলিটিকসের ভাষা বলছি? তা যা বলেন, তবে আপনি ওই পলিটিকস এড়িয়ে যেতে চাইলেও তা যে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আপনাকে, আপনি চোখ বন্ধ করলেই কি আর মা বসুন্ধরার কোলে সূয্যিমামার আলো নিভে যায়? আপনার খাওয়া বসা শোওয়ার সঙ্গে একেবারে কোল্ডক্রিমের তলায় চামড়ার মতো মিশে আছে পলিটিকস! আর সেটা আড়াল করতেই যত না-রাজনীতির গপ্পো! তাই বলছিলাম কার কালো হাত কে ভাঙে! আরও মুশকিল কী জানেন, আজ যেটা দেখছেন সাদা, কাল যে কখন কী ভাবে তা কালো হয়ে যাবে কে জানে! যাক সে কথা, বরং বলি—

বয়েস বত্তিশ
বাতাস কিনে নিস।

হ্যাঁ, বাতাস কিনুন, আর যে কোন বাতাস কিনলেই হবে না, কিনতে হবে খাঁটি বাতাস, যা দিতে পারে একমাত্র আমাদের কোম্পানি! এক বাতাসের কত নাম আমাদের বাংলা ভাষায়—বায়ু, হাওয়া, সমীর, পবন—আর ও কত!

তবে বাতাস শব্দটা ভাবলেই—প্রথমেই মনে পড়ে আমার মায়ের হাতে ঘুরতে থাকা নকশাদার এক তালপাতার পাখার কথা। আমার বড়মামা অসমে থাকতেন, উনি দিয়েছিলেন। আমাদের পাড়ায় যখন ইলেকট্রিক লাইন এল তখন আমার দশ-এগারো, আশির দশকের গোড়ার দিক, তা ইলেকট্রিক আসার পর খুব আনন্দ, কিন্তু সে সময় শুরু হয়েছিল একবারে যাচ্ছেতাই লোডশেডিং, কাজেই মায়ের হাতে ঘোরা তালপাতার পাখার বাতাসে অনেক বছরই প্রাণ জুড়িয়েছে আমাদের। আজকাল অবশ্য পাওয়ার কাট খুব কমই হয়, হলেও জেনারেটর লাইনে ফ্যান ঘোরে, ফ্যানেরও আমার রকমফের আছে—তবে কিনা মায়ের হাতে ওই তালপাতার পাখার বাতাস—তার স্বাদই আলাদা! আরও কত কিছু ছিল মায়ের হাতে, যেমন ধরুন ধনেপাতার বড়া, আহা! ধনেপাতার সঙ্গে একটু কাঁচালঙ্কা একটু পোস্ত, আরও কী সব মশলা দিয়ে—সে যে কী স্বাদ!

মা চোখ বুজেছেন তাও প্রায় দশ বছর হয়ে গেল, তারপর থেকেই—বুঝলেন, ও মাসিমা, সংসারটা একেবারে ছন্নছাড়া। বড়দা ও মেজদার আলাদা সংসার। বাবা ছিলেন ইলেকট্রিক

মিস্ত্রি, এতবড় সংসার টেনে যে টুকু যা সঞ্চয় করেছিলেন, সবই চলে গেল বোনের বিয়ে দিতে। তাও কি শান্তি আছে শেষ বয়েসে বাপের? বিয়ের তিন-চার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বোন ফিরে এল বাচ্চা কোলে। আর কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি থাকলে হয়তো পুড়েই মরত! তা, এখন বোনকে নিয়ে আমাদের সাড়ে-তিনজনের সংসার।

এই দেখো কাণ্ড—কথা হচ্ছিল বাতাস নিয়ে আর আমি আমার নিজের কথা গলগল করে—নিজের কথা? কোন কথাই বোধহয় পুরোপুরি নিজের হয় না আবার পুরোপুরি অন্যের হয় না, কী বলেন? প্রত্যেকের নিজের কথার ভেতরেই ঢুকে থাকে চারপাশের সমাজ-সংসারের নানা কথার নিঃশব্দ ভিড়, নাকি? পৃথিবীতে একা এসেছি একা চলে যাব—একথা কেউ কেউ আমরা বলি বটে, কিন্তু আসা আর চলে যাওয়ার মধ্যের সময়টুকুই তো জীবন, সে জীবনে তো কেউ একলা বাঁচে না, বাঁচতে পারে না, একলা বাঁচার চেষ্টাই তো একটা অসুখ, নাকি মৃত্যু? কী বলেন, ও জামাইবাবু?

তা বাতাসের কথাই বলি—চারপাশের বাতাসে এখন বিষ, বিষ বাতাসে-আকাশে-জলে-মাটিতে, কতরকমের বিষ কত জায়গায়! এই ধরুন আমার কথা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রির ছেলে ইলেকট্রিক লাইনে গেলে হয়তো কিছু করে খেতে পারতাম, তা না আরশোলার সাধ হল ঈগল হওয়ার! প্রথমে ভাবলাম জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হব, গ্রাজুয়েট হওয়ার পর প্রাইভেটে এম.এ করলাম আর সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় বসলাম, ম্যাজিস্ট্রেট তো দূরের কথা পরপর দুবার ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দিয়ে কেরানিও হতে পারলাম না—হব কী করে এতো পাশ করার পরীক্ষা নয়, বাদ দেওয়ার পরীক্ষা, এলিমিনেশন টেস্ট, নেবে দশ জন, পরীক্ষায় বসেছে দশ হাজার! তারপর ভাবলাম ব্যবসা করব, ইলেকট্রিক্যাল গুডসের দোকান দেব, বাপ বলল, এত পয়সা দেবে কে? আমি বললাম, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, দৌড়ঝাঁপ শুরু করলাম এ ব্যাংক সে ব্যাংক, সবাই গ্যারান্টার চায়, সিকিউরিটি ডিপোজিট চায়—বোঝ কাণ্ড, এতসব যদি থাকবে তা হলে আর তোদের কাছে যাব কেন? বাপ বলল, ও সব ছাড়, মিস্তিরির ছেলে মিস্তিরিই হয়। আমার তখন টাটকা যৌবনের টগবগে রক্ত, বললাম, ছোট পেশায় আটকে থাকব কেন? বিশ্বায়নের যুগ, টাকা উড়ছে বাতাসে, বাজার উপচে উঠছে কত ডিভিডি মোবাইল বাহারি গাড়ির ভিড়ে, কত এইন্টারটেইনমেন্ট পার্ক আর মাল্টিপ্লেক্স, ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে উপচে পড়া সুখ, মুঠোয় ভরতে হবে না, সে সুখ? ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর! বাপের মতো পেটে গামছা বেঁধে থাকলে চলবে! টিভি-র পর্দায় হাসিমুখ চাষিভাইয়ের কানে মোবাইল—ইন্ডিয়া শাইনিং! তা, এসব দেখেশুনে, পিছিয়ে পড়তে না চেয়ে এদিক সেদিক নানা ফাটকাবাজিতে ভিড়ে —বাপের দেওয়া খুঁদকুড়োটুকুও গেল—বিষায়ন নাকি বিশ্বায়ন নাকি নিঃস্বায়নের তালে পড়ে আমার অবস্থা হল—

একটা গান মনে পড়ছে, ছোটবেলায় আমাদের পাড়ায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে চাইতে আসত একজন, খুব চড়া গলা, ভালো ভিক্ষে পেলে পরপর ভক্তিগীতি

শুনিয়ে যেত, আবার পাড়ার অল্পবয়েসী ছেলে-ছোকরারা আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে—বুঝলেন বৌদি, ও বৌদি—সে বেশ রসের গান হত, সে সব গানের দু কলি মনে পড়ছে আমার, গোপিকার সঙ্গে পীরিত করতে গিয়ে কৃষ্ণের যে অবস্থা, বুঝলেন কি না, উপচে পড়া সুখ মুঠোয় ধরতে গিয়ে আমারও—শুনুন, দু কলি—

ঠেঙানির তরে পাদপে উঠিনু—
পড়িনু পুকুর জলে।
সাঁতারে সাঁতারে উঠিতে কিনারে
আছাড়ে পড়িনু খালে।

হাসছেন বৌদি? আমি খালে পড়লাম, আর হাসছেন? তা হাসুন, কেউ হাসছে, দেখেও সুখ, চারপাশে এখন আর হাসিমুখ দেখতে পাই না।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল, বাতাস কিনুন, খাঁটি বাতাস—যে বাতাস আপনাকে লম্বা আয়ু দেবে, রোগমুক্ত জীবন দেবে, আর এই যে আমি খালে পড়েছি, আপনারা যত দলে দলে আমাদের কোম্পানির বোতল-বাতাস কিনবেন ততই আমি সাঁতরিয়ে আবার পাড়ে উঠে আসতে পারব।

বাতাস কিনে আপনি পাবেন আয়ু, রোগহীন জীবন আর বেচে লাভের দু-এক কড়ি ঘরে তুলে আমিও আবার নতুন করে—বাতাস কিনুন, বা-তা-স-কি-নু-ন, আমাদের লাইফলাইন বাতাস, যে সে কোম্পানি নয়, বহুজাতিক, কত রকমের ব্যবসা, লন্ডন নিউইয়র্ক টেকিও—এসব জায়গায় কোম্পানির পেল্লায় আপিস দেখলে পিলে চমকে যাবে! এখন বোতল-বাতাস সবে মার্কেটে ছাড়া হয়েছে, এরপর দেখবেন শচিন-সৌরভ অ্যাড করবে—হুঁ হুঁ বাবা, যে সে বাতাস নয়, লাইফলাইন বাতাস—বলি, ও দাদা, আপনার মনের কথা বলি—

সারাদিন খেটে খাই
মনেতে শান্তি নাই—
যদি একটু খাঁটি বাতাস পাই
খুশিতে বর্তে যাই।

সবই তো গেছে, অন্তত খাঁটি বাতাস না পেলে বাঁচবেন কী করে? বিশেষত শহরে থাকেন যারা, শ্বাসের সঙ্গে বুকের ভেতর কী ঢুকছে বলুন দেখি? সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড—আরও কত কী!

হুসহুস করে গাড়ি ছুটছে, গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে, পিলপিল করে লোক বাড়ছে, পুকুর বুজিয়ে গাছপালা কেটে বাড়ি বাড়ছে, তার ওপর আছে কল-কারখানার বিষ—গাছ নেই তো অক্সিজেনের জোগান নেই, অন্যদিকে বাড়ছে নানারকম মারণ গ্যাসের জোগান, যুদ্ধে মিসাইল ফাটছে, চলছে পরমাণু বোমার টেস্টিং—বলি, খাঁটি বাতাস পাবেন কোথায়?

আমাদের বাপ-ঠাকুদ্দার কাছে শুনেছি তাদের ছোটবেলার অন্তত জল মাটি বাতাসে এত বিষ ছিল না, প্রথম প্রথম বোতল-জল খাওয়া দেখে তো টাকে চুল গজিয়ে যেত আমার বাপের! বলতেন, কালে কালে হল কী দেশের? জল, তাও কিনে খেতে হবে!

হ্যাঁ বাপ, হবে, তাই হবে, বাঁচতে গেলে কড়ি ফেলতে হবে সে জলই হোক আর জলযোগই হোক! কেনা-বেচা ছাড়া জীবন নাই এখন। তবে যিনি মারেন তিনিই রাখেন—এক হাতে জলে বিষ দেবেন, অন্যহাতে তিনিই বেচবেন জলের বোতল!

বিশ্বাস হল না? তা হলে শুনুন, ও দাদা, জলের এক বিখ্যাত নাকি কুখ্যাত কোম্পানি আমাদের দেশেরই কয়েকটা গাঁয়ে এই এ—তো জমির পাতাল থেকে লম্বা লম্বা টিউবওয়েল বসিয়ে জল তোলে, কত জল? আন্দাজ করুন, দশ হাজার লিটার? পঞ্চাশ হাজার লিটার প্রতিদিন? উহুঁ, না গো দাদা, প্রতিদিন ন-দশ লক্ষ লিটার। ওদিকে গাঁয়ের লোক জল পায় না, চাষের জলের কথা ছেড়ে দিন, খাবার জলের কুয়োগুলোও শুকিয়ে যায়, আর প্রতিদিন এত জল তোলায় মা বসুন্ধরার রাগ বাড়ে, জল হয়ে যায় বিষে বিষে নীল—জলে মেশে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম—আরও কত কী! সে বিষ ছড়িয়ে যায় মাটির তলা দিয়ে—কোথা থেকে কোথায় কতদূর—কে জানে! এরকম কত শত গাঁ যে আছে গোটা পৃথিবী জুড়ে।

আবার নদী থেকে সমুদ্র সর্বত্র শ্যাওলা থেকে তিমি যা পাওয়া যায় তাই যাকে বলে একেবারে মন্থন করে নিয়ে এসে বাজারে বেচে ডলারামৃত ট্যাঁকে গোঁজে যে সব বহুজাতিক কোম্পানি, তারা বা তাদের দাদাভাই কোম্পানিরা ওপরের পৃথিবীতে জমানো কারখানার বিষও শেষ পর্যন্ত গুলে দেয় ওই নদী আর সমুদ্দুরেই—জল বিষাক্ত হয়ে দফারফা, পাতাল থেকে নদী সমুদ্দুরের জল বিষিয়ে দিয়ে আবার মজা দেখুন তারাই বোতলে ভরে বিশুদ্ধ জল বিক্রি করে আমায় আপনাকে, আর ওই যে বোতলভরা জল খেলেন আপনি, সেই বোতলগুলো তৈরি করতে বা নষ্ট করতে গিয়েও কত বিষ যে ছড়ায় বাতাসে মাটিতে জলে!

তাই বলছিলাম যিনিই মারেন তিনিই রাখেন, যদি ফেলতে পার কড়ি—

যে হাতে অমৃতজল
সে হাতেই বিষভাণ্ড
এল কী যে ঘোর কলি
কী সর্বনেশে কাণ্ড!

শুধু জলেই তো নয় বাতাসেরও দফারফা করেছেন এরাই, পৃথিবীকে একে বারে খাবলে খুবলে চব্বিশ ঘণ্টার মহাভোজ শুরু করেছেন, ফলে গরম বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে জ্ঞানীজনেরা বলছেন, মেরুদেশে জমে থাকা বরফ গলে জল হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব—তাতেও অবশ্য দমেন না এরা, ভাবুন আমাজনের সেই গহীন জঙ্গল, তার বুক চিরে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, ধ্বংস হচ্ছে গাছপালা পোকামাকড় জীবজন্তু আর সে জঙ্গলই বৃষ্টি আনে

পৃথিবীতে, এখন আগুন জঙ্গলে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হয়ে ওঠে আকাশ, পৃথিবীতে মরুদেশ বাড়ে, বেড়েই চলে!

তা, যে কথা বলছিলাম, ও বৌদিদি, জল যেমন কিনছেন তেমনি বাতাস কেনা ছাড়া উপায় কী? একসময় মা-বাপে বলত, আহা! সন্তান যেন মোর থাকে দুধে-ভাতে, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে ওসব দুধভাতের কথা পরে, আগে খাঁটি জল আর বাতাস তো দিন, কী মাসিমা? ঠিক কি না?

যদি খোকার বাড়াতে চান আয়ু
খোকাকে দিন লাইফলাইন বায়ু।

এই যে দেখছেন বোতল, দেখুন এর মুখ থেকে নল বেরিয়ে আছে, নলটি লাগিয়ে দিন নাকে! ব্যাস, এক বোতলে আধ ঘণ্টা, দেখবেন কেমন তাজা লাগছে! কী ভাবছেন? খাঁটি বাতাস নেবেন বুকভরে কিন্তু তারপর? নিঃশ্বাস ছাড়বেন কী করে, এই তো?

বলছি বলছি, সে ভাবনাও ভেবেছে কোম্পানি, সে যাকে বলে একেবারে আধুনিক, না, না ওই কী যেন শিখিয়ে দিয়েছিল—ও, হ্যাঁ একেবারে উত্তর-আধুনিক ব্যবস্থা, মুখ দিয়ে যা খান হজমের পর বাকি অংশ বের করেন কোথা দিয়ে? হ্যাঁ ঠিক সেই ভাবে, নাক দিয়ে বায়ুসেবন করবেন আর পোঁদ দিয়ে—তাই বলছিলাম, বাতাস কিনুন, বাতাস জানুন, লাইফলাইন কোম্পানির বাতাসের ওপর আস্থা রাখুন!

বাতাস নয় তাজা
বলেন মহারাজা
নাও লাইফলাইন আনি
বলেন মহারানি।

আপনাকে নীরোগ সুস্থ দীর্ঘজীবনের গ্যারান্টি দেবে লাইফলাইন বোতল-বাতাস, বাতাস কিনুন, লাইফলাইন বাতাস কিনুন, বাতাস চিনুন, হ্যাঁ দাদা, চারপাশের বাতাসটাকেও চিনুন, বাতাসের বিষ চিনুন, এত বিষ কী ভাবে এল, কে দিল এত বিষ আকাশে বাতাসে জলে জানুন বুঝুন, নিজের ভেতরের বিষ-বাতাসটাকেও চিনুন জানুন আর যতদিন চিনে জেনে দেখে বুঝে উতে না পারেন—ততদিন আমাদের লাইফলাইন কোম্পানির বাতাস কিনুন, বোতল-বাতাস, দশটাকায় এক বোতল তাজা বাতাস!

না, আমাদের বোতল-বাতাসে কোন রক্ত বা বারুদের গন্ধ নেই, নিশ্চিন্তে কিনুন আমাদের লাইফলাইন বা-তা-স।

খোলা চিঠি, উষসীকে

কে যেন পিছনে এসে দাঁড়ালো।

আকাশ সবে ফর্সা হয়ে এসেছে। একটু পরেই দেখা যাবে রঙের স্নিগ্ধ উৎসব। ঝিরঝির হাওয়া হিমকন্যা হয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছিল।

একটু ঘুরে তাকালাম। শাল-সোয়েটারে মোড়া মহিলাটি যে তুমি, খেয়াল করিনি তখনও। তুমি কি খেয়াল করেছিলে?

এত বছর পর তোমায় দেখব—তা, প্রায় আঠারো-বিশ বছর, নাকি আরও বেশি? যাক, ওসব হিসেব না হয় তুমিই করো। আমি তো বেহিসেবি, বেখেয়ালি—চিরকালই সব হিসেবের বাইরে রয়ে গেলাম।

এত বছর পর দেখব তোমায়—তাও বাংলা থেকে এতদূরে, এক ভোরে—হিমেল হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে পাহাড়চূড়ায় বরফের উপর ভোরের প্রথম আলোর বিচিত্র বর্ণালি দেখতে দেখতে —

সত্যি, অকল্পনীয় বটে! একটু পরে ভোর কেটে সকাল—ভীমাকালী মন্দিরে আরতি শুরু হবে। জান, সে আরতির নাম—শৃঙ্গার আরতি।

উষসী, আশা করি এতদিন পর, সন্তানের মা হয়ে, মধ্যযৌবনে এসে তুমি এখন অন্তত শৃঙ্গার শব্দের ভেতর কোনো অশালীনতার ঘ্রাণ পাও না।

না কি পাও? উষা, উষসী? যাকগে—ও ক'দিনে অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, অনেক পুরানো কথা, স্বপ্ন, স্মৃতি, অনেক জমে ওঠা জমে থাকা কথা, কিন্তু তুমি শুনতে চাওনি। আসলে বলায় এত মগ্ন ছিলে তুমি যে শোনার অবসর ছিল না। হয়তো বা যে অবসর ছিল তা এতই অবসন্নতার ঘামে কাদায় রক্তে পুঁজে মাখামাখি হয়ে—

সরাহনকে ওখানকার মানুষ বাণাসুরের রাজধানী বলে জানেন। বাণাসুর? হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, জানো নিশ্চয়, সেই কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের প্রপৌত্র বাণ। কশ্যপের বড়রানি দিতির গর্ভেই জন্ম হয়েছিল হিরণ্যকশিপুর, তাই বাণ দৈত্য বা অসুর বংশীয়। শিবপুরাণে আছে বাণাসুরের কাহিনি। এছাড়া এ অঞ্চলের লোকসাহিত্যেও বাণাসুরকে ঘিরে অনেক কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। বাণাসুর শিবভক্ত, সাধু-সন্ন্যাসীদের পরম মিত্র, বড় বীর, সহস্রবাহু, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজধানী শোণিতপুর আসলে আজকের সরাহন, ওখানকার মানুষ এরকমই বিশ্বাস করেন।

তা, সন্ধ্যায় মন্দির-চাতালের একধারে বসে তোমায় যখন এসব কথা একটু বলতে চেষ্টা করেছিলাম, তুমি অন্য কোথাও ছিলে, আঠারো-বিশ বছর কি তারও আগে আমাদের সুজন-ডাঙায়, খালধারে—হোগলা পাতা ছাওয়া সেই ঘরে বা অন্য কোথাও—হয়তো সে পৃথিবীর কথা জানি না আমি।

তুমি হঠাৎ বললে, অ্যাঁ? কী বলছ? বাণাসুর? সে আবার কে? আচ্ছা, এত সব জানলে কী করে তুমি?

মে মাসের মাঝামাঝি, সন্ধ্যায় খুব হালকা শীত তখন। মন্দির চত্বর গমগম করছে, প্রচুর ট্যুরিস্ট, অতিথিনিবাসের একটা ঘরও খালি পড়ে নেই। অবশ্য সরাহনে থাকার জায়গা তুলনায় কম, অল্প খরচে ভালো ব্যবস্থা এদের, তা ছাড়া মন্দির থেকেই চারপাশের দৃশ্য এত সুন্দর দেখায়। তোমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিইনি আমি, তুমি আবার বললে, আচ্ছা, মন্দিরের দরজা কি সত্যিই সোনার তৈরি? দেবীমূর্তিও শুনছি সোনার, তাই?

আমি বললাম, সকালে যে বরফে মোড়া পাহাড়চূড়া দেখলে, নাম জান?

হিমালয়।

সে তো সবই হিমালয়—তবুও চূড়ার আলাদা আলাদা নাম থাকে না?

তাই? তা বটে! কী নাম?

শ্রীখণ্ড।

তুমি বলে উঠলে, বউ নিয়ে এলে না কেন?

মন্দির-চাতাল ঘিরে আলো-আঁধারি, অতিথিনিবাসের একটা ঘরের জানলা দিয়ে আলোর আভা একটু, মনে হল সে আলোয় তোমার শরীর ঘিরে কী এক মায়া তৈরি হয়ে উঠতে চাইছিল। তোমার ছোটখাট শরীর আগের থেকে খানিক ভারী, পানপাতা মুখে বড় বড় চোখ, আই লাইনার ছিল কি? অতটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু সেই আলোর মায়ায় আমি বিশ বছর আগের রহস্য খুঁজছিলাম, যে চোখের তারায় একসময় আমার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-স্বপ্ন-ঘুম-জাগরণ—

তুমি ফের বলে উঠলে, কিছু বললে না যে, কী হল?

ফেলে আসা বয়েসের দুষ্টুবুদ্ধি কিলবিলিয়ে উঠল, বললাম, বউ? কোথায় পাব?

মানে? বিয়ে করনি?

না।

শুনে তুমি চুপ। কিন্তু তোমার চোখমুখ জুড়ে একটা বিচিত্র প্রশান্তির হাওয়া খেলে গেল, না তাকিয়েও আমি অনুভব করতে পারছিলাম।

সেদিন সকালে সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তোমার অনর্গল বাচালতায়—রাগ করো না—তোমার অস্থিরতায়, তোমার পতিদেবতাটির সামনে হঠাৎ আমায় নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের উচ্ছ্বাসের অভিনয়ে—অভিনয়? হ্যাঁ, আমি জানি উষু, অভিনয় ছাড়া কিছুই নয়, আসলে রক্ত-মজ্জা-হাড়-মাংস সমেত পতিদেবতাটিকে পুরোপুরি গিলে ফেলতে চাওয়া প্রাণান্তকর চেষ্টায় কিংবা দাম্পত্যের রং-রস-গন্ধ, যদি কোনোকালে একটু-আধটু থেকে থাকে, তাকে ক্রমশ দিনযাপনের ভারবহনের ক্লান্তিতে ধুয়ে মুছে হারিয়ে ফেলার পরিত্রাণহীন বিপদে তুমি খড়কুটোর মতো আমাকে জড়িয়ে একটা—একটা অবাস্তব ঈর্ষাঘন পৃথিবীর

আকার দিতে চাইছিলে—যদি তাতে তোমার স্বামী—

কিন্তু তোমার স্বামী মানুষটির সঙ্গে যতটুকু মিশলাম, বেশ বুদ্ধিমান বলেই মনে হল, তোমার খেলাটি ধরতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। তিনি আশ্চর্য নিরাসক্তি অবজ্ঞার পরম নিশ্চিন্তির দেওয়াল তুলে—

একটু পরেই মন্দিরে শয়ন-আরতি শুরু হবে। জুতো খুলে, দর্শনার্থীরা কেউ কেউ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকছিল, কেউ বা ফিরে আসছিল।

তুমি বললে, কী আশ্চর্য দেখ, সকাল থেকে আমি গলগল করে নিজের কথা বলে গেলাম, অথচ তোমার খবর সে ভাবে, মানে—

আমি হেসে বললাম, এই ভীমাকালী মন্দিরের ভেতর আরও তিন মন্দির রয়েছে।

তাই বুঝি।

রঘুনাথ মন্দির, নৃসিংহ মন্দির আর পাতাল ভৈরব মন্দির। শোনা যায়, একসময় পাতাল ভৈরব মন্দিরে নরবলি হত।

নরবলি! তুমি একটু চমকে উঠে তাকালে আমার দিকে, তোমার দৃষ্টিতে মায়া, তোমার মুখে ভয়-বিস্ময়ের সামান্য রেখা—ভারী ভালো লাগছিল আমার।

মনে আছে, কোচিং থেকে ফেরার পথে রাস্তার মোড়ে তোমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে—তুমি আমার কথা শুনছ মুখ নীচু করে ভীরু মনে—হঠাৎ বলে উঠলাম, এই রে! মেসোমশাই! তুমি ভয়ে নীচু মুখ আরও নীচু করে জোরে হাঁটতে শুরু করলে, তারপর একটু এগিয়ে মুখ তুলে ফাঁকা রাস্তায় কাউকে দেখতে না পেয়ে রাগে লাল হয়ে হনহনিয়ে হেঁটে—

সে ছবি এতবছর পরেও আমার বুকের ভেতর কেমন স্পষ্টতায় গেঁথে আছে।

ভয়-বিস্ময় কাটিয়ে তুমি বলে উঠলে, সত্যি, একসময় মানুষ যে কত অসভ্য—আচ্ছা, ওরা বলি দিয়ে কি মাংসও খেত নাকি? বাব্বা! —বলতে বলতে গায়ের চাদর আরও আঁটোসাঁটো করে জড়িয়ে নিচ্ছিলে তুমি।

নরবলি কি এখন পৃথিবী থেকে উঠে গেছে? তাই ভাব তুমি? মানুষ কি সভ্য হয়েছে, নাকি নরবলি দেওয়ার আরও উন্নত আয়োজন করেছে?

তুমি চুপ। চাতালে বাচ্চারা হুটোপাটি দৌড়ঝাঁপ করছে। ক্যান্টিন থেকে দু'কাপ চা এল। আরেক দল এসে ঢুকল মন্দির চত্বরে, নতুন ট্যুরিস্ট।

ছাড় ওসব কথা। সত্যিই বিয়ে করনি?

মিথ্যে বলব কেন?

না, তা নয় মানে—দিল্লিতেই কি পাকাপাকি—মানে ফ্ল্যাট কিনেছ?

পাকাপাকি বলে কিছু হয়?

একইরকম রয়ে গেছ তুমি, হেঁয়ালি ছাড়, উত্তর দাও আমার কথার।

হেঁয়ালি? আচ্ছা, এ পৃথিবীতে পাকাপাকি থাকতে কে আসে বল? আমি তুমি কোন ছার! খোদ পৃথিবীই পাকাপাকি কোনো বন্দোবস্ত নয়, দুই হিমযুগের মাঝখানে পৃথিবীতে এই প্রাণের উৎসব—

আবার ফালতু কথা!

ফালতু কী আর আসল কী—এর বেলা পাকা হিসেবের খাতা আছে তোমার, না?

উফ্!

এভাবেই চলছিল আমাদের কথোপকথন। কিন্তু তুমি যে কেজো কথামালা জেনে নিতে চাইছিলে—আমার এখনকার জীবন, কেন একা এখানে এসেছি, বেড়াতে, না অন্য কোনো কাজে—এসব প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠছিলে তুমি।

এখন বলি, দিল্লিতে আমি আছি বছর পাঁচ, এর আগে ছিলাম এলাহাবাদ। ডেইলি কাগজের পুরানো চাকরি ভালো লাগছিল না, স্পেশাল করেসপনডেন্ট হিসাবে দিনরাত রাজনীতির কচকচি নিয়ে থাকতে হত। ছেড়ে দিয়ে, দিল্লিতে মাস্থলি এই ম্যাগাজিনটায় যোগ দিলাম, এটা একটা এন জি ও'র কাগজ, মূলত পরিবেশ, তাছাড়া শিল্প-সাহিত্য-ভ্রমণ নিয়েও কাজ করে ওরা। কাজের সূত্রে গোটা দেশের আনাচ-কানাচ ঘোরা হয়ে যাচ্ছে আমার, রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই চলছে।

তোমার কি মনে পড়ে আমাদের সেইসব কচি আলোর নরম স্বপ্নের সকাল সন্ধেয় তুমি বলতে, তোমার মানালি বেড়াতে যাওয়ার খুব শখ! সরাহন-সাংলা-কল্পা হয়ে মানালি ঘুরে ফিরলে, কেমন লাগল মানালি? কী বিশ্রী বাজার হয়ে গেছে, না? অথচ আমাদের স্বপ্ন-কল্পনার মানালি আজকের সরাহন-সাংলার চেয়েও কত সুন্দর ছিল!

যাক সে কথা, এবার স্পষ্ট করে বলি তোমায়, বউ নেই আমার মানে বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু সম্পর্ক টেকেনি। তবে বান্ধবী জুটেছে বিস্তর। এখন বছর তিন এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকি। হেমা, হিমাচলের মেয়ে, বাচ্চা নিয়ে একাই থাকত দিল্লির ময়ূরবিহারে, এখন আমি এসে জুটেছি। বাইরে এলে ও মাঝে মাঝে আসে আমার সঙ্গে, তবে নাচের স্কুলের দিদিমনি তাই সবসময় পেরে ওঠে না। সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পারছি না, এখনও পর্যন্ত বনিবনায় আমাদের অসুবিধা নেই কোনো, তবে বন্ধুত্ব আর দাম্পত্য যে এক নয়, সে তো জান তুমি।

সেই সন্ধ্যায় মন্দির-চত্বর ছেড়ে এগিয়ে অন্ধকারে বেশ খানিকটা হেঁটেছিলাম আমরা। ঘন অন্ধকার, যেতে চাইছিলে না প্রথমে। তারপর দাম্পত্য অসুখের নানা টুকরো কথা শোনাচ্ছিলে আমায়। অনুভব করছিলাম কত বদলে গেছ তুমি! স্বপ্ন-সাধ-কল্পনা সব মুছে গেছে—শুধু মাপজোখ, হিসাবের খতিয়ান! সরাহনে এসে তুমি পাহাড় দেখনি, প্রাণভরা সবুজ দেখনি, হাজার হাজার বছরের পুরানো সভ্যতার অবশেষ কিংবা বিবর্তন যতটুকু সম্ভব চিনে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করনি, বরফচূড়ায় আলোর বর্ণালীও বোধহয় টানেনি

তোমায়—তুমি শুধু তোমার আটত্রিশ বছরের জীবনে মোটা দাগের লাভ-ক্ষতির খতিয়ান খুলে খুলে—

অনেকটা পথ চলে এসেছিলাম আমরা। ফেরার পথে ভীমাকালী মন্দিরের কথা বলছিলাম আমি, শুনছিলে কি?

ভীমাকালী মন্দির বহু প্রাচীন। বুশাহর রাজবংশের স্থাপনা। দেবীকে নিয়ে নানা উপাখ্যান পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণে, দুর্গা সপ্তশতীতে, জন্মকাহিনি হুবহু আমাদের দুর্গা ঠাকুরের মতো। মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ এইসব অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একশো বছর যুদ্ধ করেও হেরে গেলেন। অন্য দেবতা ও মুনিঋষিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেবের বরেই এইসব রাক্ষস-অসুরেরা এত শক্তিশালী অজেয়, কিন্তু মহাদেব তাঁর দেওয়া বর ফিরিয়ে নেন কী করে? মহাদেব বললেন, ভগবান ব্রহ্মার কাছে যেতে, কিন্তু ব্রহ্মাও তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন। অবশেষে বিষ্ণু ভগবানের শরণ নিলেন ইন্দ্র সহ দেবতা ও ঋষিরা, তাঁদের কাছে অত্যাচারের কাহিনি শুনে ক্রুদ্ধ বিষ্ণুর মুখ থেকে তেজ বেরিয়ে এল, সঙ্গে যুক্ত হল অন্য দেবতাদের তেজ, সেই তেজের মিলিত রূপ থেকেই জন্ম নিলেন ভীমকায় এক কন্যা, যিনি আদি শক্তি, ভীমাকালী!

রাতে বিছানায় শুয়ে এসব পুরাণকথা ভাবতে গিয়ে এদেশের কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। দেবতা ও অসুরের এসব বৃত্তান্তে আর্য-অনার্য মানবগোষ্ঠীর নানা যুদ্ধ আর মিলনের ছায়াপাত—জয়ী আর্যদের হাতে জয়ের এক ইতিহাস গড়ে তোলার চেষ্টা—কত হাজার বছর আগে এ দেশে প্রাক-বৈদিক যুগেও সমৃদ্ধ নগর ছিল, ছিল নাগরিক সভ্যতা, অরণ্যচারী যাযাবর বেদভক্তদের সঙ্গে কত সংঘর্ষ ও মিলন, পুর বা নগর ধ্বংস করেই ইন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন পুরন্দর—একসময় তুমি মনোযোগী পড়ুয়া ছিলে, ইতিহাস বড় প্রিয় বিষয় ছিল তোমার—কেমন অস্থির লাগল, মনে হল, যাই দু'দণ্ড কথা বলি তোমার সঙ্গে—কিন্তু অত রাতে হয় কি তা? বারান্দায় একা একা হাঁটি, রাত গভীর হয়।

পরদিন শৃঙ্গার-আরতির পর ভোগ-আরতি, তার আগে পুজো দিয়ে এলে তুমি। তারপর জলখাবার খেয়ে তোমার স্বামী, ছেলে, তোমাদের দলের সবার সঙ্গে আশপাশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরুলাম আমরা। মন্দিরের উলটোদিকে বুশাহর রাজাদের প্রাসাদ, এখন তালাবন্ধ, প্রাসাদ-চত্বরে ঘুরে ঘুরে অনেক সময় গেল, সামনে ঘাসের চমৎকার লন, প্রাসাদের ছবি তুলতে যখন প্রায় এক রিল শেষ হয়ে এল আমার , ওরা বেরিয়ে পড়লেন, তুমি থেকে গেলে আমার সঙ্গে, বললে—তোমরা যাও, অনিকে নিয়ে আসছি আমি।

ঝকঝকে আকাশ, মিষ্টি রোদ্দুর। নির্জন প্রাসাদ, ঘাসের বিছানায় এলিয়ে পড়লে তুমি। এলানো শরীর বেঁকেচুরে কেমন উদ্ধত করে চোখের তারায় কেমন এক সম্ভোগের মায়াবী আলো এনে বললে, ছবি তোল অনি।

তুলেছি তো।

সে তো প্রাসাদের ছবি।

কেবল জড়, মরা জিনিসে আগ্রহ তোমার?

না, তা কেন? প্রাসাদ মরা হলেও হতে পারে গাছপালা, পাহাড় ঝর্না তা নয়, তা ছাড়া—

কী?

এই প্রাসাদও একসময় জ্যান্ত ছিল।

বাজে কথা রাখ, জ্যান্ত—এখনও জীবন্ত, বেশ ছুঁয়েছেনে তাপ অনুভব করা যায় এমন কিছুতে আগ্রহ নেই তোমার? তোল দেখি আমার একটা চমৎকার ছবি!

তুমি নানা পোজ দিলে, পরপর বেশ কয়েকখানা ছবি তুললাম আমি। ছবি ভালো হয়নি, না—বেশ উজ্জ্বল ঝকঝকে, তোমার সাজপোশাকও বেশ পরিপাটি, হালকা কচি কলাপাতা চুড়িদার পাঞ্জাবি, বুকখোলা সাদা জ্যাকেট, কচি কলাপাতা টিপ, চোখে রোদ চশমা—তবুও কোথায় যেন একটা ফাঁকি—কী জানি এ আমার ক্যামেরা নাকি নিজেরই চোখের দোষ!

ছবি তোলা শেষ হতে তুমি কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করলে, হাত ধরে টানতে টানতে আমায় প্রাসাদের বাইরে নির্জন পাহাড়ি রাস্তার ধারে টেনে নিয়ে এলে—অথচ তখন আমি তোমায় বাণরাজার দেশের উষা আর অনিরুদ্ধর প্রণয় কাহিনি শোনাতে চাইছিলাম।

বাণরাজার দেশের অনেক নাম—শোণিতপুর, লোহিতপুর, বাণপুর। শিবভক্ত বাণাসুরের মেয়ে উষা পাবর্তীর বরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধর সঙ্গে মধুমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে যৌনসংসর্গ করলেন। ফিরে গেলেন অনিরুদ্ধ, কিন্তু উষা তাঁর বিরহে কাতর। তা, প্রাণের সখী চিত্রলেখাকে সব কথা খুলে বলতে চিত্রলেখা প্রতিজ্ঞা করলেন যেভাবেই হোক প্রিয়সখীর প্রেমাস্পদকে তিনি তাঁর কাছে এনে দেবেন। কিন্তু উষা তার নাম জানেন না, কোথায় থাকেন তিনি তাও জানেন না। চিত্রলেখা সব দেবতার ছবি আঁকলেন—উষা বললেন, না এঁরা কেউ নয়। সত্যি উষসী, আমার যদি এরকম একজন চিত্রলেখা থাকত! যাকগে, শেষ পর্যন্ত যদু বংশীয় পুরুষদের ছবি এঁকে দেখানোর পর উষা অনিরুদ্ধকে চিনতে পারলেন। চিত্রলেখা শ্রীকৃষ্ণের ভবনে গিয়ে তামস যোগবলে চারিদিক অন্ধকার করে একেবারে শয্যাসমেত অনিরুদ্ধকে তুলে নিয়ে এলেন প্রিয়সখীর কাছে। যদিও এ কাহিনিতে চিত্রলেখার সাইড রোল, তবুও সত্যি বলছি আমি চিত্রলেখাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। যেমন বীরঙ্গনা, তেমনই বন্ধুপ্রীতি, ভাবা যায়! অনিরুদ্ধকে যখন আকাশপথে মাথায় করে নিয়ে আসছিলেন চিত্রলেখা, তখন অনিরুদ্ধ তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিছানায় বসে একটু মদ্যপান করছিলেন। দেখ, তখনকার দিনে নারী-পুরুষের প্রণয়ে যৌনতার ভূমিকা নিয়ে কোনো ন্যাকামি ছিল না, একজন নারী বা পুরুষ জীবনভর কেবল একজনকে নিয়েই বিভোর থাকবে এসবের বালাইও ছিল না, কেউ যদি দেবদেবীর কাছে বর চায় যে আমার অমুককে ভালো লাগে আমি অমুককে চাই,

সে বিবাহিত না অবিবাহিত এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না দেবদেবীদের।

যাক, তারপর উষা আর অনিরুদ্ধকে নিয়ে অনেক কাণ্ড! বাণপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেল শ্রীকৃষ্ণের, মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন শিব, শিবের আদেশ মেনে নিলেন দু'জনেই। উষা ও অনিরুদ্ধর বিয়ে হয়ে গেল এবং বাণাসুর শিবের কাছে বর প্রার্থনা করলেন যে, উষা ও অনিরুদ্ধর পুত্রই শোণিতপুর তথা সরাহনের রাজা হবে, ওই বংশের দৈত্যভাব চিরকালের জন্য মুছে যাবে। শিব বললেন, তথাস্তু। ওদের পুত্র প্রদ্যুমন থেকে শেষ শাসক বীরভদ্র সিংহ, ওই বংশেরই শাসন ছিল বুশহর তথা সরাহনে।

এখন, লিখছি যখন, বৃষ্টি এখানে। অনেক রাত। কান পেতে শুনছি কীভাবে রুক্ষ রাজপথে কংক্রিটের উঠোনে ইউক্যালিপটসের পাতায় মায়াবী শব্দে এলিয়ে পড়ে অগণন জলবিন্দু।

সে রাতে সরাহনেও বৃষ্টি নেমেছিল। সারাদিন স্বামী-পুত্রের সামনেই সকাল-দুপুর-বিকেলে আকারে ইঙ্গিতে শরীরী উচ্চারণে কী এক তীব্র আকুলতা ছিল তোমার—তাকে কেবল এক হিসেবি অভিনয় মেনে নিতে বিষাদে ভরে ওঠে মন, সে আকুলতায় আমাদের ফেলে আসা কচি আলোর নরম স্বপ্নের ছায়া দেখতে চাইছিলাম আমি।

মনে পড়ছিল, কীভাবে সরস্বতী পুজোর দিন দল বেঁধে ঘুরতে বেরিয়ে ভিড়ের থেকে হঠাৎ আলাদা হয়ে আমার সঙ্গে হেঁটে যেতে রাজপথ ছেড়ে গলিপথের নির্জনতায়। কত টুকরো টুকরো গান শুনিয়েছ, আমি শুনিয়েছি কবিতা। সিনেমা হলে যাইনি কোনোদিন, হলের অন্ধকারকে বড় ভয় ছিল তোমার, সে অন্ধকারে বুঝি প্রেমিকরা দানব হয়ে গিয়ে প্রেমিকার শুদ্ধতা কেড়েকুড়ে নেয়—এমনই ভাবতে তুমি, নাকি?

কত বছর আগের একদিন, নাকি পূর্বজন্মের—জেলে-ডিঙি বেয়ে খালের ওপার থেকে এপারে সুজনডাঙায় আমরা দু'জন, একটু পরেই বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নামবে, বৃষ্টি-ঝমঝম বিকেলে হোগলাপাতা ছাওয়া সেই নিঝুম ঘরের মুখে দু'জন আমরা—গান গাইছিলে তুমি, মধ্যলয়ে, হাতে তাল রাখছিলাম আমি—রিমিকি ঝিমিকি ঝরে শ্রাবণের ধারা—আমি হঠাৎ জড়িয়ে ধরলাম তোমায়, তীব্র চুমোয় চুমোয়—তুমি ছাড়াতে চাইলে, ফিসফিস করে শাসন করলে, তারপর চিৎকার—অসভ্য, ইতর কত বিশেষণ জুটল আমার—চিৎকারে, সার দেওয়া জেলে-ডিঙি থেকে ছুটে এল জনা কয়, তারপর—সেই তো শেষ—শেষ রূপকথা আমাদের।

সুজনডাঙা তখন পুরোপুরি কলোনি। কলোনি-মন সবকিছু আগলে রাখতে চায়, জন্ম থেকে নিরাপত্তাহীনতার বোধে ভেতরে ভেতরে বড় ভয় তার। কীভাবে সব জানাজানি হল, এবাড়ি ওবাড়ি, শরীরী সংস্কারের চেনা বোকা বোকা ছকে তুমিও বন্দি তখন, কামহীন বিশুদ্ধ প্রেমের ধারণায় এই ভয়ংকর অসভ্য দানবের হীন আক্রমণে ভীতচকিত তুমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে—শেষ হয়ে গেল রূপকথা আমাদের।

হু হু হিমেল হাওয়া। বৃষ্টি আর হু হু হিমেল হাওয়া সে রাতে বাণরাজার দেশে। হাজার হাজার বছর পথ হেঁটে আমি অনিমেষ—না , না, অনি, অনিরুদ্ধ পেছনে চলে এলাম। চলে

এলাম তীব্র প্রেমে, যে প্রেমে ভণিতাহীন জড়িয়ে থাকে আকুল যৌনতা, উষা এসে দাড়াঁয় আমার সামনে—

আমি একালের অনিরুদ্ধ, আমার কোনো চিত্রলেখা নেই। কত যুগ ধরে শেকলে পেঁচিয়ে বেঁধে রেখেছি আমি উষাকে, শেকল খুলে দিলেও হাঁটতে পারে না উষা, উড়তে পারে না উষা, যদিও বা অবেলায় ওড়ে, সেখানেও লেগে থাকে শেকলের বিশ্রী দাগ!

তবু উষু, উষা, উষসী—তুমি এসে দাঁড়ালে আমার সামনে। আমি চাইছিলাম, সরাহন থেকে সেই রাতে তোমাকে নিয়ে পাড়ি দিই কোন্ দূরদেশে—আমার কোনো চিত্রলেখা নেই, শিবঠাকুর নেই কিন্তু আমার মরা গাঙে জোয়ার এল, আমি তোমায় নিয়ে বরফচূড়ার বর্ণালীর কাছে উড়ে যেতে চাইছিলাম।

জানলায় হাওয়ার খটখট, আমি হারিয়ে ফেলা কোনো গন্ধ খুঁজছিলাম। তোমার এলোমেলো চুল, তোমার বুজে থাকা চোখ, তোমার গাল, তোমার বুক—সবকিছুর ভেতর আমি খুঁজছিলাম হারিয়ে যাওয়া কোনো গন্ধ। বাইরে বৃষ্টি, হু হু হিমেল হাওয়া, জানলায় বৃষ্টি-বাতাসের উচ্ছ্বাস, আমার শরীরে তোমার নিশ্বাস কণা, আমার গালে তোমার অশ্রুবিন্দু, আমার চোখে তোমার এলোমেলো চুলের ঝাপট—

সরাহনে সে রাত্রির আশ্চর্য বৃষ্টি হাওয়া আর অন্ধকারে সৃষ্টি হতে চাইছিল নতুন এক পুরাণকথা, স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনার গভীর থেকে উঠে এসে সে পুরাণকথা বাইরের বৃষ্টি আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে ঘরের অন্ধকারে এক আশ্চর্য মিথুনমূর্তির আকার পেতে চাইছিল—

তারপর? তুমি কি সত্যিই এসেছিলে আমার ঘরে? আমি কি দেখেছিলাম এমন এক মানবীকে যে আমার উষসী নয়, উষা নয়, যে উষসীর ঘ্রাণ আমার আত্মার গভীরে প্রেমতৃষ্ণার শান্তিসুধা ঝর্নাধারা হয়ে বেঁচে আছে কত দিন মাস বছর জুড়ে—যার সন্ধানে আজও ছুটে বেড়াই আমি, স্ত্রী চলে যায়, বান্ধবী ছেড়ে যায়, তবু সেই সন্ধান—সে হারিয়ে ফেলা গন্ধ কই? কই সে উষসী? তুমি সে নও।

আমি কি রূঢ় হয়ে উঠেছিলাম সে রাতে? তুমি কি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছিলে?

নাকি সরাহন-বাণরাজার দেশে, পুরাণকথা থেকে উঠে এসেছিল অন্য কোনো উষা—নতুন পুরাণ গাঁথা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল?

তবু বেঁচে থাক আমার কুড়ি বছর আগের—যেন বহুযুগ ওপারের ধূসর স্বপ্ন-স্মৃতি-পুরাণকথা—আমার হারিয়ে ফেলা গল্পের খোঁজ।

উষসী, তোমাকে আর দেখতে চাই না আমি।

মহেঞ্জোদড়োর নগ্নিকা

সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদড়ো থেকে উঠে আসা সেই নারী—কোমরে হাত দিয়ে যেন কুঁদুলে ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সেই নগ্নিকা—কিছু বলছিল কি আমায়?

স্বপ্ন থেকে নয়, আমি যেন স্বপ্নের ভেতরে জেগে উঠেছি! ফিনফিনে অন্ধকার, জানলার ওপারে মেঘলেপা এক টুকরো আকাশে ভোরের পানসে আভা। বৃষ্টি থেমেছে কি?

মশারির ঘেরাটোপে বিছানায় একা আমি। জানলার ধারে ফিনফিনে আঁধারে মৃদু আলোর রেখা ছড়িয়ে সেই নগ্নিকা, মহেঞ্জোদড়োর সেই বহু পরিচিত তাম্রমূর্তির মতো ভঙ্গি—কোমরে সরু লম্বা হাত ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে, রোগা টিঙটিঙে শরীর, স্তন দুটি এত পুচকে যে আছে কি নেই বোঝা ভার, ডান হাত ডান উরুর ওপর, হাঁটু একটু ভেঙে পা দুটো ফাঁক, গলায় হার—দেখতে দেখতে আমার মুখে জল উঠে এল। আমার শরীর কি জেগে উঠছিল? বিছানা ছেড়ে নেমে আসতে চাইলাম আমি, পারলাম না।

বাইরে কি ঝিরঝির ঝরছে ফের? কাল রাত থেকে কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি—অম্বুবাচির ব্রত উদযাপনের সময়, মা বসুন্ধরা ঋতুমতী এখন। কোথায় যেন ঢাকের বাজনা, ছায়া ছায়া দেখতে পাই নগ্ন শবর পুরুষেরা পুরুষাঙ্গে গাছের পাতা জড়িয়েছে, কাদা মেখেছে সর্বাঙ্গে, ঢাকের তালে তালে নানা যৌন অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে—এসব না করলে যে দেবী ভগবতী রাগ করবেন!

অস্ফুট স্বরে আমি বুঝি কিছু বলতে চেষ্টা করলাম—জানলার ধার থেকে একটু একটু করে মুছে গেল সেই মোহিনী, মহেঞ্জোদড়োর মোহিনী। সে কি বলছিল কিছু? অভিশাপ দিয়ে গেল কি আমায়? আমার শরীর জাগল, শুধুই শরীর? নাকি শরীর ও মন কিংবা মনের শরীর? নাকি সবই মিথ্যে স্বপ্নের মিথ্যে জেগে ওঠা?

আমি বিছানা ছেড়ে না পারলাম তার সামনে পুরুষসিংহ হয়ে দাঁড়াতে, না পারলাম আমার সমস্ত ইচ্ছার জোর দিয়ে তাকে আমার কাছে টেনে আনতে!

শবরদের ঢাকবাদ্য শুনতে পাচ্ছি আমি, কিন্তু ওদের সঙ্গে তালে তালে নাচতে পারছি না, স্বপ্নের ভেতর ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আমি উচ্চারণ করতে চেষ্টা করছিলাম—হে দেবী ভগবতী, হে মহাশক্তি, হে আদিপুরুষ...।

গল্পটা কিছুতেই এগোচ্ছে না। সকাল থেকেই লেখার টেবিলে, ভাবছি, এক-দুই লাইন লিখছি, কাটছি, নানারকম স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, একটা ঘোর লাগা ভাব—এভাবেই চলছে। বাইরে অবিরাম বৃষ্টির আবহাওয়ায় মনের ভেতরেও যেন অবসন্ন ভেজা বাতাস, সে বাতাস বুঝি পাতলা কুয়াশা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে ঘরে।

গল্পের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধু উদয়ের খুব মিল। মিল মানে আসলে

উদয়কে নিয়ে ভাবতে ভাবতেই মাথায় আসে গল্পটা।

দিন পনেরো আগে হঠাৎ সন্ধেবেলায় উদয়ের উদয় আমাদের বাড়ি। ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত এক ক্লাসে পড়াশোনা-খেলাধুলা-গলাগলি-মারামারি আমাদের। এক শহরে থাকলেও এখন আর আগের মতো নিয়মিত সকাল-সন্ধে কেয়ার অফ চায়ের দোকান যোগাযোগ নেই, আড্ডাবাবু প্রায় নিরুদ্দেশ। মাঝে মাঝে ফোনে দু তরফেই দেখাসাক্ষাৎ না হওয়ার হাহুতাশ, অনুযোগ বা সংসার বিষয়ক দু-একটা কেজো কথার দেওয়া-নেওয়া। ওর ব্যবসা, আমারও নানাবিধ ব্যস্ততা—ফলে জমিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া আর গলদা চিংড়ি খাওয়া প্রায় একই ব্যাপার এখন।

ওকে দেখেই মন বেশ খুশিতে জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা ক্ষণিকের, দু একটা কথার পর একটু জরিপ করতেই বুঝলাম মন ভালো নেই বন্ধুর, কিছু একটা গোলমাল পেকেছে। না, উস্কোখুস্কো চুলে চেহারা যে খুব উদভ্রান্তের মতো বা বেশভূষায় খুব আলুথালু তা নয়, বাইরে থেকে বোঝা শক্ত যে ওর ভেতরে কোন কষ্ট, কোন উথাল-পাথাল ঢেউ। আসলে সেই ফাইভ থেকে—তখন দশ-এগারো আর এখন চল্লিশ-একচল্লিশ—পাক্কা তিরিশ বছর, ওকে দেখে ভেতরের ঝড়-তুফান আমি না বুঝলে আর কে বুঝবে?

উদয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ছোটবেলা থেকেই বেশ স্বাস্থ্যবান, শক্তসমর্থ, লম্বা, এখন একমাথা কাঁচাপাকা চুল। চুলটা ওর তাড়াতাড়িই পেকে গেল। বেশ গরম সেদিন। বাইরে অল্প হাওয়া। ছাদে মাদুর পেতে বসলাম দুজনে। জিজ্ঞেস করতে হল না কিছুই, ও নিজেই বলল সব।

একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছে উদয়। বছর দুই হল, সাধ করে যে দেরি করেছে এমন নয়, সমস্যা ছিল। তিন ভাই-বোনের মধ্যে ও বড়, নীচে দু বোন। যখন সবে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, মেসোমশাই মারা গেলেন। খুব লড়তে হয়েছে তারপর, বাবার নড়বড়ে ফার্নিচারের ব্যবসার খোলনলচে বদলে শক্ত ভিতে দাঁড় করানো, বোনদের বিয়ে, মাথা গোঁজার পাকাপোক্ত ঠাঁই গড়া।

তা, উদয় শুরু করল, বুঝলি কুশল, মুক্তির সঙ্গে থাকা যাবে না বোধহয়!

কথাটায় খুব একটা গুরুত্ব দিইনি আমি। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে হয়তো, এরকম তো হয়েই থাকে, আবার দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। উদয়ের বউ মুক্তি, বেশ সপ্রতিভ মেয়ে, নিজের উদ্যোগে একটা ছোট এনজিও গড়ে তুলেছে, অসহায় গরিব মেয়েদের জন্যে নানারকম কর্মসংস্থানের চেষ্টা করে ওদের সংগঠন। সংগঠনের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য নিতে গিয়েই উদয়ের সঙ্গে আলাপ, পছন্দ হয় উদয়ের, তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই বিয়ে।

আমি বললাম, কেন? দু বছরেই—আমার তো দশ বছর কাটল!

মুক্তি ফ্রিজিড্, সেক্স ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিতে চায় না।

নড়চড়ে বসলাম, বিষয়ের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম হল এবার, এতো ঠিক রুটিন দাম্পত্য ঝগড়া

নয়। উদয় বলে চলে, মুক্তি ভাবে এই সেক্স-টেক্স ব্যাপারগুলো খুব নোংরা কাজ, একটা কাদা ঘাঁটাঘাঁটি, এসব যত কম হয় তত ভালো। বোঝাতে গেলে উল্টে জ্ঞান দেয়, তুমি কি শরীর ছাড়া আর কিছু বোঝ না? যত্তসব, নতুন বিয়ে আমাদের, এখন তো একটু ঘনঘন— উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, আস্তে, কারণ লাগোয়া বাড়ির ছাদে অন্ধকারে আমি দু-একজন উৎসাহী শ্রোতার উপস্থিতি অনুভব করছিলাম।

বললাম বটে, কানে নিল না উদয়, বলেই চলল—হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ সম্পর্কে সেক্সচুয়ালিটি ছাড়া কোন ভালোবাসা-টাসা হয় তুই বল, প্রথমে ভাবলাম মেডিক্যালি ফিট তো? যে গাইনোকে দেখায় তার সঙ্গে আলাদাভাবে মিট করলাম, তিনি সাজেস্ট করলেন কোনো কাউন্সেলার—সে কথা বলতেই খেঁকিয়ে উঠে যা-তা খিস্তি করল আমায়। অতই যদি ইয়ে তা'লে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকলেই পারত—বিয়ে করা কেন বাপু!

আমি নীরব শ্রোতা, আচমকা এমন একটা সমস্যার কথা বলছে যে চটজলদি বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মৃদু মন্দ হাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল, ফের গুমোট, ঝড় উঠবে নাকি!

অনু, আমার বউ, চা নিয়ে এল। একটু অন্য খাতে গড়াল কথাবার্তা, ফের শুরু করল উদয়, মুক্তির বিরুদ্ধে একটানা বলে গেল, তবে যৌনতা সম্পর্কিত বিষয়টি উহ্য রেখে। অনু একটু পরেই উঠে গেল, মনে হল বিরক্তি বোধ করছে।

আমিও চুপ, একটানা আরও খানিকক্ষণ বকবক করে মনের ভার বোধহয় একটু হালকা করে চলে গেল উদয়।

কিন্তু আমার মনে ফুটল ভাবনা স্রোত, লিখতে বসে উদয়ের কথা মনে পড়ে, ভাবলাম উদয় মুক্তিকে নিয়ে একটা গল্প লিখলে কেমন হয়? শুরু হল যেটুকু শুনেছি তার সঙ্গে আমার কল্পনার মিশেল—কিন্তু সেভাবে হচ্ছে কই? ঠিক যেন দানা বাঁধছে না, আজও বাইরে অঝোর ধারা অথচ কুশল রায়ের কলম খটখটে!

এমন বৃষ্টিদিনের অলস দুপুরেই বোধহয় স্মৃতি সজীব হয়ে ওঠে, ধেয়ে আসে ভাবনা। বৃষ্টি, কেবল বৃষ্টি সারাদিন। তবু কোনো মধুর স্মৃতিবিলাসে মগ্ন হতে পারি না আমি, যে দিন যে মানুষ চলে গেছে তার সব ভালো এমন ভাবতে পারি না, আমার প্রশ্নাতুর বিশ্লেষণী মন কাটাছেঁড়া করে, বিশেষত স্মৃতি ও ভাবনার কেন্দ্রে যখন এসে যায় যৌনতা, তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে কিছু তেতো স্মৃতি না এসে উপায় কি! আসলে উদয়-মুক্তিকে ঘিরে গল্প লিখতে গিয়েই যৌনতা প্রসঙ্গে নানা ভাবনার ডানা ঝটপট।

আমাদের মতো শিক্ষিত (প্রকৃত অর্থে নয়) মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে যৌনতাকে যেন একটা নিষিদ্ধ গোপন পাপ কাজের বিষয় হিসেবে দেখা হয়। মনে পড়ে, ছোটবেলায় শুক্রবার আটটায় বা শনি-রবিবার দুপুরে রেডিওতে নাটক হত, তখন টিভি আসেনি বা সবে এসেছে,

রেডিওই বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ঘরে ঘরে। একটা আধবুঝো বয়েসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অনেক কিছুই রহস্যময় আমাদের কাছে। তা সেই নাটকে কান পাতলেই, হয়তো নাটকের কোন সংলাপে বা সিচুয়েশনে একটু-আধটু যৌনতার ইঙ্গিতমাত্র, বাবা বলতেন, কী শুনছ? যা—ও, বড়দের নাটক শুনবে না। তাতে অবশ্য আমাদের কৌতূহল আরও বাড়ত, বাবারা যত দেবশিশু করে গড়তে চাইতেন আমাদের, আমরা ততই বোধহয় ইঁচড়ে পাকা হওয়ার দিকে তরতরিয়ে এগিয়ে যেতাম।

এখন টিভির সামনে বাপ-মা ছেলেমেয়ে বসে এমন সব বিজ্ঞাপন বা সিনেমা দেখি, আমাদের ছোটবেলায় তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। তবে অনেকটা খোলামেলা হলেও যৌনতা নিয়ে সেই গোপন পাপকাজের অনুভব বোধহয় এখনও মনের পাতালে খুব শক্ত পোক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। টিভি এসে আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে খুব পাকিয়ে তুলছে, যৌনরাক্ষস গিলে ফেলছে ওদের, সুকুমারমতি বালকেরা ঋতুমতী বালিকা খুঁজে বেড়াচ্ছে—এরকম শঙ্কা বোধহয় আমাদের অনেককেই ঘিরে আছে।

মায়ের কথা মনে পড়ে, যৌনতা তো দূরের কথা নারী-শরীর সংক্রান্ত স্বাভাবিক কোন কথাও যেন তার সামনে বলা খুব দোষের ছিল। একবার, তাও তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস আমার, কী একটা কথায় কার সম্পর্কে বলেছিলাম—ওর পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে; ব্যাস! মা চোখমুখ কুঁচকে বললেন, চুপ কর, আর শুনতে চাই না। আমারও যেন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়েছিল, সত্যিই তো মায়ের সামনে এসব কথা উচ্চারণ করা উচিৎ!

আচ্ছা এইটাই কি ভালো? নাকি খোলামেলা হওয়া ভালো? যৌনতা নিয়ে খোলামেলা হলে কি নারী-পুরুষ খুব অসংযমী হয়ে যাবে? ঠিক বুঝতে পারি না, বিভ্রান্ত লাগে। লুকোছাপা করতে গিয়ে এক ধরনের বিকৃত যৌনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, না কি?

যত গোপনতা, ভণ্ডামির চাষও তত বেশি। বাবার অন্তত দুটি অবৈধ যৌন সম্পর্কের কথা জেনেছি, প্রথম যখন শুনি কেমন একটা ধাক্কা লেগেছিল বুকের ভেতর! মা একদিন রাগের মাথায় বলছিল বাবাকে—না, না, ওই বয়সের কোন কাজের মহিলা রাখব না বাড়িতে, তোমার যা চরিত্র, আহা!

পরে আমার প্রায় সমবয়েসী ছোট মামির কাছে শুনেছিলাম আমার জন্মের পর বাড়িতে কাজের জন্য এক সর্বক্ষণের মহিলা রাখা হয়েছিল বাড়িতে। তার সঙ্গেই নাকি বাবার—এই নিয়ে নাকি অনেক অশান্তি।

দু-তিনটে মাছি জ্বালাচ্ছে বড়, কোত্থেকে এল? মাদি না মদ্দা?

বাবার আরেক কীর্তির কথা শুনেছিলাম অনুর কাছে। আমার শ্বশুরমশাই উকিল ছিলেন, প্র্যাকটিস করতেন জেলা আদালতে। মাঝে মাঝে দেখতাম এক অল্পবয়েসী ভদ্রমহিলা প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন বাড়িতে ওর চেম্বারে, এই নিয়ে ইয়ার্কি করে অনুকে দু-এক কথা বলতেই দুম করে রেগে গিয়ে ফুঁসে উঠল—তোমার বাবার মতো ভাব নাকি সবাইকে?

আমি অপ্রতিভ হয়েও মুখে যথাসম্ভব হাসি বজায় রেখে হালকা সুরে বললাম, কেন?

কেন? ন্যাকামি হচ্ছে! বিনুমাসি পাগল হয়েছে কার জন্যে?

জানতাম না কিছুই, বিনুমাসি-বাবার এপিসোডটা জানা হল অনুর মুখ থেকে। শাশুড়ি ঠাকরুনই কোন এক দুর্বল মুহূর্তে বলেছেন তাঁর পুত্রবধূকে। বিনুমাসি মায়ের পিসতুতো বোন। বিয়ের দু বছরের মাথায় শালি-জামাইবাবুর সম্পর্ক এমন একটা অবস্থায় চলে গেল যে মা আপত্তি করলেন, বাবাও লোকলজ্জা বা সমাজ ইত্যাদির ভয়ে, মধ্যবিত্ত বাবুদের যেমন হয়, পিছিয়ে এসে সম্পর্ক ছেদ করলেন। কিন্তু বিনুমাসির উনিশ-কুড়ির আবেগ, সবার আবেগের মাত্রাও একরকম হয় না, সম্পর্ক ছেদ সহ্য করতে পারলেন না বিনুমাসি, সারাজীবন পাগলি হয়েই কাটাচ্ছেন।

এসব ভাবতে গিয়েই মন কীরকম তেতো লাগছে, মনে হচ্ছে সারা গায়ে নোংরা মেখে বসে আছি অথচ সত্যি ঘটনাগুলো থেকে পালিয়ে যাবই বা কোথায়?

মাছিরা কি আমার গাময় নোংরার খবর পেয়েছে? বড় জ্বালাচ্ছে?

বাবাকে বাইরে থেকে দেখে এসব কথা কাহিনি কল্পনা করাও শক্ত! টিভি বা খবরের কাগজ ইত্যাদিতে অকারণ নারী-শরীরের প্রদর্শনী নিয়ে সদা সরব তিনি, প্রায়ই বলেন—দেশটা উচ্ছন্নে দিল এরা। তার মুখে কোনদিন 'শালা' শব্দটাও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আমার ছেলের দশ বছর বয়েস, গরমকালে অনু ওকে জাঙিয়া পরিয়ে রাখলে সেটা নাকি অশ্লীল! এতই শরীর নিয়ে শালীনতাবোধের 'খুঁতখুঁতনি', অথচ দরজা বন্ধ করে টিভিতে ফ্যাশন চ্যানেল থেকে শনিবার রাতের ব্লু ফিল্ম কিছুই দেখা বাদ যায় না তাঁর!

তবে এ আমার বাবা-মা বলে নয়, অভিজ্ঞতায় দেখছি কম-বেশি এ ভণ্ডামি আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। আবার ভদ্র হন বা না হন, যৌনতা যে এক অতি নিষিদ্ধ পাপ কাজ, এ ধারণা চেতনে-অবচেতনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে। আমি কি এর থেকে মুক্ত? আচ্ছা, এই তুমুল ভোগবাদের জোয়ারের যুগে, যৌনতা যখন একটা পণ্য, তখন নিষিদ্ধ পাপকাজের অনুভব কি এক অর্থে ভালোই? বুঝতে পারি না, নিজেকে প্রশ্ন করি।

গৌতমদার কথা মনে পড়ছে। বয়েসে দশ-বারো বছর বড় হলেও মিশতেন বন্ধুর মতো, খুব পড়ুয়া মানুষ, সু-অভিনেতা, নাট্যকারও বটে; মারা গেছেন তাও তো প্রায় বছর পাঁচ-ছয় হল।

বৃষ্টি কি থামবে না? বৃষ্টি আর বৃষ্টি, মা বসুন্ধরা ঋতুমতী হয়েছেন—অম্বুবাচি ব্রত, এ ব্রত যে মা বসুন্ধরার ঋতুমতী হওয়া উপলক্ষে—এ সময় মাটিতে উনুন খুঁড়তে নেই, আগুন জ্বালাতে নেই, ব্যথা লাগবে পৃথিবী-মায়ের—একথা গৌতমদার কাছেই শুনেছিলাম।

ছোটবেলায় অম্বুবাচি করতে দেখেছি ঠাকুমাকে, সন্ধেবেলায় ফলাহার করতেন, আমরা নাতি-নাতনিরা গোল হয়ে বসতাম তার চারপাশে, পরে অম্বুবাচির কথা ফের মনে করিয়ে দিল আমাদের বাড়ির ঠিকে কাজের মহিলা, ননিমাসি।

গৌতমদার লেখা একটা একাঙ্ক নাটক, কী যেন নাম? পড়ে শুনিয়েছিলেন আমাদের, এক নবদম্পতির যৌন সম্পর্ক ঘিরে লেখা সেই নাটক শুনে সবাই আমরা ছি ছি করে উঠেছিলাম। আমি তখন সংগ্রামী ছাত্র সংগঠনে তুমুলভাবে জড়িয়ে আছি, যৌনতা বিষয়ক সব কিছুই আমাদের কাছে অপসংস্কৃতি! যৌনতা সংক্রান্ত কোন আলোচনাকেই অন্তত প্রকাশ্যে আমল দিতে চাইতাম না আমরা, যদিও বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে গোপনে নানা আলোচনা হত, রসালো চুটকিও আদান-প্রদান চলত খুব।

তা, গৌতমদার সেই নাটকে নবদম্পতির সমস্যা ছিল খানিকটা উদয়-মুক্তিরই মতো, তবে সেখানে ব্যাপারটা উল্টো, অর্থাৎ অভিযোগটা আসছে মেয়েটির দিক থেকে, ফলে নিন্দার পরিমাণ আরও বেশি।

সে সব কতদিন আগের কথা—অথচ মনে হচ্ছে সামনে এসে বসল গৌতমদা, রোগা, কালো সরু ফ্রেমের চশমার কাঁচের ভেতর উজ্জ্বল চোখজোড়া, মাথাভর্তি ঢেউ খেলানো চুল, বাঁ হাতের মধ্যমা আর তর্জনীর ফাঁকে অবিরাম জ্বলতে থাকা সিগারেট। তর্কের পুরোনো দিনগুলো ফিরে এল।

তোদের কথা শুনে মনে হয় মেয়েদের বুঝি যৌন চাহিদা থাকতে নেই! তোরা প্রগতিশীল না কচু! সব ফিউডাল মেল শভিনিস্টের বাচ্চা এক একটা! গৌতমদার স্বরে প্রবল উত্তেজনা।

কী চাও তুমি? মুক্ত-যৌনতা? ফ্রি সেক্স?

চাই-ই তো।

মুক্ত যৌনতা! মানে অবাধ বাছবিচারহীন যৌনতার ছাড়পত্র?

গাধা কোথাকার?

গাল দিও না, কথার জবাব দাও।

ওহ! কী বিরাট প্রশ্নকর্তা এসেছেন! ওরে গাধা—মুক্ত-যৌনতা বা যৌনমুক্তি—যাই বলিস, তার মানে যৌনতায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার। কমবয়েসীদের সঠিক যৌনশিক্ষা, যাতে তারা এটাকে নিষিদ্ধ পাপকাজ না ভেবে একটা স্বাভাবিক—মানে একটা আনন্দময় স্বাভাবিক ব্যাপার ভাবতে শেখে, আর—

আর?

প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহিত সম্পর্কের ভেতরে বা বাইরে যৌন সম্পর্কের স্বীকৃতি—এইরকম সব—

বিবাহিত সম্পর্কের বাইরেও!

হ্যাঁ, বাইরেও, অবশ্যই। আচ্ছা, মানুষের ইতিহাসে এইসব বিয়ে বা পরিবার-টরিবার এসব কতদিনের ব্যাপার-স্যাপার?

তুমি ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতে চাইছ!

আদৌ না, নানা কারণে কেউ যদি বিবাহিত সম্পর্কের ভেতরের যৌন-সম্পর্কে তৃপ্ত

হতে না পারে—

ডিভোর্স করে নতুন সম্পর্ক গড়ুক।

সন্তানের ভবিষ্যৎ বা নানা মানবিক কারণে তা সম্ভব নাও হতে পারে—তাছাড়া বিয়ে মানে কি দুটি নারী-পুরুষের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না কি? আর বিয়ের বাইরে মানে শুধু বিয়ের পরের কোন সম্পর্ক বোঝায় না সবসময়, বিয়ের—

বিয়ের আগের সম্পর্কের কথা—

হ্যাঁ, আমাদের সমাজে তো বিয়ের আগের কোন যৌন সম্পর্কও মহাপাপ! যদিও তা প্রকাশ্যে—তলায় তলায় আবার অন্য কাহিনি! চারপাশ তাকিয়ে একটু ভালো করে খোঁজ নিলেই—

মানছি, কিন্তু তা কি ভালো?

কেন? খারাপ কেন? কে তোমার সুইটেবল সেক্স পার্টনার হতে পারে সেটাও তো বুঝে নেওয়ার দরকার আছে।

কী বলছ আবোল-তাবোল! এ সব ইয়াঙ্কি কালচার!

কচু! তোরা সব আটকে রয়েছিস মহারানির যুগে! বাঙালি মধ্যবিত্ত সেই মহারানি ভিক্টোরিয়ার যুগ আর ভুলতে পারল না!

কী চাও? মানুষ পশুর মতো যৌনসংসর্গ করে বেড়াক —যার-তার সঙ্গে, বয়েস নেই, সমাজ নেই, সম্পর্কের দায়দায়িত্ব নেই!

পশুর মতো? সেটা করতে পারলে তো অন্তত এখন যা করে তার থেকে ভালো হত—এখন তো অর্ধেক পশু আর অর্ধেক জড় পদার্থ—ভণ্ডামিতে ভরা, ভাবে এক করে আরেক, মুখের কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই! তবুও আমি পশুর মতো হতে বলিনি, স্বাভাবিক যৌনতার অবদমনের বিরুদ্ধে মুক্ত মানবিক যৌনতার কথা বলছি।

গৌতমদা, এদেশ ইউরোপ—আমেরিকা নয়!

ও, আমি বুঝি তা জানি না, ভাগ্যিস তুই বলে দিলি!

সে যতই ব্যঙ্গ কর—সমাজ ফ্রি না হলে মানে শোষণ মুক্ত না হলে সেক্স কী করে ফ্রি হবে? লোকে খেতে পায় না অথচ সেক্স নিয়ে এত মাতামাতি কীসের?

সেক্স কি সমাজের বাইরে?

মানে?

সমাজ শোষণ মুক্ত হবে, তারপর সেক্স মুক্ত হবে—এরকম বোকা বোকা কথার কোন মানে হয় না!

কী যে বল—

ঘটে বুদ্ধি নেই মোটে? দাদারা যা শেখায়—তাই কপচাস!

যুক্তি হারিয়ে এখন খিস্তি করছ?

কীসের যুক্তি! সমাজমুক্তি—সমাজ বদলের রাজনীতি-আন্দোলন কি যৌনমুক্তিকে বাদ দিয়ে হয়? যে ক্ষমতা সমাজকে দমন করে সেই ক্ষমতাই যৌনতাকেও দমন করে—ক্ষমতার হাত অনেক অনেক লম্বা—একটা শুকনো ঠান্ডা হাত আমাদের সবাইকে চেপে ধরে রাখে!

হু হু হাওয়া, জানলা দিয়ে আসা জলকণা অল্প ভিজিয়ে দিয়ে যায় বিছানা। আমি বসে বসে বৃষ্টি দেখি, মেঘ কালো আকাশ দেখি—যে বৃষ্টি আর মেঘের ভেতর মিশে যাচ্ছে গৌতমদা—শুধু বাতাসের ভেতর শিরশির করে বেজে উঠতে থাকে, ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে একটা কথা—শুকনো ঠান্ডা হাত আমাদের সবাইকে চেপে ধরে রাখে।

মনে পড়ে, সেই নাটকে, কী যেন নাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, 'বৃষ্টির জন্যে'—নাটকে মেয়েদের একটা আদিবাসী লোকগান ও লোকনৃত্যের দৃশ্য ছিল—গানের কথা মনে নেই, শুধু এটুকু মনে পড়ছে—মূল ব্যাপারটি হল বৃষ্টিদেবতার সঙ্গে সেই মেয়েদের যৌনমিলনের আকাঙক্ষা, কারণ ওদের বিশ্বাস এই মিলন বৃষ্টিহীন খরাপীড়িত জমিতে বৃষ্টি এনে দেবে, সোনার ফসল ফলাবে।

নাটকটা সম্ভবত দুবারের বেশি অভিনীত হতে পারেনি, অনেক বিতর্ক হয়েছিল, নানা দিক থেকে গৌতমদাকে সমালোচনা শুনতে হয়েছিল, ব্যক্তিগত আক্রমণও ছিল। 'অপসংস্কৃতি' রুখতে আমরা অনেকেই সেদিন ক্লান্তিহীন ছিলাম।

তবুও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল আমৃত্যু, আজ মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে অন্তত আমি ওর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে করতেই যৌনতা বিষয়ে অনেকটা সহনশীল খোলামেলা মনের হয়ে উঠতে পেরেছি। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিরও বদল ঘটেছে, আজ বোধহয় গৌতমদার সঙ্গে অনেকটা সহমত পোষণ করতে পারি।

বিয়ের আগে প্রাপ্তবয়স্ক দুটি নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্কের কোন সামাজিক স্বীকৃতি তো দূরের কথা, রীতিমতো বিরূপতা থাকায়, মধ্যবিত্ত পরিবারে অনেক সময় নারী-পুরুষ উভয়েই জীবনের এক বড় সময় যৌনসঙ্গীহীন হয়ে কাটায়। যেমন উদয় ও মুক্তি, মুক্তি সম্পর্কে অবশ্য খুব জোর দিয়ে কিছু বলা মুশকিল আমার পক্ষে; কারণ ওকে আর কতদিন চিনি, কিন্তু উদয়ের যে কোনো গোপন সম্পর্ক কোথাও ছিল না, এ ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত আমি। আর এক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারী যখন তার যৌনতাকে অবদমন করে, কিছু না কিছু বিকৃতি শরীর বা মনে আসে—এ ধরনের রুগি এ দেশে বোধহয় নেহাৎ কম নয়।

আমার নিজের কথাই যদি ধরি, বিয়ে হয়েছিল তিরিশ প্লাসে, খুব বেশি বয়েস বলা যায় না, কিন্তু বিয়ের প্রায় পাঁচ-ছ বছর আগে থেকেই অনুর সঙ্গে মেলামেশা ছিল। শারীরিক সম্পর্কও তৈরি হয়ে উঠেছিল আমাদের, শাশুড়িমা জানতেন, কিন্তু এ নিয়ে মেয়েকে কোনদিন কিছু বলেননি। তাঁকে অবশ্য ব্যতিক্রমী মহিলাই বলতে হয়, খুবই স্বাধীনচেতা নারী, বাবার কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা ধার নিয়ে প্রায় একক উদ্যোগে ইমিটেশন গয়নার ব্যবসা

গড়ে তুলেছিলেন। শাশুড়িমা-র প্রভাব কিছুটা অনুর উপর পড়েছে। যৌনতা নিয়ে কোন ভণ্ডামি, ন্যাকান্যাকা ঢাকা-চাপা ভাব এই দুই মহিলার মধ্যে দেখিনি।

শাশুড়ি-মা কথা প্রসঙ্গে বলতেন, তোমরা অমুক চরিত্রহীন, তমুক চরিত্রবান এইসব যে বল, চরিত্রের মাপকাঠি কী বাপু? কেউ যদি কুচুটে, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর হয় অথচ স্ত্রী ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক না পাতিয়ে একটি মহিলা নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়—তাহলেই সে বুঝি চরিত্রবান!

ছেলে মাঝেমধ্যে এমন সব প্রশ্ন করে, আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেও অনু কী চমৎকারভাবে সামলে নেয়! একদিন ছেলে বলল, মা রেপ কী?

অনু বলল, ওটা মেয়েদের ওপর খারাপ ছেলেদের এক ধরনের টর্চার।

ছেলে ছাড়বার পাত্র নয়, ফের বলল, ঠিক কী করে টর্চার করে?

আমি বলি, কী হবে তোমার এসব জেনে!

অনু বলল, ওভাবে বলছ কেন? ও যা শুনছে, টিভি বা সিনেমায় দেখছে, জানতে চাইছে তাই। তারপর ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, বাবাসোনা, খারাপ লোকেরা ওসব টর্চার করে তো—ঠিক কীভাবে করে সেটা ওরাই জানে, আমরা যেটুকু জানি তা হল ওই যা দেখছি সিনেমায়—মারে, ধস্তাধস্তি করে, জামাকাপড় খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে, এইসব।

আমাদের ছোটবেলায় এমন প্রশ্ন করলে, যতই স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে হোক না কেন বাপ-মায়ের হাতে চড়চাপড় বোধহয় অবধারিত ছিল, নাকি?

আচ্ছা, অনুর এই স্মার্ট খোলামেলা ভাব কি মাঝেমধ্যে আমায় অস্বস্তিতে ফেলে? মহিলারা এসব ব্যাপারে খুব লাজুক হবে এটাই ভালো লাগে পুরুষের কাছে? অথচ কোনো কোনো সময় আবার ভান-ভনিতাহীন খোলামেলা স্বভাবের নারীটির টানও কেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে! নিজের মনের নিভৃততম কোণটিকে নিজেই কি চিনি?

গেট খুলে পা রাখতেই ঝপ করে পাওয়ার কাট। আমার সঙ্গে অনু, বিরক্তির স্বরে—সারাদিন জ্বালাচ্ছে আজ!

উদয়ের ডাকেই আজ আমরা দুজনে ওদের অশান্তি নীড়ে। কিন্তু উদয় নতুন করে জানার মতো বিশেষ কোন কথা বলল না। তবে বেশ থমথমে পরিবেশ, মুক্তির সঙ্গে অনু আলাদাভাবে খানিকক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস করল। আমি অবশ্য হইচই করে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, থম মারা মেঘ ঝরিয়ে একটু বৃষ্টি-বাদল আনার চেষ্ট করলাম।

রাতের খাওয়া সেরে ফিরতে প্রায় এগারোটা। সারা রাস্তায় অনু বেশ গম্ভীর, আমার দু-একটা আলতো টোকায় ভাঙল না কিছু। বাড়ি ফিরে শোয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাতের প্রসাধন সেরে নিতে নিতে নিজেই বলল—উদয়দার কাছ থেকে শুনে তুমি মুক্তি সম্পর্কে যে ধারণা করেছ—

শুনেছি মাত্র, সেরকম কিছু অনড় ধারণা করিনি।

যা হোক, উদয়দার কথা পুরোপুরি ঠিক নাও হতে পারে।

তাই? কী বলল মুক্তি?

এটা ঠিক, সেক্স ব্যাপারটা নিয়ে মুক্তির কিছু কনজারভেটিভ ধ্যানধারণা আছে—

কী রকম?

মুক্তি সেক্সচুয়াল ব্যাপারটাকে একটা প্রায় নোংরা কাজ বলেই ভাবে, মানে—নেহাৎ সন্তান ধারণের জন্যেই করা আর কিছু নয়, এরকম—কিন্তু উদয়দারও কিছু গোলমাল আছে।

খুলে বল।

কয়েক মিনিট অনুর নীরবতা, যেন রহস্য কাহিনির ক্লাইম্যাক্স বুনছে—চুলে গার্ডার বাঁধে, ময়েশ্চারাইজার ঘযে মুখে, আয়নার সামনে হুমড়ি খেয়ে গালে ওঠা ফুস্কুড়ি দেখে কি?

ফের আমি, কী হল? খুলে বল।

বলছি তো—উদয়দা মনে করে সেক্সসুয়াল ব্যাপারে মেয়েদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোন দাম নেই, তাদের যখন খুশি যেভাবে খুশি—আসলে সেক্সসুয়ালিটি যত না শারীরিক তার থেকে যে অনেক বেশি মানসিক—এটা বুঝতে চায় না। আমি তাই বললাম—

ফের চুপ অনু। ড্রেসিংটেবিল ছেড়ে আলনায়, আলতো গোছগাছ, তারপর বলে,—এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, মোটামুটি সব পুরুষেরা এ ব্যাপারে কম-বেশি একইরকম—তবু খুব অশান্তির পর্যায়ে যখন, দুজনে মিলেই কোন কাউন্সেলারের কাছে যেতে পারে।

অনুর কথা বিঁধল আমায়, বললাম, একথা কেন? সব পুরুষ—আমিও? এত বছর হয়ে গেল, বলনি তো কোনদিন?

বলিনি, আজ বলছি।

বলছ? আমায়? জোর করেছি তোমায় কোনদিন তোমার অসুবিধা অনিচ্ছা সত্ত্বেও?

কখনও এমন হয়েছে বইকি—তুমি হয়তো ভুলে গেছ। তাছাড়া, আমার ইচ্ছাটাকে কোনদিন বুঝতে চেষ্টা করেছ?

মিথ্যে অপবাদ!

আমার লাভ? আসলে তোমরা পুরুষেরা, মেয়েদের সেক্সসুয়াল ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে এত কম গুরুত্ব দাও যে বোঝবার ক্ষমতাও থাকে না তোমাদের।

কী জানি!

চুপ করে যাই। এত বছরের চেনা অনুকে কেমন অন্যরকম লাগে। বাবাই ঘুমে কাদা। রাত প্রায় পৌনে-বারো, সামনের চিলতে উঠোন পেরিয়ে গলির মোড়ে পোস্টের আলো একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে। মফস্‌সল শহর আপাতত ঘুম-চাদরের তলায়।

অনু?

কী?

মহেঞ্জোদড়োর সেই নারীমূর্তির মতো ভঙ্গি—পারবে তুমি?

রাতদুপুরে ক্ষেপলে কেন?

দাঁড়াও না প্লিজ ওই ভঙ্গিতে!

এক একসময় তোমার যে কী—আচ্ছা, কী আছে ওই মূর্তিটায়, খ্যাংরা কাঠির মতো চেহারা—আর বুক বলতে তো—

হেসে গড়িয়ে পড়ে অনু। কেমন এক অলৌকিক হাসি—আমার শীত করে, আমি যেন ক্রমশ বরফ হয়ে যাই! আমি কি ধর্ষক হয়ে উঠতে চাইছি কিন্তু পারছি না? শক্তিমতী স্বাধীনচেতা নারীর সামনে নিজেকে অসহায় লাগে? যৌন-নিপীড়নে তখন কি এক ধরনের আমোদ জাগে? অনিচ্ছুক শরীর ছিঁড়ে খুঁড়ে খাওয়ার বিকৃত আমোদ?

শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, বারান্দার গুমোট অন্ধকারে কয়েক মিনিট কাটিয়ে ঢুকি পাশের ঘরে, আলো জ্বালি, লেখার টেবিলে খোলা কলম, কাগজ—গল্পটা নতুন করে শুরু করি, আমার ভাবনা, স্মৃতি, গৌতমদা, অনু, উদয়, মুক্তি—সব নিয়ে একটা বয়ান।

রাত গভীর হলে ফের স্বপ্নের ভেতর জেগে উঠি। সিন্ধু তীরের সেই নগ্নিকা পাশে আমার, ফিসফিসিয়ে ডাকছে কি—কুশল, কুশল?

আমি পাশ ফিরে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাই, পারি না, হাত দিয়ে ছুঁতে চেষ্টা করি, পারি না—এত কাছে তবু কত দূরে! একটা শুকনো শীতল হাত এসে চেপে ধরে রাখে আমায়!

কতকালের চেনা লোকগানের সুর-কথা, কেমন এক আলো-আঁধারির মতো ভেঙেচুরে যাচ্ছে—চিলতে উঠোনে অলৌকিক নারীরা নাচছে, গাইছে, বৃষ্টিদেবতাকে তাদের শরীরে শরীর বিছিয়ে নেমে আসতে বলছে!

অথচ শুকনো শীতল হাত—বৃষ্টি এল কি? আমার পাশ থেকে উঠে উঠোনে বৃষ্টির ভেতর নেমে গেল কি মহেঞ্জোদড়োর সেই নগ্নিকা?

প্রেতপুরাণ

এনকাউন্টারে দেহনাশের পর এই প্রথম এলে তুমি।

এক বছর কেটে গেছে—শরতের রাতের আকাশে আজও তারা নেই। থকথকে অন্ধকারে ঢাকা বাঁকাচোরা গলি-গলতা-গাছপালা-ইঁটের পাঁজা হিসহিসিয়ে ওঠে—ওরা কী ভয় পেল তোমায়? সুজনডাঙার বাতাসও কী ভয় পায় তোমায়। অস্থির বাতাস কেমন জমে ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

অথচ খুশি হওনা তুমি, একদিন খুশি হতে, মানুষের ভয়ই ছিল তোমার সেরা অস্ত্র। তোমার হাতে বন্দুক, তোমার হাতে ভোজালি কি লোহার রড—উল্টোদিক থরথর কাঁপতে থাকা মানুষের ভয়ার্ত চোখ, তুমি খুশি হতে, স্বস্তি পেতে। এখন খুশি না হলেও দুঃখও পাও না, হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখের অনেক উপরে চলে গেছ।

পিচ ওঠা গলির এখানে ওখানে গর্ত, গর্তের ভেতর বৃষ্টির জল, কালো বেড়াল চেটে চেটে খায়, একটু দূরে কুকুর গোঙায়—সব দেখতে দেখতে তুমি ভাঙাচোরা একতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াও। উঁকি দাও মনুবাবুর সংসারে। অন্ধকার ঘরে ময়লা বিছানা নিঃসাড়ে ভিজিয়ে ফেলছেন মনুবাবু—বোঁটকা গন্ধে ম ম করছে বাতাস। তোমার মনে পড়ল এঁকে সুস্থ করে তুলতে কত মুঠো মুঠো টাকা তুমি দিয়ে এসেছ নার্সিংহোমের হাড়িকাঠে।

মনুবাবুর দুই ছেলে, নিত্য আর চিত্ত। চিত্ত না হয় চিতা হয়েছে, তারপর হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে, কিন্তু নিত্য তো বেঁচে আছে, বুড়ো বাপকে নিয়ে ভাবার কি তার সময় হয় নারে? বাপের খাটনির পয়সায় নিজের কাঠের ব্যবসা দাঁড় করালি, ফ্ল্যাট কিনলি, ডানা গজাল তারপর? গরিব ছুতোর মিস্ত্রি বাপকে ভুলে গেলি?

বাপের বলা কথাগুলো আরেকবার নিজেকে শোনাতে শোনাতেই তুমি রান্নাঘরে উঁকি মারো। মুসুরির ডালের বড়া ভাজা হচ্ছে, আনমনে কেরোসিন স্টোভের সামনে গালে হাত রেখে বসে আছেন প্রতিমা, আহা! বড়াগুলো পুড়ে যাবে যে!

প্রতিমা কি ভাবছেন ছেলেদের কথা? নিত্য—না, না, নিত্য হবে কেন? সে হারামজাদা বউয়ের সুরে সুর মিলিয়ে মাকে যা গাল পাড়ছে। বোধহয় ছোটছেলে চিত্তর কথাই ভাবছেন—ভালো করে খুঁটিয়ে দ্যাখো তুমি, হাড় জিরজিরে শরীরে একটা ছেঁড়াফাটা ফ্যাকাশে শাড়ি জড়ান, প্রায় সাদা চুল, ষাট পেরুনো মহিলাকে দেখতে মনে হয় আশি! এক বছর আগে বোধহয় এতটা বৃদ্ধা ছিলেন না তোমার মা, নাকি ছিলেন? মাকে ভালো করে তাকিয়ে দেখার তো ফুরসৎ ছিল না তোমার, গত সাত-আট বছর নাকি আরও বেশি—তুমি তো বাড়িতে থাকতে না, বছরে এক-আধবার আসতে কয়েক ঘণ্টার জন্যে, মা শুধু জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন, সে কান্না বরদাস্ত করতে পারতে না তুমি চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠতে, চুপ করে চোখ মুছে তোমার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে নিজের হাতে তৈরি করা কোনো

খাবার এগিয়ে দিতেন।

ধীরে ধীরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আস তুমি, গলিপথে হাঁটো। পাওয়ার কাট, খুব বেশি রাত হয়নি তবু দু'ধারের বাড়িগুলো ঝিমিয়ে আছে, দূর থেকে ভেসে আসে জেনারেটরের শব্দ, বিন্দুর জেনারেটর? এখন তাই হবে, তোমারই কেনা জেনারেটর, বিন্দু চালাত। কিন্তু এদিকে কোনো বাড়িতে আলো নেই। তা হলে কি এ আওয়াজ অন্য পাড়ার, রেললাইনের ওপার থেকে আসছে? বিন্দু কি হাজতে, নাকি পালিয়েছে?

একটু থামো তুমি, গলিটা বাঁক নিয়ে যেদিকে আরও সরু গলি হয়ে গেছে ওদিকে আলো, আলো পছন্দ কর না, বেঁচে থেকেই অন্ধকারের জীব হয়ে ছিলে আর এখন তো...ডানদিকে পচা ডোবা, এখনও ভরাট হয়নি? ডোবার পাড়েই চুপ করে দাঁড়াও তুমি।

সুজনডাঙার দিঘিপাড়া, সে পাড়ার মনুমিস্ত্রির ছোটছেলে চিত্ত হয়ে গেল চিতা, কেমন করে? সে কথা ভাবতে গিয়ে চারপাশের জমাট বাতাস থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে, টের পাও তুমি।

সেও শরতেব রাত, দিঘিপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা, তখন কত বয়েস, পনেরো কি ষোলো, তাসাপার্টি জমিয়ে দিয়েছে কী একটা হিন্দি গান, সিদ্ধির নেশায় পাগলের মতো নাচছিলে তুমি, বিসর্জন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে, আশেপাশে তোমার সমবয়েসী ছেলে ছোকরারা, নাচছে তারা, চকলেট বোম ধরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে রাস্তায়, তুমি নাচছ, তেড়েফুঁড়ে নাচছ তুমি, হঠাৎ গোলমাল শুরু হল, কার ছোঁড়া চকলেট বোম কার গায়ে লাগল, হাতাহাতি, ছোটাছুটি, পেটো পড়ল, তাসাপার্টির বাজনা থেমে গেল, ভালো করে কিছু বোঝার আগেই কারা যেন চড় থাপ্পড় মারতে মারতে টেনে নিয়ে গেল তোমায়। কত মার খেয়েছিলে সেদিন সিদ্ধির ঘোরে টের পাওনি, টের পেলে পরদিন, সারা শরীরে ব্যথা, ঘুঁসিতে কেটে গেছে চোখের নীচে, দাঁত পড়েছে দুটো—পাড়ায় জটলা, বদলা নিতে হবে, দিঘিপাড়ার ইজ্জত চলে গেছে, দিঘিপাড়ার আট-দশজনকে বেধড়ক মেরেছে বুড়িরমাঠ পাড়ার ছেলেরা, বদলা নিতে হবে। শুধু লাঠি দিয়ে হবে না, অস্ত্র চাই, লাল আর সাদা মশলা এলো, বোমা বাঁধা হল, ওদিকে টানা ক'দিন বৃষ্টি, গরম চাটুতে বোমা শুকনো করা হচ্ছে, উত্তেজনায় কাঁপছ তুমি, পুরো অ্যাকশনের নেতৃত্বে পাড়ার কেলেদা, কেলেদা মেশিন দেখায়, ওয়ান শাটার, ছয়ঘরাও জোগাড় হয়েছে একটা, সেটা থাকবে কেলেদার কাছে।

চিত্ত থেকে চিতা হওয়ার পাঠশালায় তোমার প্রথম গুরু কেলেদা, অথচ এখন সে ঘোর সংসারী, বাজারের মোড়ে রোলের দোকান, ভালো বিক্রি, তাছাড়া গুরুপ্রণামী হিসেবেই বোধহয় তোমাকে এক পয়সা না ছুইয়েও কেলেদা গাঁজার ব্যবসাও করে যাচ্ছিল, এখন কী অবস্থা কে জানে!

এই ডোবার চারধারে তখন এত বাড়িঘর হয়নি, ঝোপজঙ্গলে ভরা, মাঝখানে ভাঙাচোরা

বেড়ার ঘর একটা, থাকে না কেউ, সেখানেই বোম তৈরির কারখানা, উনোনে গরম চাটু, মনা বোম সেঁকছে, উল্টেপাল্টে রাখছে চাটুতে, কেলেদা বলল, কী রে ঢ্যামনা পারবি তো!

তুমি আস্তে ঘাড় কাত করলে। কেলেদা বলল, দেখি কেমন সাহাস তোর? যা উল্টে দে পেটোটা!

তুমি চুপ করে বসে থাকলে, ভাবলে যদি ফেটে যায় হাতে, কেলেদা দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে উঠল, শালা ডরপোক ...

অপমান সহ্য হল না তোমার। মনাকে সরিয়ে পেটো ওল্টাতে তুমিই বসলে চাটুর সামনে। কেলেদার কাছে ট্রেনিং নিলে কীভাবে চাপ না দিয়ে আলতোভাবে বোমা ধরে ছুঁড়ে দিতে হয়। দু'দিন পর অ্যাকশন, অপারেশন বুড়িরমাঠ পাড়া, ও পাড়ার রামুর লাশ পড়ল আরও অনেকের সঙ্গে। তিনমাস জেল হাজতে কাটিয়ে এলে তুমি, সেই শুরু—দু'বছর যেতে না যেতেই চিত্ত হয়ে উঠল চিতা, সুজনডাঙার এক নম্বর দাদা!

এক নম্বর দাদা হয়ে ওঠার পথে অবশ্য নিজের হাতে দু-দুটো খুন করতে হল তোমায়। উপায় ছিল না, এ এমন এক জগৎ, খুন না করলে খুন হয়ে যেতে হবে! শেষ খুনটা বড় নৃশংস হয়ে গিয়েছিল, কী করে পারলে তুমি আজ ভেবে অবাক হও, অথচ ছোটবেলায় পাঁঠাবলির দৃশ্যও দেখতে চাইতে না তুমি, রেলে কেউ কাটা পড়লে দল বেঁধে অনেকে যেত দেখতে, তুমি যেতে না। অথচ নিমোকে খণ্ড খণ্ড—তিরিশ-চল্লিশ খণ্ড খণ্ড হবে, নাকি আরও বেশি, বস্তায় পুরে ওর বাড়ির সামনে রেখে এসেছিলে তুমি।

সুজনডাঙার সবাই তোমায় ভয় পেতে লাগল, আর এই ভয়ই হল তোমার ধান্দার মূলধন। দাদারও দাদা থাকে, তোমারও ছিল। সে দাদাদের হাতে রিমোর্ট কন্ট্রোল, নকশা কষতে শিখতে হল তোমায়, দাদার দাদা তো একটা নয়, কার সঙ্গে কখন থাকতে হবে, সময় বুঝে কাকে ছেড়ে কখন কার দিকে হেলে পড়তে হবে, এসব কিচাইন রপ্ত করতে হল তোমায়, তুমি ক্রমে বুঝলে এক নম্বর দাদা হওয়া যত কঠিন সে সিংহাসনে টিঁকে থাকা তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কঠিন! নকশার একটু এদিক-ওদিক হলেই খোপড়ি উড়ে যাবে।

বেশ ভেবেচিন্তে নকশা বানালে তুমি। এলাকার সাধারণ মানুষ মানে পাবলিককে বিলা করলে চলবে না। পুলিশ লাইন ঠিক রাখতে হবে। হিস্যা দিতে হবে দু'নম্বরী কারবার থেকে, কিছু দান-ধ্যান করতে হবে, একা খেলে চলবে না। কাউকে বিশ্বাস করবে না, কাউকে না। এ লাইনে গদ্দারের কোনও অভাব নেই।

এক নম্বর দাদা হয়ে ওঠার পরে নিজের হাতে আরও সাত নাকি আটটা খুন করতে হয়েছিল তোমায়। তার মধ্যে তিনটে ছিল গদ্দার! কানকাটা গুলে তাদের একজন, প্রেতলোকে দেখা হয়েছিল, এখনও স্বীকার করে না ব্যাটা উলটিবাজ! বেঁটে-খাঁটো দৈত্য ছিল একটা অসম্ভব শক্তি গায়ে, লোহার রড বেঁকিয়ে দিত, তোমার দলে ওই ছিল সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, মদে চুর করে হাসতে হাসতে কপালে জন্‌তোর ঠেকিয়ে মেরে ছিল ওকে, ব্যাটা অনেক

করেছিল তোমার জন্যে, তাই খুব যন্ত্রণা দিয়ে মারোনি ওকে, যদিও গদ্দার উলটিবাজদের শায়েস্তা করতে খুব কষ্ট দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করাই নিয়ম—তবু সত্যি বলতে কী গুলে যে গদ্দার তার কোনো অব্যর্থ প্রমাণ ছিল না তোমার কাছে, তবু ঝুঁকি নিতে পারোনি, এ এমন লাইন, রিস্ক নেওয়া যায় না, রিস্ক নিলে নিজেরই লাইফ রিস্ক হয়ে যেতে পারে।

এক ঝলক অস্থির বাতাস। ডোবার পচা গন্ধ মিশে থাকে বাতাসে। শরতের রাতের আকাশে আজও তারা নেই। অশরীরী শরীর নিয়ে আকাশে উড়ান দাও তুমি, চক্কর খাও দিঘিপাড়ার আকাশে। ওপর থেকে মনে হয় আলো-অন্ধকারে এক ঝুলন দৃশ্য তৈরি করেছে কে যেন। চিতার প্রেত মনে করে চিত্তর কথা। চিত্তর ঝুলন ছিল, রথের মেলা ছিল, সুতপার সঙ্গে চিঠি চালাচালি ছিল। শ্যামলা রং, রোগা, বড় বড় চোখ, দুরন্ত মেয়েটা কোথায় এখন? প্রেতক্ষমতায় তুমি জেনে নিতে পার, তবু জানতে চাও না, কী হবে জেনে। তুমি যখন চিত্ত থেকে চিতা হয়ে উঠলে, তোমার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত সুতপা, ওদের বাড়ির সবাই, এই বুঝি জোর করে তুলে নিয়ে যাবে। না, সে কাজ করনি তুমি, সেটা এ জন্যে নয় যে এলাকার পাবলিক বিলা হয়ে যাবে, আসলে সুতপাকে কোনো কষ্ট দিতে চাওনি, মুক্ত স্বাধীন করে দিয়েছিলে, তারপর একদিন ওরা এপাড়া ছেড়ে চলে গেল, কোথায় গেল, সুতপার বিয়ে হল কবে কোথায় এ সবে আর কোনো আগ্রহ ছিল না তোমার।

ঝুলন, রথ, সুতপা, স্কুল—সবতো ছিল এ পাড়ার আর দশটা ছেলের মতো, তবু কী যে হয়ে গেল। স্কুলে অবশ্য ভালোভাবে পাশ করে উঠতে পারতে না, বিশেষত অংকটা মাথায় ঢুকত না। দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ারও কেউ ছিল না। এইট থেকে নাইনে উঠতে ফেল, দ্বিতীয়বার কোনোক্রমে নাইনে উঠে হাফইয়ার্লিতে অংকে পেলে গোল্লা। ব্যাস! সেই তো শেষ। সে বছরেই দিঘিপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সেই বিসর্জন শোভাযাত্রা—শরতের রাতের আকাশে শোঁ শোঁ শব্দে চক্কর কাটো তুমি, তোমার অশরীরী শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা অন্ধকার ঝরে পড়ে সুজনডাঙায়, দিঘিপাড়ায়।

অংকে কাঁচা ছিলে, বরাবর কাঁচা থেকে গেলে? নকশা-অংকে ভুল থেকে গিয়েছিল কী? সে হিসেব করে কী হবে আর এখন, তবু কথাটা ঘুরপাক খায় মনে। প্রেত হয়ে প্রথম প্রথম ভাবতে, এই বেশ হয়েছে, অপরাধ করেছ অনেক, অনেকের প্রাণ নিয়েছ, প্রাণ দিয়েই হিসেব বরাবর করতে হল, এই তো ঠিক বিচার, বিধাতার বিচারে ভুল নেই, ফাঁকি নেই।

তারপর এক বছর ধরে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে দেশ দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে কত দেখলে শুনলে জানলে, বিধাতার বিচারের অংক তখন আর মেলাতে পার না কিছুতেই। ধাঁধা মনে হয়, গুলিয়ে যায় সব কিছু! পৃথিবী জুড়ে কত অন্যায় কত অপরাধ, তোমার অপরাধ তো সেখানে একটা পিঁপড়ের কামড়ের চেয়েও কম! তবু দেহনাশ হল তোমার, প্রেত হয়ে আকাশে বাতাসে অশরীরী শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াও।

আকাশে উড়ান দিয়ে তুমি দিঘিপাড়া ছেড়ে চলে আস সর্দারপাড়ায়। সর্দারপাড়ার নবযুবক

সংঘ, কেমন আলোহীন সজ্জাহীন, প্রাচীন বটের মতো অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এই সংঘ গড়ে ছিলে তুমি, এই তোমার অফিস, এখান থেকেই তুমি সুজনডাঙা ও তার আশেপাশের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে। নবযুবক সংঘের দোতলা বাড়িটা নিঝুম এখন, অথচ এক বছর আগেও তিরিশ-চল্লিশটা ছেলে সব সময় মজুত থেকে গমগম রাখত, এখানে বসেই কত সমস্যা সামলেছ তুমি। তালা দেওয়া বাড়িটা প্রেত হয়ে নিশ্চুপ তাকিয়ে আছে তোমার দিকে, পাশেই নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া। গাছতলায় বসার বেঞ্চিটা ভাঙাচোরা, আশেপাশে কুকুরের ইতস্তত ঘোরাঘুরি, তাদের গায়ে দগদগে ঘা।

এই গাছতলায় বসেই সেলফোনের বেতার-তরঙ্গে সাম্রাজ্য শাসনের কত খবর দেওয়া নেওয়া চলত, এক সন্ধ্যায় এই গাছতলা থেকেই তোমায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল আইন রক্ষক বাহিনী।

গাছের পাতা কি দুলে ওঠে তোমায় দেখে? পাতার ফাঁকে থকথকে অন্ধকারে কি জোনাকি জ্বলে? তোমার অশরীরী শরীর কি টের পায় ওরা—জোনাকি, গাছ, গাছের শরীরে বাসা বেঁধে থাকা কীটপতঙ্গ?

পাবলিক বিলা করনি তুমি, একটি নিরীহ লোকেরও প্রাণ যায়নি তোমার হাতে। নবযুবক সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোয় চাঁদার জুলুম ছিল একথা অতি বড় নিন্দুকও বলতে পারবে না। পয়সা দিত ইঁটভাটার মালিকেরা, চোলাই মদের কারবারীরা, জমির দালাল ও প্রমোটারেরা। সবচেয়ে বেশি পাত্তি আসত বর্ডারে এপার ওপার মাল দেওয়া নেওয়া যারা করত, ওটাই ছিল তোমার কামধেনু, দুইলেই পাত্তি।

একা খেতে না তুমি। ছড়াতে, ছিটিয়ে দিতে, নেতা-পুলিশ-চামচা তো ছিলই। এমনকি পাবলিককেও বখরা দিতে ভুলতে না। সর্দারপাড়া, দিঘিপাড়া থেকে গোটা সুজনডাঙার গরিব মানুষের কাছে তুমি ভগবান হয়ে উঠেছিলে, মেয়ের বিয়ে থেকে চিকিৎসা—কেউ কোনো আর্জি নিয়ে এলেই উদার হাতে পাত্তি বিলিয়েছ তুমি। দলে এ নিয়ে অসন্তোষ ছিল, তবু তোমার ইচ্ছাই তো শেষ কথা!

তাই কি? তোমার ইচ্ছাই শেষ কথা এ কথা ভাবতে তুমি, ভুলে গিয়েছিলে বাবারও বাবা দাদারও দাদা আছে। তোমার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তোমার ইশারায় সুজনডাঙার বহু বুথের ভোট কোনদিকে পড়বে ঠিক হয়ে যায়, ভয়ে এবং ভক্তিতে। যে ভয় ছিল গোড়ায় তোমার ধান্দার মূলধন, তোমর হিসেবি নকশায় সে ভয় কিছুটা পাল্টে যাচ্ছিল ভক্তিতে, সেই উথলে ওঠা ভক্তিই কি কাল হল? তোমার উপর এত মানুষের ভক্তির বহরে কি ভাঁজ পড়েছিল অনেক চওড়া কপালে?

কত রাত হল এখন? কত রাত? প্রেতজীবনে কোনো দিন নেই, পুরোটাই রাত, তাই পৃথিবীর দিন-রাতের হিসেব গুলিয়ে যায় তোমার। কত রাত পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে প্রেত হয়ে ঘুরবে তুমি জান না, ফিরে আসতে হবে একদিন, মানুষ জন্ম চাও কি তুমি? চাও

কি আবার পৃথিবীর এককোণে সুজনডাঙায় ফিরে আসতে?

নাকি কীট হবে? পতঙ্গ হবে, শালিখ কিংবা প্যাঁচা হবে? নাকি গাছ হবে?

নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থাকা ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকাও তুমি, সেও দেখে তোমায়। এই গাছতলা থেকেই তোমায় তুলে নিয়ে গিয়েছিও আইন-রক্ষকবাহিনী। সব মনে পড়ে তোমার।

মাঝবয়েসী একটা লোক এলো। বিকেল পাঁচটা। মেঘে মেঘে থমথমে আকাশ। কত লোকই তো আসে, কতজনার কত সমস্যা মেটাতে হয়, তুমি বললে, বলুন?

আমায় নিধুবাবু পাঠিয়েছেন—

জানি, কাজের কথা বলুন।

আমার একমাত্র মেয়ে নন্দিতাকে ফুঁসলে নিয়ে গেছে এক বদমাশ।

কত বয়েস আপনার মেয়ের?

বাচ্চা মেয়ে, কুড়ি বছর, কলেজে পড়ছে।

ও। তা আপনার বাচ্চা মেয়েকে ফুঁসলে নিয়ে গেছে মানে? ছেলেটাকে চেনেন আপনি?

ছেলে কি বলছেন, লোক বলুন। বদমায়েশের ধাড়ি একটা। আমার নন্দুকে পড়াত।

লাভ কেস?

লাভ লোকসান বোঝার মতো বয়েস হয়েছে আমার মেয়ের? ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।

মামা, মানে পুলিশের কাছে যাননি?

হ্যাঁ, দুদিন কেটে গেল, কিছু করেনি ওরা।

লোকটা থাকত কোথায়?

বারাসতে।

খোঁজ নিয়েছেন?

হ্যাঁ, বাড়িতে যায়নি। বাড়ির লোক কিছু জানে না বলছে, মিথ্যে কথা!

মেয়ে কোনো চিঠি-টিঠি—

হ্যাঁ, চিঠিতে লিখেছে ওরা বিয়ে করবে।

তা, জামাইকে মানতে এত আপত্তি কেন?

জামাই!

জামাই নয় তো কী? মেয়ে আপনার খিল্লি খেয়েছে, দুদিন কেটে গেছে, বিয়েও হয়ে গেছে। দেখুন, দু'জন অ্যাডাল্ট ছেলেমেয়ে লাভ কেস করে বিয়ে করলে—শিক্ষিত ছেলে, মেনে নিন।

কী বলছেন। লোকটার চল্লিশের ওপর বয়েস, আগের পক্ষের বউ ছেলে-মেয়ে আছে!

ও। তা হলে তো ঘাপলা কেস! কোথায় থাকতে পারে কিছু—

সে জন্যেই তো নিধুবাবু পাঠালেন আপনার কাছে। সুজনডাঙাতেই নাকি আছে ওরা।

হুঁ। ফটো আছে মেয়ের?

ফটো পেলে। ফটো নিয়ে দেখতে দেখতেই মোবাইলে নিধুদার ডাক। নিধুদা তোমার দাদার দাদা, সুপার বস। সামনের অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে নমিনেশন পাবেন শোনা যাচ্ছে। নিধুদার হুকুম তামিল করতে ফটো হাতে তোমরা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা সুজনডাঙায়। নিধুদার হুকুমে পুলিশও খুঁজছে, পুলিশ কিছু করছে না তা নয়, তবে পুলিশের থেকেও নিধুদার ভরসা বেশি তোমার ওপর।

সন্ধ্যে থেকে চার-পাঁচ ঘন্টা সুজনডাঙা চষে ফেলে তোমার বাহিনী, ঠিক পাকড়াও করে নিয়ে এলো, সে লোকটা, কী নাম যেন, হ্যাঁ, বিমল, বিমল আর নন্দিতাকে। নন্দিতা বিমলকে ছেড়ে যাবে না কিছুতেই, প্রায় জোর করে ওর বাপের সঙ্গে গাড়িতে তুলে দিলে।

কিন্তু বিমল? চট করে ছেড়ে দেওয়া যায় না। চাপলুসি মানে মেয়ের পাচারের দলে আছে কিনা জানা দরকার। তোমার এরিয়ায় এসব অ্যালাও করতে চাও না তুমি। সুতরাং শুরু হল ইন্টারোগেশন, কিন্তু লোকটা বড় ঠ্যাঁটা, মুখ খোলে না, শুধু বলে আগের পক্ষের বউয়ের সঙ্গে দশ বছর হল ডিভোর্স হয়ে গেছে, নন্দিতাকে ও কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে এসেছে।

দু-চারটে আলতো চড়-থাপ্পড় দিতেই উল্টে চোখ রাঙাতে শুরু করল, বলল, আপনারা বেআইনি কাজ করছেন, আমি কিছু অন্যায় করিনি। ফেঁসে যাবেন আপনারা!

কী হেক্কার! চিতার ডেরায় এলে লোকে শালা পেচ্ছাপ করে দেয় আর এ মাল হেক্কার দেখায়! একটু কড়া দাওয়াই দিতে হল। পাঁচ মিনিটেই ওষুধে কাজ, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল। কিছুক্ষণ নেড়েঘেঁটে বুঝলে, না কোনো চাপলুসি কারবারে নেই মালটা। ডাক্তার ডেকে এনে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে গরম দুধ খাইয়ে মালটাকে যখন বাড়ি পৌঁছে দেবে ভাবছ, তখনই জিপে এসে দাঁড়াল সর্দারপাড়া নবযুবক সংঘের সামনে। বড়বাবুকে আপ্যায়ন করে নিয়ে বসালে ক্লাবের ভেতর, এক পেগ চড়ালেন বড়বাবু, সুখ-দুঃখের কথা হল, তারপর বললেন মালটাকে নিয়ে হাজতে পুরবেন, নিধুদার অর্ডার।

আজও তারা নেই শরতের আকাশে। রাত কত হল? গনগনে অন্ধকারে জোনাক জ্বলে নাকি জোনাকি নয়? জোনাকির প্রেত? সুজনডাঙা যেন এক প্রেতপুরী হয়ে ছমছম করে। দূরে ডিজেল ইঞ্জিনের হুইসিল, ঘটাং ঘটাং শব্দে মালগাড়ি যায়। কতকালের চেনা আওয়াজ তোমার, কত জন্ম কাটিয়েছ তুমি সুজনডাঙায়। চিতা হওয়ার আগে অন্য কিছু হয়ে কি চরে বেড়াতে সুজনডাঙার মাটিতে জলে বাতাসে? ঘাস হয়ে ছিলে নাকি শান্তির পায়রা? কতবার পায়রা হয়ে চক্কর কেটেছ সুজনডাঙার আকাশে?

অন্ধকারে জোনাকি নাকি জোনাকির প্রেত, গাছের পাতা দুলে উঠলে বাতাসে কি লতপত করে পচা গন্ধ? নাকি গনগনে অন্ধকারে হু-হু করে ছুটে আসে লম্পট বাতাস আর অশরীরী

শরীর নিয়ে তুমি আবার উড়ান দাও আকাশে।

নিচে পৃথিবী, পৃথিবীর এককোণে সুজনডাঙা, সুজনডাঙার দিঘিপাড়া, সর্দারপাড়া বুড়ির মাঠ, ডোবা বিল খাল, স্কুল পোস্টঅফিস ব্যাঙ্ক, রেললাইন—রেললাইন ধারে চওড়া নালা, নালার ধারে প্রাচীন বট। তুমি নেমে আস বটের শাখায়। অশরীরী শরীর মেলে দাও বটের কোলে শাখায় ঝুরিতে।

সে রাতে, রাত তখন দুটো-আড়াইটে, বিমলকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ। কী ঘটতে চলেছে জানতে না তুমি, তুমি ভাবলে বেশ কিছু মাল খিঁচে নিয়ে কোন পেটি কেস দিয়ে কাল কোর্টে তুলবে বেচারাকে।

কিন্তু ঘটল অন্যরকম। বড়বাবু ও আরও তিন-চারজন সম্পূর্ণ মদ্যপ অবস্থায় সারারাত আনতাবড়ি ধোলাই করল বিমলকে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজা উঠে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরেও চলল লাঠির বাড়ি, লাথি। বেচারা টেঁসে গেল থানাতেই। আর ফেঁসে গেল পুলিশ। বডি হাসপাতালে পাঠিয়ে বলল ভ্যান থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে মরেছে। বেঁকে বসলেন ডাক্তারবাবু। পুলিশের সাজানো রিপোর্ট দিতে রাজি নন তিনি। ওদিকে খবর গেল বারাসতে বিমলের বাড়িতে, খবর চাউর হল সারা সুজনডাঙায়, উত্তাল হয়ে উঠল সারা সুজনডাঙা, থানা ঘেরাও করল নাগরিক কমিটি, ট্রেন অবরোধ বারাসতে। ছুটে এলো কলকাতার খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল।

তখনও বুঝতে পারনি তুমি কী নাচছে তোমর কপালে। নিজেরা বাঁচতে পুলিশ পুরো দোষ চাপিয়ে দিল তোমার ঘাড়ে। হোমরা-চোমরাদের কাছে রিপোর্ট গেল চিতা আর তার দলবল পিটিয়ে মেরেছে বিমলকে, নবযুবক সংঘ থেকে বডি উদ্ধার করে পুলিশ পাঠিয়েছে হাসপাতালে। পুলিশের এই বক্তব্যই প্রচারিত হয় মিডিয়ায়।

সেদিন সন্ধে থেকেই সুজনডাঙা জুড়ে শুরু হল যাকে বলে—চিরুনি তল্লাশি। তোমার দলের দু-একটা চুনোপুটি অ্যারেস্ট হল। তোমার দাদাদের কাছে খবর পাঠালে, আসল ঘটনা জানালে তুমি। কিন্তু দাদারা বলল, সারেন্ডার কর, খুব উঁচুমহলে চলে গেছে কেসটা। সারেন্ডার করলে থিতিয়ে যাবে কেস, তারপর ঠিক হয়ে যাবে সব।

সাতদিন কাটল এভাবেই। কিন্তু চিতাকে খতম করার প্ল্যান করে ফেলেছে তোমার দাদারাই সে কথা আঁচ করতে পারলে না তুমি। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে—ওকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।

বটের পাতা ডালপালা কাঁপে, বাসি পচা মাংসের গন্ধে ম-ম করে চারপাশ, লম্পট হাওয়ায় কাঁপে অন্ধকার।

রোজ রাতে ডেরা বদল করে চলছিলে তুমি। সুজনডাঙায় থিকথিক করছে মামা আর খোচর। ভাবলে কিছুদিনের জন্যে বহুদূর কোথাও চলে যাবে। পাটনাতে একটা কানেকশন ছিল তোমার, হীরাভাই, ওকে অনেকদিন শেলটার রেখেছিলে তুমি, ওর ওখানে থাকবে

কিনা ভাবছিলে।

শেষ পর্যন্ত মোবাইলে নিধুদাকে ধরলে তুমি।

দাদা, কী করব?

সারেন্ডার।

কেন?

এ ছাড়া উপায় নেই।

খোচরদের বাঁচাতে গচ্চা যাব আমি?

আমার হাত-পা বাঁধা, কেস অনেক ওপর মহলে চলে গেছে।

খোচরেরা ঘাপলা করবে আর আমি—

সারেন্ডার না করলে বাঁচবি না তুই।

মানে?

কতদিন পালিয়ে থাকবি—ধরা পড়লেই এনকাউন্টার।

আর সারেন্ডার করলে?

তিন মাস অন্দর হবি, চার্জশিট হবে না, জামিনে বেরিয়ে আসবি।

ধান্দার কী হবে?

ভেতরে বসে অপারেট করবি। কিন্তু সারেন্ডার না করলে তোকে ছাড়বে না—ধান্দা চালু রাখতে পারবি ভেবেছিস তুই?

আর কোনো হিল্লে নেই?

না।

কত পাত্তি লাগবে? যত চাও দেব।

পাত্তি খসিয়ে কিচ্ছু হবে না। তুই বুঝতে পারছিস না, মিডিয়ায় তোকে নিয়ে হইচই, তুই এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিগার—বিমলকে নিয়ে ফেঁসে গেছে পুলিশ, মানবাধিকারওলারা চিল্লাচ্ছে, তোকে কোর্টে প্রোডিউস না করতে পারলে ওপরতলা পুলিশকে ছাড়বে না, বড়বাবু মেজবাবু সব সাসপেন্ড হয়ে আছে—আমার কথা শোন, সারেন্ডার কর আজকেই, দেরি হয়ে গেলে মুশকিল—

কী মুশকিল? মিডিয়ায় চিল্লাচিল্লি দুদিন পরেই ঠাণ্ডা মেরে যাবে—

অত সোজা না কেসটা। জল অনেক ওপরে গেছে বারবার বলছি তোকে —আমাদের পরে চাপ আসছে পার্টির ভেতরে—আগের মতো ধান্দা চলবে না আর।

কিন্তু—

কোনো কিন্তু নয়। আজ সন্ধেয় ক্লাবের সামনে আয়, পুলিশকে বলে দিচ্ছি আমি, যদি না শুনিস, আমার দিক থেকে কোনো হেল্‌প পাবি না, দেখ কী করবি—

কিন্তু—

লাইন কেটে দিয়েছিল নিধুদা। কোনো দাদা এখন আর শেলটার দিচ্ছে না তোমায়, পালিয়ে কী বাঁচতে পারবে? তার থেকে সবাই যখন চাইছে, তা হলে সারেন্ডারই ভালো। আবার মোবাইলে ধরলে তুমি নিধুদাকে—জানিয়ে দিলে তার ইচ্ছে মতো সন্ধ্যায় ক্লাবের সামনে আসবে, নিধুদা বলল, ঠিক আছে, লোকজন কেউ যেন না থাকে। তুই সাতটায় আসবি, একা, বড়জোর একজন থাকতে পারে। পুলিশ যাবে সাতটা পাঁচে। কোনো চিন্তা নেই, আমি আছি তো!

বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ! নকশাটা ধরতে পারলে না তুমি। লোকজন থাকলে, মিডিয়া খবর পেলে এনকাউন্টার করা মুশকিল। নিধুদা যে গদ্দারি করবে, টের পাওনি তুমি। অথচ কী ক্ষতি করেছ তুমি ওর? পয়সার বড় একটা বখরা নিয়মিত ভেট দিয়ে এসেছ, যা বলেছে শুনেছ, শুধু শেষের দিকে দু-একটা কেসে একটু বেগড়বাই করেছিলে, পার্টিতে ওর অ্যান্টিগ্রুপের এক উঠতি নেতাকে ঝেড়ে দিতে বলেছিল, রাজি হওনি তুমি, তাতেই পাল্টি খেয়ে গেল! উলটিবাজ নিধু ঘোষকে বুঝতে পারনি তুমি।

সন্ধ্যায় সঙ্গে তোমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুই শাগরেদকে নিয়ে ক্লাবের সামনে পৌঁছলে। গত সাত-আটদিন ধরে জায়গাটা নিঝুম হয়ে থাকে। লোকজন নেই, আশপাশের বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ।

বাইকে করে নামলে তোমরা তিনজন। গাছতলায় বসলে। এক মিনিটের মধ্যেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো সিভিল ড্রেসে সাত-আটজন খোচর। আগেই এসে অন্ধকার সেঁটে ছিল ওরা। টর্চ ফেলল মুখে, একজন বলল, ঠিক আছে, চিতা।

তারপর মোবাইলে কাকে যেন ধরল, দু-মিনিটের মধ্যে একটা টাটা সুমো এলো। ওরা বলল, চল। তোমাদের তিনজনকে গাড়িতে তুলে নিল। ওদের মধ্যে একজনকেই কেবল চিনতে পেরেছিলে তুমি, সুজনডাঙা থানার ছোটবাবু। তুমি তাকে বললে, থানায় যাচ্ছি তো? উনি গম্ভীর গলায় বললেন না, লালবাজার।

গাড়ি সুজনডাঙা ছেড়ে বি টি রোডে উঠল, তারপর যে দিকে টার্ন নিল, সেদিক দিয়ে কোনোভাবেই লালবাজার যাওয়া যায় না। সেই প্রথম তোমার সন্দেহ হল, কী একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আঁচ করলে তুমি। তুমি চিৎকার করে জানতে চাইলে কী ব্যাপার? কোনো উত্তর নেই।

ওরা একটু নির্জন জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করাল, তোমার দুই শাগরেদকে তুলে নিল আরেকটা টাটা সুমোয়। তোমার হাতে পায়ে ততক্ষণে বেড়ি পরান হয়েছে জোর করে, চোখ বেঁধে মুখে রুমাল গোঁজা হয়ে গেছে। তোমার আর সন্দেহ রইল না, কী ঘটতে চলেছে। গাড়িটা ওখানেই ওভাবে দাঁড়িয়েছিল দু'ঘন্টা। তারপর চলতে শুরু করল। আধঘণ্টা পর সব কিছু খুলে তোমাদের তিনজনকেই নামিয়ে দেওয়া হল যে জায়গায় সেটা ঠিকঠাক চিনে উঠতে পারছিলে না তোমরা। রেললাইন, ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়তে বলা হল তোমাদের, ওরা দৌড় দিল, তুমি নড়লে না, ঠায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইতে

লাগলে, যে তুমি একদিন অন্যের প্রাণ নিয়েছ হাসতে হাসতে আর অপর প্রান্তে কেউ কেউ হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল—তাদের মুখ কি মনে পড়ছিল তোমার? সেই মুহূর্তে কি ভাবছিলে তুমি জীবন মায়াময়, কি সুন্দর এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস—তারপর এক সময় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকেই ...

প্রেত হয়ে পৃথিবীর আকাশ বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে বিধাতার বিচারের কথা ভেবেছ তুমি। ভেবেছ অপরাধীর উচিত শাস্তি হয়েছে। কখনও ভেবেছ অপরাধের দায় তোমার নয় গোটা সমাজের। আবার ভেবেছ, না, ব্যক্তি হিসেবে তুমি এবং সমাজব্যবস্থা দুইই সমান দায়ী তোমার এই পরিণতির জন্যে।

দিন যায়, মাস যায়, দেশ দেশান্তরের আকাশে বাতাসে ঘোর তুমি। বিধাতার বিচারের অংক কিছুতেই আর মেলাতে পার না।

পৃথিবীর মানুষের বেশে কত শত জ্যান্ত প্রেতের মিছিল। একটা নিরীহ মানুষেরও প্রাণ নাওনি তুমি, অথচ কাবুল, কান্দাহার থেকে ইরাক—কত লক্ষ নিরীহ মানুষ খুন হয়ে যায়, নিখুঁত নকশা ফেঁদে ঠাণ্ডা মাথায় বোমায় গুলিতে খাবার সরবরাহ বন্ধ করে খুন করা হয় তাদের, দাগী খুনিরা তা থৈ নাচে—হাহাকারে ভারি হয়ে আসে পৃথিবীর বাতাস!

শরতের রাতের আকাশে তারা নেই আজও—বটের শাখা ছেড়ে উড়ান দাও তুমি, তোমার অশরীরী শরীর থেকে ফোঁটাফোঁটা অন্ধকারে ঝরে পড়ে পৃথিবীতে, ভিজে ওঠে পৃথিবীর মাটি, ঘাস, লতাপাতা।

পৃথিবীতে কী এভাবেই তৈরি হয়ে যায় অন্ধকারের নদী, নদী নাকি সাগর? সে সাগর কি একদিন জমাট বারুদ হয়ে উঠবে?

শোঁ-শোঁ উড়ে যাও তুমি। শরতের রাতের আকাশে তারা নেই।

আকাশ জুড়েও অন্ধকারের সাগর।

বিধু বিশ্বাসের খিদে

চোখ-মাথা-কান একসঙ্গে সব ঝনঝনিয়ে উঠল।

সোফায় শরীর এলিয়ে অলস আবেশে ঘুরছিলাম টিভির এ-চ্যানেল ও-চ্যানেল—টেনিস তারকার সাক্ষাৎকার থেকে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের বক্তিমা, উজ্জ্বল ত্বকের গোপন রহস্য থেকে তিলজলার বাস দুর্ঘটনা, কোলা-কীর্তন থেকে মেরা স্বপ্ন মেরা...থিতু হতে পারছিলাম না কোথাও। কিন্তু ঝনঝনিয়ে উঠে চোখ থ মেরে রইল এক বিদেশি চ্যানেলে—বিধুর খাওয়ার দৃশ্য, নিশ্চয় গোপন ক্যামেরায় তোলা, সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মতামত!

বিধান বিশ্বাস ওরফে আমাদের বিধু, মিরর ইন্ডিয়ার ঠিকা শ্রমিক। আমার সঙ্গে আলাপ বেশ কয়েক বছর আগে, রাস্তায় আমার মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে ঠিকানা খুঁজে বাড়ি এসে ফেরত দিয়ে গিয়েছিল। ভালো লেগেছিল ছেলেটিকে।

কিন্তু গত কয়েক মাস আগে ওর বিচিত্র খিদে ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে পেরে ওর অস্তিত্বকেই কেমন অবিশ্বাস্য মনে হত আমার। তারপর হঠাৎ ওর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া—সব ব্যাপারটাই যেন এক অদ্ভুত কল্পকাহিনি!

মানুষ কী খায়? তলিয়ে ভাবলে বড়ো গোলমেলে প্রশ্ন। পৃথিবীতে কত দেশ, কত জাতি, কত খাদ্যবৈচিত্র্য, কত ধরনের খাদ্যাভ্যাস—এক দেশের মানুষের কাছে যা সুখাদ্য, অন্যদেশে তা-ই অখাদ্য। চীনদেশের মানুষ ব্যাং বা আরশোলা খায় শুনে অনেক বাঙালি ওয়াক তোলে, আবার সুপক্ক যে গোমাংস একাংশের কাছে অতি সুস্বাদু আহার্য, তা-ই অন্যদের কাছে খাদ্যদ্রব্য হিসেবে উচ্চারণ করাও পাপ!

শুধু কি তাই? আরও নানারকমের জটিলতা আছে, যেমন আমাদের পাড়ার মিস্টার আর. আর. সেন। তার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রয়েছে স্যান্ডউইচ, চিকেন স্টু, মিক্সড ফ্রুট, স্যালাড ইত্যাদি, আবার বিধু এসব খাবার তো দূরের কথা, কোনোদিন নাম শুনেছে কি না সন্দেহ!

বিধুর বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, মাঝারি হাইট, ছিপছিপে শরীরে পেটটা বেশ ফোলা, চোখজোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, রোদে পোড়া তামাটে রং।

কে কে আছে বাড়িতে?

শুনেই বিধু হেসেছিল। শব্দহীন হাসি ফুরিয়ে গেলে ঠিকরে বেরোন চোখে বিষণ্ণতার ছায়া।

বাড়ি! মেথরপট্টির ওদিকটায় গেছেন কোনোদিন?

এ শহরে আমার জন্ম, অন্য কোথাও বাস করিনি, শহরের সবদিকে গেছি।

মেথরপট্টি ছাড়িয়ে খালধারের বস্তি, ওখানেই থাকি, দুটো ঘর। ছোটো ঘরটায় দোকান, বড়ো ঘরটায় সবাই মিলে—বাপ, মা আর এক বোন, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।

কীসের দোকান?

পান, বিড়ি অল্প কিছু মুদিখানার মাল—বস্তির লোকেরাই কেনে।

আর একদিন জিজ্ঞেস করলাম, স্কুলে গেছিস?

হ্যাঁ, সেভেন পর্যন্ত।

আর পড়লি না কেন?

বাপ আর পড়াতে পারল না।

কেন? মাইনে লাগত না তো?

শুধু মাইনে ফিরি হয়ে কী হবে? বইখাতার খরচ—তাছাড়া দোকানের কাজে লাগতে হল, তখন থেকেই বাপকে রোগে ধরেছিল—চায়ের দোকানেও কাজ করেছি ক'বছর।

ধীরে ধীরে বিধুর জীবনবৃত্তান্ত আরও খানিকটা জানলাম। মিরর ইন্ডিয়ার ঠিকা শ্রমিক, ঠিকাদারের অধীন, প্রতিদিন পায় ৮৮ টাকা, নো ওয়ার্ক নো পে, সবেতন ছুটিছাটার বালাই নেই। ডিউটি আওয়ারস সকাল ৬-৩০ থেকে বিকেল ৪টে, মাঝে ১১-৩০ থেকে ১টা পর্যন্ত টিফিন। দোকান থেকে আয় কমবেশি মাসে পাঁচশো। বোন আর মা মিলেই দোকান চালায় সারাদিন, সন্ধের পর বিধু।

একদিন জোর করে টেনে নিয়ে গেল ওদের বস্তিতে। দশ-বারো বছর আগে একবার এসেছিলাম, আয়তনে অনেক বড়ো হয়েছে বস্তিটা, ঘিঞ্জি হয়েছে আরও। আসলে মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে জানতে চাইতাম ওর বাপ-মায়ের কথা, বস্তির জীবনযাত্রার কথা, কেমন ঘর—এইসব। তাই একদিন ধরে নিয়ে এল, বলল—নিজের চোখেই দেখে যান।

কাছেই রেললাইন, ঘন ঘন ট্রেনের হুইস্‌ল, পচা খাল থেকে ওঠা গা গুলোনো গন্ধ, ঘুপচি দুটো ঘর, মাটির মেঝে, টালির চাল বেড়ার ফাঁকফোকরে হোগলাপাতা গোঁজা। ভেতরে তক্তপোশে দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে ওর বাবা, খকখক কাশি, ঘরে তারস্বরে টিভি চলছে, পোর্টেবল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আমির জুহিতে এঁটে আছে ওর বোন। ধমক দিল বিধু—টিভি ভেঙে ফেলে দেব! সারাদিন খালি—

আমায় দেখে থতোমতো খেয়ে ওর বোন বেরিয়ে গেল। বিধু বলল—দাদা, বোনটাকে নিয়ে বড়ো চিন্তা। দেখলেন তো, দুবলা শরীর, কে নেবে ওকে? সারা বছর ভোগে! এর মধ্যে একদিন কার কাছ থেকে কিরিম এনে মুখে মেখে ফরসা হতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবু ডাক্তারের কাছে গিয়ে একগাদা টাকা—

মশার দাপটে ঘরে বসা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। ওর বাবা কাশতে কাশতেই দুর্বোধ্য স্বরে কী সব যেন বলছিল—বিধু উঠে নোংরা তালিমারা তেলচিটে মশারিটা টাঙিয়ে দিল।

বস্তির নানা ঘর থেকে বিচিত্র শব্দের দাপাদাপি, কোনো বাচ্চা তারস্বরে কবিতা মুখস্থ করছে—ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...তাকে চাপা দিয়ে তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ—মর্, মর্, কুত্তায় ছিঁড়ে খাক্ ... তাকে চাপা দিয়ে ট্রেনের একটানা তীব্র হুইস্‌ল—কুত্তার ঘেউঘেউ, শুয়োরের কানফাটানো আর্তনাদ, কোথাও বাজছে 'ও আমার বৌদিমণির

কাগজওয়ালা', টিন পেটানোর আওয়াজ, বাচ্চার কান্না—সব মিলেমিশে এক বিচিত্র শব্দপিণ্ড!

আধঘণ্টার বেশি থাকতে পারিনি, পালিয়ে এলাম। ফেরার পথে বিধুর কাছ থেকে জানলাম, ওরা অনেক আগে হাওড়ার এক বস্তিতে থাকত, ওর জন্মের আগে বাবা হাওড়ার এক কারখানায় কাজ করত। কয়েক বছর পর অসুস্থ হয়ে পড়ে, কাজ চলে যায়। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে রেল স্টেশনে আড্ডা দিয়েছিল বিধু—আর সেদিনই হঠাৎ কথায় কথায় প্রথম জানতে পেরেছিলাম ওর বিচিত্র খাদ্যাভ্যাস। বিশ্বাস করিনি। নিজের চোখে না দেখলে কে-ই বা বিশ্বাস করবে?

কী কী খেতে পারে মানুষ? এ দেশে এক বড়ো সংখ্যার মানুষ গেঁড়ি, গুগলি, শামুক, কচুশাক ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। কয়েক বছর আগের ঘটনা—ওড়িশায় প্রবল খরায় কিছু মানুষ ঘাসের দানা খেয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছিলেন, খবরের কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি হওয়ার পর কোনো এক মন্ত্রী বলেছিলেন—ওসব ওরা খুশি হয়েই খায়!

মিডিয়ার কল্যাণে এ তথ্যও অনেকে জেনেছেন যে, কেউ কেউ নাকি ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন বা ঝিঙে ইত্যাদি সবজি কাঁচা চিনিয়ে খান!

কোনো কোনো মানুষ গ্যাস খান, তেল খান, ধমক খান, কেউ কেউ চেটেপুটে ঘুষও খান, আবার সুকান্তর কবিতা থেকে জানা যায় সবচেয়ে ভালো খেতে নাকি গরিবের রক্ত!

যাক সে কথা, তা আমাদের বিধু কী খায়?

সে খায় মাটি, ঘাস, প্লাস্টিক প্যাকেট, কাগজের ঠোঙা, দেশলাই বাক্স, ছেঁড়া কাপড়, পোড়া সিগারেটের ফিল্টার, পুরোনো ছেঁড়া চটি বা জুতো, যে কোনোরকম আগাছা, এমনকি বিছুটিপাতাও।

জন্ম থেকেই যে ও এসব খেয়েই টিকে আছে তা নয়, বছরখানেক হল ওর এরকম খাদ্য তালিকা। ভোরে উঠে চান-টান করে কাজে বেরোনর আগে দু'গ্লাস জলের সঙ্গে কোনোদিন হয়তো একবাটি খালপাড়ের মাটি আর দুটো প্লাস্টিক বা পলিথিনের ছোটো প্যাকেট—ব্যস্! সারাদিন আর খিদে লাগে না। আবার কোনোদিন হয় তো একটা ছেঁড়া চপ্পলের দুটো ছোটো টুকরো আর তিনটে দেশলাই খাপ—খাওয়া শেষ।

খাদ্যবস্তু জোগাড় করতেও ঝামেলা নেই কোনো, খালধার, বাজার, রাস্তা— যে কোনো জায়গায় একটু ঘোরাঘুরি করলেই খাবার জোগাড় হয়ে যায়। এটা সেটা ছাইপাঁশ কুড়োতে দেখে লোকজন কৌতূহলের হুল ফুটোলেই গম্ভীর মুখে বলে—বিজনেস করছি, সাপ্লাই দিতে হয় এসব!

প্রথম প্রথম ঘরের লোকেরা ছাড়া জানত না কেউ, পরে কেউ কেউ শুনলেও বিশ্বাস করেনি, নিজের চোখে না দেখলে আমিও কি ছাই বিশ্বাস করতে পারতাম?

চোখ কচলে গায়ে চিমটি কেটে দেখলাম—না, স্বপ্ন নয়, নেশাও করিনি। বললাম, এ কী কাণ্ড বিধু?

বড়ো খিদে দাদা! বলবেন না কাউকে।

আমি তো এখনও ঠিক বিশ্বাস—

সারাদিন খেটেখুটে বড়ো খিদে পেত, অথচ অনেকদিন সেভাবে খাওয়া জুটত কই? বাপের অসুখ, দিদির বিয়ের দেনা, আবার বোনটাও বড়ো হচ্ছে—একদিন খিদের জ্বালায়, রাতে হাঁড়ির সবটুকু ভাত খেয়ে নিয়েও খিদে মিটল না, মা আর বোন উপোস দিল। সে রাতে কী মনে করে ছেঁড়া চপ্পলের একটা টুকরো চিবিয়ে—খারাপ লাগল না, খিদেটাও মিটল, তারপর থেকেই—

বিধু চায় না ব্যাপারটা জানাজানি হোক, ওর ধারণা তা হলে পুলিশে ধরবে ওকে। ইতোমধ্যে অবশ্য দু-একটা খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল থেকে সাংবাদিকরা এসে দেখা করেছিল, স্রেফ আজগুবি গল্প বলে বিধু ওদের ভাগিয়ে দিয়েছে।

তা—আমি বললাম, তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন? চুরি ডাকাতি করিসনি—পুলিশ কী করবে তোর?

ভয় তো সেটাই!

মানে?

চোর-ডাকাতদের আর পুলিশ কী ভয়? ভয় আমাদের মত সাদাসিধে গরিব পাবলিকের, তাছাড়া—

কী?

আমি কী খাই দুনিয়ার সক্কলের জানার দরকারটা কী শুনি?

খবর কাগজ বা টিভির দরকার আছে বই কি!

কেন?

তুই মাটি খাস, পাবলিক খবর খায়, কিন্তু সব খবর খায় না, খাওয়ার মতো খবরের খোঁজ পেলে তবেই—

বুঝেছি, ছাড়ান দেন।

একটা কথা—

বলেন—

তুই ইচ্ছে করলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারিস এখন!

কী রকম?

শো করবি, টাকা নিবি।

শো?

হ্যাঁ, শো—আরে বাবা, যেমন ম্যাজিক শো হয়, গানের জলসা, মূকাভিনয়—

কী! রাগ কোরেন না দাদা—ছিট আছে মাথায় আপনার!

হাঁদারাম! তুই বুঝলি না, লোকে টিকিট কেটে তোর খাওয়া দেখতে আসবে—চপ্পল কিংবা দেশলাই বাক্স চিবিয়ে খাচ্ছিস, জমে যাবে একদম!

ইয়ার্কি দিচ্ছেন!

ইয়ার্কি নয় রে ভাই, সত্যি বলছি।

হ্যাঁ, ওসব করি আর পুলিশে—

আবার পুলিশ! তুই কি বেআইনি কিছু করছিস? এনটারটেইনমেন্ট ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স সব দিবি, তা হলে আর—

কোন্‌টা আইন কোন্‌টা বেআইন কে জানে! না দাদা, ওসব গোলমালের মধ্যে আমি নেই!

কোনো গোলমাল নেই—রাতারাতি অনেক টাকার মালিক হবে যাবি, বস্তি ছেড়ে ভালো বাড়িতে থাকবি। ইচ্ছে করে না তোর?

থাক, ইয়ার্কি মেরেন না আর!

আরে বোকা, বাজার অর্থনীতির যুগ এখন, কেনাবেচাই আসল কথা, যা বেচতে চাইবি ঠিকঠাক বিজ্ঞাপন করে ছাড়তে পারলে—

ঠিকরে বেরোন চোখদুটো দিয়ে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট তাকিয়ে বিধু দৌড় মারল চোঁ চোঁ, যেন পাগলের পাল্লায় পড়েছে!

দু-তিন সপ্তাহ পর ফের দেখা বাজারে, সকাল দশটা নাগাদ। কাজের দিন, আমি বললাম, কাজে যাসনি?

এসটাইক চলছে।

স্ট্রাইক —কেন?

ওই—রেট বাড়াতে বলছি আমরা, তাছাড়া পি এফ—

পি এফ আছে তোদের?

আছে, কিন্তু জমা পড়ছে না। মাসে মাসে ৩৪৪ টাকা করে কেটে রাখে কনটাকটর। কিন্তু শালা হারামি—

আরও কিছু চোখা খিস্তি ছুঁড়ে দেয় বিধু কনট্রাক্টরের নামে, ভরা বাজারে। এ হেন শব্দদূষণ ধমক দিয়ে থামাতে হয় আমায়।

গোল বাধল এর দিন কয়েক পরেই। ইউনিয়নের দাবি কিছুটা মেনে নেওয়ায় স্ট্রাইক উঠে গিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। সব ফের স্বাভাবিক। কিন্তু বিধু হঠাৎ ভ্যানিশ!

সকালবেলায় কারখানায় গিয়েছিল, কাজ করেছে, বিকেলে ফেরার পথে রাস্তায় বা আবর্জনার স্তূপে নজর খুঁচিয়ে টুকটাক খাবার সংগ্রহ করে ঝোলায় ভরেছে, তারপর বাজারে কানুবাবুর দোকানের সামনে আরও অনেকের সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়িয়ে টিভিতে, সেহবাগের সেঞ্চুরি গিলেছে। উপরি পাওনা ছিল বেশ ক'টা বিজ্ঞাপন—বস্তুত বিধুর খেলার থেকেও ওই বিজ্ঞাপন মাদকেই আকর্ষণ বেশি! সন্ধের মুখে বস্তির দিকে পা বাড়িয়েছিল—এ পর্যন্ত ঠিক আছে, তারপর আর দেখা নেই তার।

পরদিন সকালে বিধুর মা আমার বাড়ি। বললাম, থানায় মিসিং ডায়েরি করতে। ওরা আমায় সঙ্গে যেতে বলল। ডায়েরি করে এলাম। মেজোবাবু বললেন, লেখালেখি নিয়ে আছেন তো বেশ, আবার এসবের মধ্যে কেন? পলিটিক্সে নামছেন নাকি?

মৃদু হাসি আমার। ফের মেজোবাবু—বস্তির কোনো ছুকরি কাল রাত থেকে মিসিং না তো? খোঁজ নিয়ে দেখুন।

তিনদিন পর ফিরে এল বিধু। কী ব্যাপার? জানতে চাইলে মুখে কুলুপ, ভয়ে জড়সড়ো। আমিও লেগে থাকলাম। ভাই-বন্ধু করে অনেক অভয় দেওয়ার পর যেটুকু বলল, তার সঙ্গে আমার অনুমান মিলিয়ে ব্যাপার যা দাঁড়ায় তা হল, সন্ধ্যেবেলায় রেললাইন পারের রাস্তায় বস্তিতে ঢোকার মুখে অন্ধকারে কারা ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল, বিধুর মুখে রুমাল চেপে ধরতেই অজ্ঞান। জ্ঞান আসার পর দেখল হাসপাতালের মতো একটা জায়গায় বেডে নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে বেঁধেছেদে রাখা হয়েছে বেচারাকে। বিশেষ করে পেটের ওপর একটা কমপিউটার মাউস জাতীয় জিনিস বোলাচ্ছে, গম্ভীর মুখে কিছু মানুষ উলটো দিকের দেয়ালে ছবি দেখছে আর ইংরাজিতে পরস্পরের মধ্যে মথা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। বিধু একটু উ-আঁ করতেই কী একটা স্প্রে করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর কিছু জানে না, ফের জ্ঞান আসতে দেখে যে জায়গা থেকে ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই পড়ে আছে।

ভয়ে জবুথুবু হয়েছিল বিধু, বলল—দেখলেন দাদা, কী বলেছিলাম?

কী?

জানাজানি হলেই বিপদ—পুলিশ না মিলিটারি কারা যে ধরে নিয়ে গেল, আবার—

কী?

আমেরিকার পুলিশও হতে পারে। জ্ঞান ফিরতেই সব দেখেশুনে আমি ভাবলাম পেট কাটবে বুঝি!

গোটা ঘটনাটা ভাবিয়ে তুলল আমায়। আকাশ-পাতাল ভেবেও কিছুই ধরতে পারছিলাম না। কী ব্যাপার, কারা ধরল বিধুকে, কেন ধরল।

তারপর বিদেশি চ্যানেলে বিধুর খাওয়ার দৃশ্য। হাওয়াই চপ্পল চিবিয়ে খাচ্ছে, নিশ্চিত গোপন ক্যামেরায় তোলা।

মতামত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা—খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, শারীরবিজ্ঞানী, বহুজাতিক সংস্থার এম. ডি. প্রমুখ। নানা দিক থেকে বিধুর খিদে ও খাদ্যের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল।

তৃতীয় বিশ্বের এক ঠিকা শ্রমিকের একরম খিদে সংগত না অসংগত? আজ যারা মাটি খাচ্ছে, কাল যদি তারা সংখ্যায় বাড়ে, তখন তারা যদি জমি খেতে চায় কিংবা লোহা বা প্লাস্টিকের বদলে গোটা কারখানাটাই খেতে চায়? কী হবে সেদিন? বলতে বলতে শিউরে উঠছিলেন অর্থনীতিবিদ।

শারীরবিজ্ঞানী জানালেন, একরম কেস ধরে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি, বরং মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থেই খরগোস বা গিনিপিগের মতোই গবেষণাগারে ওর দেহ চেরাচেরি করে পরীক্ষা করা উচিত ছিল!

বহুজাতিক সংস্থার জাঁদরেল এম ডি অবশ্য এদের সঙ্গে একমত নন। তিনি জানালেন,

বিধু বিশ্বাসের খিদে নিয়ে এত আতংকিত হওয়ার কিছু নেই। বরং বাজারের স্বার্থে এই অভিনব খিদে ও খাদ্যাভ্যাস কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তাই প্রকৃত কাজের কাজ। বিশ্ব জুড়ে ঠিকা শ্রমিক ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ছে। এতে সুবিধা অনেক, বাজারে মালের চাহিদা থাকলে শ্রমিক নেওয়া যায়, আবার চাহিদা না থাকলে বসিয়ে দেওয়া যায়—ইউজ অ্যান্ড থ্রো। তাছাড়া আগের মতো শ্রমিককে আর কোনো নির্দিষ্ট কারখানার দাসত্বে বাঁধা পড়ে থাকতে হচ্ছে না, মুক্ত বাজারে শ্রমিকও এখন মুক্ত! এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক যদি স্রেফ মাটি বা ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, মন্দ কী? খাওয়ার খরচ নেই বলে মজুরিও খানিক কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে!

বিশেষজ্ঞদের এসব মতামত শোনার পর তখনই বিধুর খোঁজ নিতে ইচ্ছে হল—কিন্তু বাইরে তুমুল বৃষ্টি। শরীরে অস্বস্তি, রাতে খেতে পারলাম না। বিধুর অসহায় মুখটা কেবল ভেসে ওঠে, ঘুম আসে না। বিছানা ছেড়ে উঠি, জল খাই, পায়চারি করি, ফের বিছানায়।

অনেক রাতে আধো ঘুমের ফাঁকে বিধু যেন এসে দাঁড়াল আমার সামনে। পেটটা আরও বড়ো হয়ে ফুলে আছে।

বিধু!

বড়ো কষ্ট দাদা!

কী হয়েছে?

পেটটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে!

না, না—হাসপাতালে নিয়ে যাব তোকে।

ডাক্তাররা কিস্যু করতে পারবে না!

কেন?

অনেক বড়ো ডাক্তার সাহেবরা দেখেছে আমায়, কিন্তু আমার খিদে কেবল বাড়ছে, বেড়েই যাচ্ছে, রাক্ষুসে খিদে।

রাক্ষুসে খিদে!

সামনে যা পাচ্ছি খেয়ে ফেলছি—এক সাহেব ডাক্তারকে খেয়ে ফেলেছি। খিদে পাচ্ছে, খাচ্ছি আর পেটটা ভার হচ্ছে, মনে হচ্ছে—

কী?

পেট ফুলছে, ফেটে যাবে এবার!

সে কী! তুই মরে যাবি!

শুধু আমি মরব?

আধো ঘুম আর জাগরণে অন্ধকারের গোপন গর্ভ থেকে আগ্নেয়গিরির মতো লাভাস্রোত ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখছিলাম কি? জেগে উঠে সব যেন ছায়া ছায়া অস্পষ্ট থেকে গেল।

পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ফের বিধু নিখোঁজ।

ফেরিওয়ালি

লাশ হয়ে ভেসে আছ তুমি।

টিপটিপ বৃষ্টি। তবু ভিড়। কচুরিপানা আর জলজ কত লতাপাতায় জড়িয়ে খালধারে, তোমার ফুলে ওঠা শরীর ঘিরে ভিড়। কত ফিসফাস, কত গুঞ্জন, কত প্রশ্ন কৌতূহল। খবর গেছে থানায়। একটু পরেই ব্যস্ত জিপ এসে দাঁড়াবে, আইনরক্ষকেরা নেমে পড়বেন কাজে, জল থেকে ডাঙায় তোলা হবে তোমায়, ঠিকঠাক বেঁধেছেঁদে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর কাটাছেঁড়া, মর্গের হিমে নিশ্চিন্ত ঘুমে শুয়ে থাকবে তুমি।

নগ্ন শরীরে কী চিহ্ন রেখেছ তুমি? কী দেখে শনাক্ত করবে তোমার বাবা, মা কিংবা বোন যে তুমি তাদেরই শর্বরী, আদরের শবু কিংবা দিদিভাই? বিকৃত হয়ে যাওয়া ওই মুখ শরীরে কি খুঁজে পাওয়া যাবে কোনো পরিচয় চিহ্ন?

কেমন দ্রুত সেজে উঠছে আমাদের কলকাতা, সে আর আগের মতো অসভ্য নেই, বর্বর মিছিলনগরী নেই, কেমন মডেল-সুন্দরীর মতো ঝকঝকে অপরূপ হয়ে উঠেছে সে! তার লাস্যে কামকলায় মুগ্ধ হয়ে উঠছে কত শত বিদেশি বণিক!

তবু সেই কলকাতার এক প্রান্তে, ফ্ল্যাটবাড়ির বাতাসে কী তীব্র হাহাকারের স্বর! অসুস্থ শরীর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আর ক্লান্ত বিধ্বস্ত হতে হতে থানা পুলিশ মর্গ-হাসপাতাল করে বেড়াচ্ছেন তোমার বাবা, জমাট পাথর হয়ে ঘরের এককোণে পড়ে আছেন তোমার মা, যে খাটে সেই বালিকাবেলা থেকে বোনকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে শুতে তুমি, সে খাটজুড়ে নোনাজলে ভেজা বালিশ চাদর তোষকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে তোমার বোন।

অনেক রাত, তুমি বাড়ি ফেরোনি, কোনোদিন এত রাত হয় না তোমার। সবাই জানে তুমি ফেরিওয়ালি, সেলস্ গার্ল, কখনো কাউন্টারে বসে মাল বেচো, কখনো বা নতুন পণ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ো শহর-শহরতলির ঘরে ঘরে। সারাদিন বিকিকিনি সেরে সন্ধে যখন রাতের কোলে যাই যাই করে, তখনই ফিরে আসো তুমি। কোনোদিন এত রাত হয় না তোমার।

প্রতিষ্ঠানের মালিক, মালিক হলেও তোমার বাবার বন্ধু। তাই অন্যদের থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা তুমি পেতে, এরকমই ভাবতেন তোমাদের বাড়ির সবাই। অন্যদের যেখানে খাটিয়ে ছিবড়ে করার পর বাড়ি ফিরতে নটা-দশটা বেজে যেত, তুমি তুলনায় কিছু আগেই ফিরতে। মালিক কি করুণাময় নন? অন্তত তোমার কাছে? প্রথম প্রথম তাকে করুণাময়ই মনে হত তোমার। বেশ স্নেহশীল, কর্মতৎপর, সদাশয় মানুষ। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই ক্রমেই তুমি বুঝতে পারছিলে তোমার বাবা 'বন্ধু' শব্দটার অর্থ না বুঝেই কেমন হালকাভাবে যে কোনো পরিচিতজনের আগে জুড়ে দিয়েছেন। তোমার মনে হয়েছিল, এ জন্যই আজ বোধহয় বাবার ব্যবসায় লালবাতি জ্বলেছে, বিপর্যয়ে বিধস্ত গোটা পরিবার। বছর সাত-আট আগে এককালীন থোক কিছু টাকা পেয়ে ভি আর এস-এ নাম লেখাতে

বাধ্য হয়েছিলেন বাবা। সে টাকাতেই বেলেঘাটায় ছোটো একটা কারখানা, দু-তিনজন শ্রমিক, লেদার ব্যাগ, ওয়ালেট এইসব তৈরি হত। কোম্পানি থেকে পাওয়া পুরো টাকাই ঢেলে দিয়েছিলেন ব্যবসায়। টাকাটাও গেল, ব্যবসাও গেল, তোমরা টের পেলে বছর দুই আগে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ে ছিলে তুমি। পড়াশোনায় মাঝারি। বি. এ. পাশ করে বিয়ে হয়ে যাবে এরকমই ভাবতে। স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাত্র পাওয়ার কোনো জেদ ছিল না তোমার। চাকরি করবে ভাবোনি কোনোদিন। খুব কিছু আরামে আয়াসে না হলেও মোটামুটি স্বচ্ছলভাবেই কেটেছিল জীবনের প্রথম কুড়ি-একুশ বছর।

কাকে বলে অভাব, ধীরে ধীরে টের পেতে শুরু করলে। পেনশন নেই বাবার, অতগুলো টাকা জলে গেছে, বাকি সঞ্চয় ভেঙে কদিন আর বেঁচে থাকা যাবে—দুশ্চিন্তায় বাবার শরীর ভেঙে গেল। বোন তোমার মতো নয়, খুবই ভালো ছাত্রী, অথচ তার প্রাইভেট টিউটরের খরচ জোগানো অসম্ভব হয়ে উঠছে। মা সুগারের রোগি, মাসে ওষুধ কিনতে অনেকগুলো টাকা লাগে। ফোন, গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল—এসব খরচ জোগাতেও যেন নাভিশ্বাস। এর মধ্যেই স্ট্রোক হয়ে গেল বাবার। নার্সিংহোম-হাসপাতাল করে বাকি যেটুকু সঞ্চয় ছিল তাও প্রায় নিঃশেষ।

বাবা হাসপাতালে যাওয়ার মাস তিন আগে চাকরি করতে নেমেছিলে তুমি। মাইনে-কমিশন সব মিলিয়ে মাসে তিন-সাড়ে তিন হাজার। কী হয় এতে?

সদাশয় মালিক মহাশয়ের আসল রূপ টের পেলে বাবা যখন হাসপাতালে প্রায় মৃত্যুশয্যায়। না, অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি তোমায় ভোগ করতে চাননি।

তুমি তাঁর চেম্বারে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে যখন বাবার অবস্থা, সংসারের নিদারুণ অনটনের কথা জানিয়ে কিছু টাকা ধার চাইলে তিনি খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে জেনে নিলেন তোমার সংসারের হাল-হকিকৎ। তারপর স্নেহের সুরে বললেন, তুমি আমার মেয়ের মতো, তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি আমি, কিন্তু তুমি বোধহয় জানো না তোমার বাবার কাছে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা পাওনা রয়েছে আমার, ধার নিয়েছিলেন, তাও প্রায় বছরখানেক হয়ে গেল।

শুনে প্রথমে অবাক হলে তুমি। তারপর বাবার উপর অভিমান হল। এ ব্যাপারটা জানাননি তো বাবা, সংসারের দায়িত্ব যখন তোমার কাঁধে, সবকিছু খোলামেলাভাবে তোমাকে জানানো উচিত ছিল তাঁর, এমনই ভাবনায় খুব অভিমান হল তোমার। তুমি অসহায় দৃষ্টিতে সেই 'করুণাময়'-এর দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললে, ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, সব শোধ করে দেব আমি, আপাতত—

কথা শেষ করতে না দিয়ে তিনি বললেন, বুঝেছি, কিছু টাকা দিচ্ছি তোমায়, কিন্তু একটা কথা—

বলুন।

এই রোজগারে তুমি দেনা শোধ করে বাঁচবেই বা কী করে? অন্য রোজগারের পথ দেখতে হবে।

অন্য রোজগার? কোথায়?

আমার একটা ম্যাসাজ পার্লার আছে, সেখানে তোমার মতো সুশ্রী মেয়েরা ভালোই রোজগার করে।

শুনে বুকের ভেতর দমচাপা হয়ে এল তোমার, গলা শুকিয়ে এল। ম্যাসাজ পার্লার? ম্যাসাজের নামে ওসব জায়গায় কী ঘটে জানো না এমন সরলমতি বালিকা নও তুমি। তোমায় নীরব দেখে উনি একটা চেক সই করে হাতে ধরিয়ে দিলেন, আচ্ছা, বাবা সেরে উঠুন, তারপর দেখা যাবে, তোমার আপত্তি থাকলে জোর করার কোনো ব্যাপার নেই, তবে এসব নিয়ে বাড়ির কাউকে কিছু বলতে যেয়ো না।

চেকটা হাতে নিয়ে চলে এলে। বাড়িতেও কাউকে কিছু বললে না। কী হবে অকারণ উদ্বেগ বাড়িয়ে?

কিন্তু টাকার অভাব, নুন আনতে পান্তা কি ফোন রাখতে গ্যাস ফুরনো সংসারের জ্বালা বড় জ্বালা! টাকার প্রয়োজনেই আবার একদিন গিয়ে দাঁড়াতে হল ফণিবাবুর সামনে, তোমার অন্নদাতা, সরলা ট্রেডিং কোম্পানির মালিক ফণিবাবু।

ম্যাসাজ পার্লারে যেতেই হল তোমায়। খুব অস্বস্তি নিয়ে সপ্তাহে দুদিন ট্রেনিং শুরু হল তোমার। কীভাবে নানারকমের তেল হাতে চমৎকার ম্যাসাজ দিতে হয় কিছুদিনের মধ্যেই শিখে উঠলে তুমি। পার্লারে সত্যি সত্যিই ম্যাসাজ ছাড়া আর কোনো ব্যবসা চোখে পড়ল না তোমার। মহিলারা পুরুষদের ম্যাসাজ করেন, এটুকুই, আর কিছু নয়। বাড়িতে বলা বারণ ছিল, তুমিও বললে না কিছু। তারপর একদিন, কাজ শেখার পর, পার্লারের ট্রেনার, মিস নিশা, এ নামেই তাকে ডাকে সবাই, তোমায় আলাদা করে ডেকে নিলেন। তাঁর কথাতেই জানলে তুমি এক অজানা জগতের কথা। সব শুনে ঘেন্নায় 'না' বলে চলে এলে তুমি। ফণিবাবু ডেকে পাওনা টাকার তাগাদা করলেন, তারপর স্নেহভরে বোঝালেন তোমায়, কেউ কিছু জানবে না, কয়েক বছরে অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে, তারপর সব ছেড়ে না হয় বিয়ের পিঁড়িতে বসবে।

কী সতর্ক নিখুঁত নেটওয়ার্ক এদের ব্যবসার, পুলিশের সাধ্য নেই হদিশ পায়। কয়েকজন এজেন্ট আছে, তাদের হাতে মোবাইল ফোন। কাগজে ফোন নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়—ম্যাসাজ নিতে চাইলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন।

খদ্দের যোগাযোগ করলে জানতে চাওয়া হয় তিনি কীরকম ম্যাসাজ চাইছেন। তিনরকমের ম্যাসাজ, তিনরকমের দর। সাধারণ ম্যাসাজ, সেক্স ম্যাসাজ বা রমণ, আর আছে এ দুয়ের মাঝামাঝি আধা সেক্স ম্যাসাজ। খদ্দেরের চাহিদা জেনে নিয়ে কয়েকদিন পর তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় তিনি সেই পরিষেবা পাবেন কবে, কোথায়, কখন। আর দেওয়া হয় একটি কোড নম্বর। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে গিয়ে ওই কোড নম্বর না জানালে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কলকাতার নানা প্রান্তে চলছে এই ব্যবসা। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় নয়। মাসে দুদিন দুঘণ্টা করে দুপুরবেলায় কখনো সল্টলেকের একটি ফ্ল্যাটে, কখনো

বাগুইআটি, কখনো বা বেহালা, যাদবপুর—এরকম নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ব্যবসা কেন্দ্র। একসঙ্গে একজায়গায় একটি নারী ও একটি পুরুষের বেশি থাকবার অনুমতি নেই। ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে কোনো সন্দেহ দেখা দেবে না, গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমনকী কোনো সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এসে পড়লে গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী বলবেন, ওরা দুজন তাদের পরিচিত, বেড়াতে এসেছেন।

শেষপর্যন্ত রাজি হতে হল তোমায়। অভাব, দারিদ্র্য বড়ো বালাই, যে এর ছোবলের মুখে পড়েছে জানে সে। তবে ওই পুরোপুরি রমণকর্মে সায় ছিল না তোমার। আধা সেক্স ম্যাসাজ নামক ব্যভিচারেই নাম লেখালে তুমি। ব্যভিচার? ব্যবসার অংশীদাররা অবশ্য এটাকে ব্যভিচার বলতে নারাজ। তাদের মতে এও একধরনের কাজ, পরিষেবা, অতৃপ্ত মানুষকে তৃপ্তি দেওয়া। তোমায় বারবার বলা হল, সস্তা সেন্টিমেন্ট, বোকা বোকা সতীপনা ঝেড়ে ফেলতে। বলা হল, বি প্রফেশনাল! কাজ করবে পারিশ্রমিক পাবে, নো সেন্টিমেন্ট! বোঝানো হল, আজ যখন তুমি পরিবার সহ ধুঁকে মরতে বসেছ, পুণ্যবান কোনো ব্যক্তি তো তোমায় বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি, তোমার সমাজ রাষ্ট্র তোমার সামনে ভালোভাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকার মতো পথ দেখাতে পারেনি, তা হলে? বাঁচলে তবে তো সতীপনা, তবে তো ন্যায় অন্যায়!

আরও বলা হল, তুমি যথেষ্ট আধুনিক নও, পৃথিবী বদলে যাচ্ছে অথচ তুমি পুরনো পচা চিন্তাভাবনা আঁকড়ে বসে রয়েছ, পৃথিবী পালটাচ্ছে, পালটাচ্ছে কলকাতা অথচ তুমি অন্ধ হয়ে আছ। তুমি জানলে তোমার মতো অভাবে পড়ে নয়, স্রেফ বেশি বেশি অর্থ উপার্জনের কারণে মধ্যবিত্ত তো বটেই, উচ্চবিত্ত ঘরের মহিলারাও অনেকেই নেমে পড়েছে এ ব্যবসায়। এরকম কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল তোমায়। তারা তোমাকে তোমার দ্বিধা, সংশয়, বস্তাপচা সংস্কার ইত্যাদির জন্যে খুব গালাগাল করল।

পুনম নামে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ওটা হয়তো তার আসল নাম নয়, এখানে কেউ তার আসল নাম জানায় না, তোমাকেও একটা নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল, শর্বরী হয়ে গেলে জুহি। পুনম বিবাহিতা, ওর বর ব্যাঙ্কের অফিসার, পৈতৃক বাড়ি আছে, দুটি ছেলেমেয়ে কলকাতার নামী স্কুলে পড়াশোনা করে। সুন্দর সংসার, ভালোভাবে স্বচ্ছলভাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকার মতো অর্থের কোনো অভাব নেই, তবু আরও অর্থের সন্ধানে সেও এ ব্যবসায়, ব্যবসা বলব নাকি এ লাইনে যেভাবে বলা হয়—ধান্দা, সেই ধান্দায় নেমে পড়েছে। পুনম একদিন হাসতে হাসতে বলল, সেলস্ গার্ল, তা অন্যের মাল বেচবে কেন? বেচতেই যদি হয়, নিজের মাল বেচো, রোজগার অনেক বেশি! তুমি এক অন্য জগতের মধ্যে ঢুকে পড়লে। প্রথম প্রথম যে ঘেন্না ভয় ছিল সেসব যেন কমে যেতে লাগল, ক্রমেই এ জগতটাকে আগের মতো অন্ধকারময় অস্বাভাবিক মনে হয় না তোমার। তুমি দেখলে পুনমের মতো শিক্ষিত, মাস্টার ডিগ্রি পাওয়া অনেক মহিলাই স্বেচ্ছায় বেশি

রোজগারের জন্য কোনো দ্বিধা সংকোচ বিবেক-তাড়না না রেখে এ পেশায় দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে, সমাজে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশে আছে, সংসার করছে, কোনো অসুবিধা নেই।

কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়ল তোমার। তোমাদের ক্লাসে, বা উপরে নীচের ইয়ারে কয়েকজন মেয়েকে দেখতে প্রচুর পয়সা ওড়াত, দামি পোশাক, দামি প্রসাধন, রেস্টুরেন্টে দেদার খরচ করে তারা, মাঝে মাঝে পাঁচতারা হোটেলে হুল্লোড় করতে যায়। তুমি ভাবতে, এরা বুঝি খুব ধনীঘরের মেয়ে, পরে জানলে অন্যরকম, বিশ্বাস করোনি, ভেবেছ ওসব গল্প, হিংসায় জ্বলেমরা নিন্দুকদের রটনা। তবে এড়িয়ে থেকেছ ওদের।

তোমার চেনা কলকাতার ভেতর যে আরেকটা কলকাতা আছে, যে কলকাতা ক্রমশ গিলে ফেলছে তোমার চেনা কলকাতাকে, ক্রমেই টের পেতে শুরু করলে তুমি।

তোমার ষোলো বছর বয়সে এক পুরুষ বন্ধু পেয়েছিলে। এ পর্যন্ত সেই একমাত্র ঘনিষ্ঠ পুরুষবন্ধু তোমার, যার হাত ধরেছিলে, প্রথম চুম্বন আর আলিঙ্গনের অভিজ্ঞতা তার সঙ্গেই। বছর সাত-আটের বড়ো ছিল। ভালোবাসা ঘন হয়ে উঠতেই সাগর সাগরপারে চলে গেল, সম্পর্কের ওখানেই ইতি। এরপর আরও দু-একজনের কাছ থেকে ঘনিষ্ঠতার প্রস্তাব এলেও আমল দাওনি তুমি। কেননা সেই প্রথম প্রেমের ব্যর্থতা বিষণ্ণতা অনেক কষ্টে সামলাতে হয়েছিল তোমায়। সাগর অবশ্য বলেছিল, ইটস্ এ ফান্ শর্বরী, ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি! কিন্তু তুমি তো তুমিই, তাই ওভাবে ভাবতে পারোনি। সাগর যখন সুন্দর ভাষায় প্রেম জানাত তোমায়, তা যে নিছক মজা, ফান্, তা ভাবতে পারোনি তুমি। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছ এই ভেবে, ব্যাপারটা আরো অনেক গভীরে যাওয়ার আগেই 'মজা' টের পেয়েছ তুমি।

মিস নিশা, পুনম, ফণিবাবুদের সঙ্গে মিশতে মিশতে তোমার মনে হত এতদিন তুমি যেন এক ভুল পৃথিবীতে, ভুল স্বর্গে বাস করে এসেছ। বাবা, মা, ছোট বোনকে নিয়ে দিব্যি হাসিখুশি বয়ে যাওয়া সংসারটায় হঠাৎ যেন বছর দু-তিন এক ভয়ংকর ঝড় নেমে এসেছে। তোমার ঘরের বাইরে নোংরা জল ছিল তুমি জানতে, মেয়ে হিসেবেই স্কুলে-কলেজে বাইরের জগতে পা রেখেই তুমি শিখে নিয়েছিলে চারপাশে লোভী পোকা কিলবিল করছে, তোমার মা-ই তোমায় শিখিয়েছিলেন আত্মরক্ষার নানা উপায়, কী করে ভিড় বাসে ব্যাগ এগিয়ে ধরতে হবে বুকের কাছে কিংবা পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা মিশতে মিশতেই কীভাবে কোথায় থামতে হবে। কিন্তু সরলা ট্রেডিং কোম্পানির দৌলতে জানলে যাকে তুমি নোংরা জল ভেবে এসেছ আদতে তা নাকি নোংরা নয়! নারী-পুরুষ সম্পর্কে নাকি নোংরা বলে কিছু হয় না। যৌনসম্পর্কে আবেগের কোনো স্থান নেই, তা কেবল এক পরিষেবা! ভালোবাসা শিশুর খেলনা কিংবা জাদুঘরের প্রত্নসামগ্রী! শরীর, শুধু শরীর, আর বেচাকেনা। পৃথিবী নামক গ্রহটি এখন কেবল এক বিশাল বাজার। বাজার, শুধুই বাজার, আর কিছু নয়। শিবঠাকুর জানতে তুমি, জানতে কৃষ্ণ কিংবা রাম। জানলে বাজার দেবতার কথা। যে দেবতা ক্রমেই

ফুলে ফেঁপে উঠছেন, জগৎজুড়ে উচ্চস্বরে আবাহন জানায় তাকে অগণিত মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ। বাজারদেবতার গ্রাস থেকে মুক্তি নেই কারও। নারীমাংস তো সুস্বাদু খুবই, বাজার দেবতা ভারি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নারীশরীরের বিকিকিনি।

তবু তুমি তো তুমিই, তুমি শর্বরী। জুহি নামেও তুমি বাজারে নামতে পারো না, পুরোপুরি। আধা-সেক্স ম্যাসাজে রাজি হয়ে ভিরু পায়ে পৌঁছলে তুমি বাগুইআটির এক ফ্ল্যাটে। এক ঘণ্টার কাজ। খদ্দের দেবে সাড়ে সাতশো টাকা। তিন ভাগে ভাগ হবে। আড়াইশো টাকা পাবে তোমার কোম্পানি, আড়াইশো টাকা ফ্ল্যাটমালিক আর বাকিটা তুমি।

বেল টিপলে। দরজা ফাঁক করে এক মাঝবয়েসি মহিলা, কাকে চাই?

খদ্দেরদের মতো তোমাদেরও কোড নম্বর আছে। তুমি বললে, এটা কি থারটিন বি?

দরজা খুলে গেল। দুপুর আড়াইটে তখন। আধঘণ্টা আগেই এসেছ। তিনটে থেকে চারটে তোমার খদ্দেরের সময়। মহিলাটি হাসিমুখে ঘরে গিয়ে বসালেন তোমায়। জড়োসড়ো হয়ে বসলে তুমি। দরদর করে ঘামছ।

এই প্রথম? হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন মহিলাটি।

তুমি ঘাড় নাড়লে।

ভয় করছে? ভয়ের কিছু নেই, আমি আছি। তাছাড়া তোমাকে তো আর পুরোপুরি— একটু জড়াজড়ি, কিস-টিস, ব্যস! প্রথমদের জন্যে পুরোনো অভিজ্ঞ খদ্দেরদেরই পাঠানো হয়।

হাতঘড়ির দিকে তাকাও তুমি—দুটো পঁয়ত্রিশ। গলা শুকিয়ে আসে। একবার ভাব, চলে যাবে।

বিয়ার খাবে?

ঘাড় নেড়ে তুমি না বল।

লাইনে যখন নেমেছ, আস্তে আস্তে রপ্ত করতে হবে এসব।

এক গ্লাস জল।

জল? কোল্ড ড্রিংক্স দিই।

না, শুধু জল।

সুদৃশ্য কাচের গ্লাসে জল আসে। একবারে ঢকঢক করে জল পান করো তুমি। তোমাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যায় সেই মহিলা। একটি সিঙ্গল খাট, ভাঁজ করে রাখা দুটি পরিষ্কার তোয়ালে। ঘর জুড়ে মিষ্টি গন্ধ। টেবিলে রাখা ম্যাসাজ-অয়েলের শিশি।

তোমার অস্বস্তি কাটাতে মহিলা গল্প শুরু করেন। ওর স্বামী একটি ওষুধের দোকানের কর্মচারী। অল্প মাইনে। পরিচিত একজনের মারফত প্রস্তাব এল, মাসে দু-তিনদিন এক-দুঘণ্টার জন্য দুপুরবেলায় এই কাজে ভাড়া দিতে হবে। মাস গেলে প্রায় হাজার টাকা আয়। একঘণ্টায় আড়াইশো, দুঘণ্টায় পাঁচশো। প্রথমে রাজি হননি। পরে ভেবে দেখেছেন সহজ পথে আয় বাড়ানোর এমন সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। দুপুরবেলা বাড়ি ফাঁকাই থাকে। মেয়ে স্কুলে যায়। যেভাবে পুরো কাজটা হয়, তাতে ঝুঁকিও কিছু নেই। গত ছমাস

যাবৎ চলছে। এখন মাসে দুদিনের বদলে চারদিন, সপ্তাহে একদিন করে। মাস গেলে দেড়হাজার টাকা আসে।

দুটো পঞ্চান্ন, বেল বাজল, কোডনম্বর শুনে মহিলাটি ভেতরে নিয়ে এলেন এক মাঝবয়েসি লোককে। দেখে মনে হল কলপ করে খুব ফিটফাট থাকলেও পঞ্চাশের বেশিই হবে বয়েস। তোমার শরীর কাঁপছিল তাকে দেখে। তবে তিনি অভিজ্ঞ লোক। খুব সুন্দর কথাবার্তা। নানা গল্প করতে করতে কেমন সহজ করে ফেললেন তোমায়। তোমার মনে হল যেন শুধু ম্যাসাজ করে দিতে হবে আর কিছু নয়।

সেই শুরু। তারপর মাসে চার-পাঁচ-ছয়টা করে কেস হল তোমার। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে। সবাই জানে তুমি মার্কেট রিসার্চ কর, বিভিন্ন মালের অ্যাড করো, তুমি এক ফেরিওয়ালি। ভাবতে ভাবতে হাসো তুমি, হ্যাঁ ফেরিওয়ালি, তবে সে ফেরি করে বেড়ায় নিজেকেই।

কিন্তু চাপ আসতে লাগল। ওই আধা কারবার থেকে পুরোপুরি শরীর দেওয়ার ব্যবসায় নামতে হবে। রোজগার অনেক বেশি। এর প্রায় চার-পাঁচগুণ।

কিছুতেই রাজি নও তুমি। এরমধ্যেই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। আধা কারবারে উত্তেজিত হয়ে গিয়ে এক খদ্দের পুরোপুরি চাইল তোমায়। মনিব্যাগ থেকে কড়কড়ে নোট বের করে দিল। তুমি রেগে গেলে, বললে নিয়ম ভাঙবেন না, ওসব কাজের জন্যে অন্য মেয়ে আছে।

লোভে চোখদুটো চকচক করেছিল তার, বলল, মানি না নিয়ম। তুমি চেনো আমায়? তোমার মতো মেয়েকে ইচ্ছে করলে আমি তুলে নিয়ে গিয়ে—

তুমি খুব ভয় পেয়ে গেলে। চেঁচিয়ে উঠলে। দৌড়ে এল বাড়ির মালকিন, এক মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু ধমক দিল,কী হল? এ ওসব কাজ করে না, আপনাকে বলেনি এজেন্ট।

লোভী চোখদুটো জ্বলে উঠল, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, লাইনে কতদিন? এখনো এত সতীপনা কেন?

মালকিনের চেষ্টায় সে যাত্রায় রেহাই পেলে তুমি। কিন্তু ভয় ধরে গেল। কাজে যাওয়া বন্ধ করলে। বাড়ির সবাই বলে কী হল? তুমি খুলে বলতে পারো না, এটা সেটা বলে এড়িয়ে যাও। ফণিবাবু ফোন করলেন। বাড়ির সবাই তোমায় দোষ দেয়, বলে এত ভালো চাকরি, কী হল তোর?

শুধু মা একবার বললেন, সত্যি করে বল তো, কী ব্যাপার? বলতে গিয়েও পার না তুমি, এদের না জানিয়ে যে পথে এতদূর এগিয়ে গেছ তুমি, শুনলে হয়তো মা আত্মহত্যাই করবেন।

কী করবে তুমি? কাজে না বেরুলে খাবে কী? তুমি বন্ধু-বান্ধব, এদিক ওদিক খোঁজ নিলে যদি অন্য কোনো কাজ পাওয়া যায়। আশা দিল না কেউ।

দিন দশ পরে সেই সরলা ট্রেডিংয়ের অফিসেই যেতে হল আবার। ফণিবাবুর এবার অন্যমূর্তি। থমথমে মুখ। বললেন, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না, সতীপনা এক মুহূর্তে ঘুচিয়ে দিতে পারি।

একটা খাম এগিয়ে দিলেন তোমার হাতে। খাম খুলে চমকে উঠলে তুমি। খদ্দেরদের সঙ্গে তোমার ছবি, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। গোপন ক্যামেরায় কখন তোলা হয়েছে এসব?

রাগে ফেটে পড়তে চাইলে তুমি। পারলে না, অসহায়ের মতো যেন এক খাঁচায় বন্দি হয়ে গেছ তুমি। বিশ্বজোড়া পাতা বাজারদেবতার ফাঁদে কীভাবে যেন ধরা পড়ে গেছ। পণ্য পছন্দ হয়েছে ক্রেতার, বাজারে তার ক্রমাগত জোগান ছাড়া তৃপ্তি নেই বাজারদেবতার।

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে আবার কাজে ফিরে যেতে হল তোমায়। সপ্তাহে একদিন করে আবার সেই সল্টলেক কি টালিগঞ্জের নানা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল এক ফেরিওয়ালি। এখন জল থেকে ডাঙায় তোলা হয়েছে তোমার লাশ। লোকে লোকারণ্য চারধার। কত গভীর গবেষণা তোমায় নিয়ে। কে? কেমন মেয়ে? ভালো না নষ্ট? বিবাহিতা না কুমারী? মরার আগে ধর্ষিতা হয়েছে না হয়নি? এ অঞ্চলে কোন কোন মেয়ে নিখোঁজ হযেছে সম্প্রতি, তাদের কারো সঙ্গে কোনো মিল আছে কি নেই? কত প্রশ্ন, মন্তব্য, গবেষণা।

তুমি উত্তর দিতে পার না। মুদ্দাফরাশরা সন্তর্পণে বস্তাবন্দি করছে তোমায়, তাদের মুখে উগ্র মদের গন্ধের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেছে লাশপচা গন্ধ।

ফেরিওয়ালি, তুমি তো বুঝতে পারোনি বাজারে নামলে আর থামা যায় না। থামা না-থামা, কতদূর যাবে তুমি তার কোনো নিমন্ত্রণ আর থাকে না তোমার হাতে।

তাই এক কালদুপুরে, সেই লোকটিকে দেখে, যে একবার তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তোমায়, তুমি যখন কাজ করতে রাজি হলে না, ভয় পেলে, ঘেন্না হল, মনে হল তুমি স্বাধীন, কারো সঙ্গে কাজ না করার স্বাধীনতাও তোমার আছে, তখন বড়ো বিপদ হয়ে গেল।

লোকটি রিভলবারের নলের সামনে বাড়ির মালকিনকে চুপ করিয়ে রাখল। তারপর তোমার জোর করে মুখে বেঁধে...অসহায় তুমি প্রতিরোধ করতে চেয়েও পারলে না, কারণ সেদিন তারা পরিকল্পনা করেই এসেছিল, লোকটির সঙ্গে আরও দুজন। ওরা তিনজন তোমায় জোর করে সম্ভোগ করল।

তুমি শেষপর্যন্ত একবার পণ্য থেকে মানবী হয়ে উঠতে চেয়ে হুমকি দিলে, অচৈতন্য হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে তুমি বলেছিলে, আমি পুলিশের কাছে যাব...।

ফেরিওয়ালি, পৃথিবী এক গ্রাম এখন। গ্রাম জুড়ে আগুন। আগুন মাটি ও জলে। আগুন প্রেমে ও কবিতায়। আগুনের ভেতর ডলারসংগীত। থাইল্যান্ড ফিলিপাইন ভারত, ম্যানিলা মুম্বাই কলকাতা, সব একাকার। ভোগ বিনা গীত নেই, বাজার বিনা গতি নেই, হোটেল রিসর্ট বার সেক্স ট্যুরিজম—টিনা, টি আই এন এ, দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ!

তুমি বড়ো বোকা ফেরিওয়ালি। কলকাতার এক প্রান্তে জীর্ণ এক ফ্ল্যাটে শুধু তিনটি মানুষের চোখের পাতা ভিজে উঠছে বারবার উদ্বেগে সংশয়ে, তারা এখনো জানে না তুমি লাশ হয়ে...

অনন্ত শীত আর ঘুমের ভেতর তুমি কি নড়ে উঠলে একটু? আগুন ও ছাই, তবু ছাই সরিয়ে সরিয়ে অনেক দূরের কোনো ভোরে অন্য আগুন দেখতে পাও কি তুমি?

স্বপ্নে নদীর খোঁজ

নদীর নাম?

জানি না। স্বপ্নের ভেতর দু'পায়ে তপ্ত বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি খুঁজে ফিরতাম শান্ত, পটে-আঁকা ছবির মতো সরু আঁকাবাঁকা পথে তিরতির বয়ে চলা ছোটো নদীটাকে।

ছোটো নদী। অথই জল নেই। দুরন্ত ঢেউ নেই। ঘূর্ণি নেই। নেই স্টিমার কিংবা পালতোলা নৌকার ভেসে চলা। হ্যাঁ, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল।

মনে হয়, সে আমার কতকালের চেনা, অথচ শৈশব কৈশোর থেকে জীবনের কোনো পর্বেই আমার নদীর পাড়ে বসত নয়। নাকি ভুল করছি? শৈশবে কি ওরকমই এক নদীর পাড়ে বাস ছিল আমার? সব কীরকম যেন গোলমাল হয়ে যায়!

স্বপ্নে, হ্যাঁ, স্বপ্নে পাগলের মতো নদী খুঁজে ফিরতাম—সেভাবে ঘুম আসে না আজকাল, যদিও বা আসে অনেক রাত গড়িয়ে—খুঁজতাম হারিয়ে-ফেলা ছোটো নদী, কবে ছিল সেই নদী, কোথায় ছিল, কবে কীভাবে হারিয়ে ফেললাম, বুঝে উঠতে পারি না, শুধু একটা অসহ্য কষ্টে ঘুম ভেঙে চলে আসতাম ঘুম আর না-ঘুমের এক মাঝামাঝি অবস্থায়।

আমার হাতে এখন অফুরন্ত সময়। তুমি বোধহয় জানো, গত কয়েকমাস ধরে আমি বেতনহীন চাকুরে। কাজ নেই অফিসে অথচ ছাঁটাই হয়েছি এমনও নয়। মুম্বাইতে আমাদের হেড অফিস, আচমকা নির্দেশ এসেছিল সেখানে থেকে, কোম্পানির কলকাতা অফিস বন্ধ করে দেওয়া হল। আপাতত কর্মচারীদের বেতন বন্ধ থাকবে, চেষ্টা করা হবে দেশের অন্য অফিসগুলোয় কর্মচারীদের একাংশকে নাকি ঢুকিয়ে নেওয়ার, বাকিরা? কী আর? এককালীন কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা! তারপর থেকে অফিস গেটের সামনে মাদুর পেতে পালা করে আমাদের অবস্থান চলছে। স্লোগান, বক্তৃতা, মাঝে মাঝে অবস্থান থেকে সরে এসে দু'-চারজনের ইতস্তত জটলায় নানারকম গুজবচর্চা, নতুন চাকরি কিংবা ব্যবসার খবরের আদান-প্রদান। কয়েকবছর ধরে লাভের পরিমাণ কমে আসছিল কোম্পানির, তবে লোকসানে চলছিল এমন নয়, আসলে এত কমপিটিশন মার্কেটে! তা, স্বপ্নে নদী খুঁজে বেড়াতাম, যেন কতকালের চেনা এক নদী, সে কি শৈশবের? অথচ সেই শৈশবে যেখানে থাকতাম, সেখানে নদী কই? একটা খাল ছিল। প্রথম নদী দেখেছিলাম—সে বোধহয় শুঁটি, বারাসাত বাদুতে গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে, না বোধহয় গঙ্গা, হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে বাসে যেতে যেতে বাবা বললেন, এই দ্যাখ, মা গঙ্গা, প্রণাম কর।

সব কীরকম গোলমাল হয়ে যায়, ছায়া ছায়া, কোনটা স্বপ্ন, কোনটা বাস্তব বুঝে উঠতে পারি না। খুব বুড়ো হয়ে গেলে নাকি এরকম হয়, এই বয়সেই আমি কি এত বুড়ো হয়ে গেলাম, পঁয়তাল্লিশ কি বুড়ো হওয়ার বয়েস?

এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আমার নদী খোঁজার স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনাতে বসেছি, এও

কি স্বপ্ন? কে জানে!

জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। অফিসে পি এফ থেকেও টাকা তুলতে দিচ্ছে না। শুনছি সামনের মাসেই কোয়ার্টারও নাকি ছেড়ে দিতে হবে। না ছাড়লেও, জল আলোর সব লাইন কেটে দেবে।

ওদিকে বৈশাখী চাকরি খুঁজতে গিয়ে—সে এক কাণ্ড! ওর সঙ্গে প্রথম থেকেই বনিবনা ছিল না তেমন, তবু বিয়ের পর তা পনেরো বছর তো কেটে গেল, দুই শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীর মতো এক ছাদের তলায় বসবাস করে যাচ্ছি, তেড়েফুঁড়ে ঝগড়াও করিনি আবার বিস্তর ভাব-ভালোবাসাও হয়নি। আসলে সবার সঙ্গে সবার তো মেলে না, ও হইহুল্লোড় লোকজন পছন্দ করে আর আমি নিরিবিলি থাকতে চাই, মনে হয়, চারপাশে লোক কই, লোক নয় পোক! আমি থিয়েটার ভালোবাসি, হ্যাঁ, গ্রুপ থিয়েটার, ও ব লে ওসব নাকি বিজ্ঞদের জন্যে, ওর মতো সাধারণের জন্যে নয়, ও ভালোবাসে পপুলার সিনেমা, সিরিয়াল। আমি ভেবেছিলাম ছেলেকে বাংলা স্কুলে পড়াব, ও প্রায় জোর করে ইংলিশ মিডিয়ামে ভরতি করল। থাক, আর তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই।

দিনকয়েক আগে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম। এখন অনেক রাত পর্যন্ত এদিক ওদিক এলোমেলো ঘুরে বেড়াই, নতুন করে চাকরি আর কে দেবে? তাই ব্যবসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিই, কোন ব্যবসায় নামলে অন্তত খাওয়া-পরাটুকু চলে যাবে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি। সন্ধে থেকেই শরীর খারাপ লাগছিল, প্রেশার চড়েছিল বোধহয়, আটটা নাগাদ ফিরে দেখি বৈশাখী বাড়ি নেই। ছেলেমেয়েরা কিছু বলতে পারল না। কোথায় গেল? এত রাত পর্যন্ত না বলেকয়ে যায় না তো কোথাও, নাকি যায়? এ কয়েকমাসে হয়তো পালটে গেছে অনেককিছু।

ন'টা নাগাদ ফিরল। মুখচোখ শুকনো, বিমর্ষ। কী ব্যাপার? ওর এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে কবে নাকি দেখা হয়েছিল, অনেক কানেকশন নাকি তার। জামাইবাবুর চাকরি আছে মাইনে নেই শুনে সে ভারী উতলা হয়ে উঠে নিজেই দিদির একটা ছোটোখাটো পার্টটাইম ফুলটাইম যা হোক চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। খবর পাঠিয়েছিল আজ, ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিল কর্মস্থলের, গিয়েছিল বৈশাখী, ভি আই পি রোডের ধারে কোন গেস্ট হাউসে কেয়ারটেকারের অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করতে হবে।

এ পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ পরে আমি মৃদু হেসে বললাম, তারপর?

বৈশাখী জানাল, গেস্ট-হাউসের গেস্ট আর পরিবেশ দেখে ওর গা গুলিয়ে উঠেছে, এ চাকরি ওর দ্বারা হবে না। ফেরার পথে বোনের বাড়ি গিয়ে ঘটনা জানাতেই বেজায় রাগ বোনের, বলেছে—তুই এমন ভাব করছিস যেন ওখানে তোকে গেস্টদের সঙ্গে শুতে বলেছে কেউ! ওখানে যা হয় হোক, তোর কাজ তো আলাদা, আমার কানেকশনে যখন গেছিস, তুই নিজে না চাইলে কেউ তোকে টাচ করবে না।

প্রায় এক নিশ্বাসে গড়গড় করে কথাগুলো জানিয়ে আবার চুপ মেরে গেল বৈশাখী। বুঝলাম, জীবনে প্রথম চাকরি খোঁজার অভিজ্ঞতায় মনে একটা বড়োসড়ো ধাক্কা খেয়েছে বেচারি, না হলে আমার সঙ্গে এত কথা বলত না।

আর তখন, আমার ভেতরের স্বামী নামক প্রভুপুরুষটি কেন জানি না রাগে অভিমানে ফুলে উঠতে চাইছিল। সাধারণভাবে আমি খুব কড়া ধাতের মানুষ নই, কাউকে রেগে চেঁচিয়ে কড়া কথা বলতে পারি না। কাউকে খুব স্পষ্ট কথা বলতে কষ্ট হয়, ঝগড়া করলেও গলার স্বর খুব চড়ে না আমার। বরং রাগ হলে চুপ করে যাই। অথচ সে রাতে কী যে হল, গলা চড়িয়ে বললাম, চাকরি খুঁজতে যেখানে সেখানে চলে গেলে? আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করলে না?

জীবনের স্বাভাবিক ছন্দগুলো টলে গেলে এরকমই হয় বোধহয়। মানুষ তার স্বভাবও হারিয়ে ফেলে। বৈশাখী অবাক হয়ে দেখছিল আমায়, উত্তর দেয়নি, আমিও কী যে বলতে লাগলাম—আমি কি মরে গেছি? খাওয়া-পরা জুটছে না তোমার? নাকি আমি চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বাড়ি বসে আছি? দিনরাত নতুন কী আয়ের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছি, দেখতে পাও না?

অদ্ভুত ব্যাপার, বৈশাখীও তার স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে নীরব ছিল, চেঁচাল না, কাঁদল না, ধুপধুপ করে পা ফেলে রান্নাঘরেও চলে গেল না। জীবনের অসময়ে বোধহয় এরকমই হয়, না?

ইতিহাসের অসময়? কী জানি বাবা, ইতিহাস-টিতিহাসের মতো অত ভারী শব্দ উচ্চারণে কেমন যেন জোর পাই না, তবে অফিস গেটের সামনে অবস্থানে দু'-একজন বড়োসড়ো নেতার মুখে ওই ইতিহাস শব্দটা এখনও শুনি বটে, খুব জোর দিয়ে বলা হয়—শ্রমিকশ্রেণিই নতুন ইতিহাস রচনা করবে!

আচ্ছা, আমার মতো একজন দক্ষ কেরানিকে কি ঠিক শ্রমিক বলা যায়? নিজেকে ঠিক শ্রমিক ভাবতে মন চায় না, বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্তও মাসে হাজার দশ টাকা মোট মাইনে ছিল—আসলে শ্রমিক বললেই কেন জানি না আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ময়লা জামাকাপড়-পরা তেলকালি-মাখা শিক্ষাদীক্ষাহীন গতর খাটিয়ে বেঁচে থাকা খুব গরিব মানুষ, যারা বউ পেটায় মদ খেয়ে—দেখো, মজাটা দেখো, নিজেকে এরকম মজুর ভাবতে অস্বস্তি হয়, অথচ দেশের যা হালচাল দেখছি, দু'-এক জেনারেশন পরে আমার গতি হয়তো এর থেকেও খারাপ অবস্থা—

যাক গে, তা, কী যেন—স্বপ্নের ভেতর নদী খুঁজতে খুঁজতে এত অসহায় মনে হয়, গরম বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে হাঁফিয়ে উঠি, চিৎকার করি, কখনও এক-একটা নদীর মুখোমুখি হই, কিন্তু সে আমার সেই ছোটো নদী নয়।

সেইসব নদীর মুখোমুখি হলেই আমার বড়ো ভয় করে, মনে হয় বুকের ওপর কে যেন

ইঁট চাপা দিতে চাইছে, কখনও আমার ঠাকুমাকে মনে পড়ে, মৃত্যুর কয়েকমাস আগে ঠাকুমা'র চুল উঠে গিয়েছিল, ঘা-পুঁজ-চামড়া জড়ানো একখানা কঙ্কাল বিছানায় শুয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করত। অসাড়ে পেচ্ছাপ-পায়খানায় ভাসিয়ে দিত বিছানা। কখনও মনে পড়ে আমার বাবার সেই পিসির কথা। দেশের বাড়িতে থাকত, কোনোদিন দেখিনি তাকে, গল্প শুনেছি মায়ের কাছে, পাগলি বিধবা সেই পিসিকে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা হত, একদিন কীভাবে যেন চাইন খুলে বেরিয়ে এসে সারা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল—

সেইসব নদীর বিলাপ, গর্জন, আমি সহ্য করতে পারি না। আমি পালিয়ে যেতে চাই অথচ বালির মধ্যে কে যেন আমায় শক্ত করে টেনে ধরে রাখে, আমার পা অসাড় হয়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে নদীরা বলে, এ পৃথিবীতে কি আর আমাদের বাঁচতে দেবে না তোমরা? আমাদের দু'পাশে একটু জমিও থাকতে দেবে না? আমাদের মেরে বাঁচবে? বাঁচতে পারবে তোমরা?

কোনোক্রমে ছুটে পালিয়ে আসি, ঘুম ভেঙে যায়। কোনো কোনোদিন নির্মলদাকে দেখতে পাই। আমার মাথার কাছে এসে যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

নির্মল সেন, জীবন ও চাকরির বয়েসে আমার থেকে সাত-আট বছরের বড়ো সহকর্মী। কত জানতেন, পড়তেন, হাঁ করে শুনতাম তাঁর কথা। ভারী চমৎকার ছবি আঁকতেন। মাসে মাসে রিক্রিয়েশন ক্লাব কিংবা ইউনিয়নের এক একটা পোস্টার এমন সুন্দর অলংকরণ করতেন, যেন এক শিল্পকর্ম। ইছামতীর পাড়ে তাঁর ছোটবেলা কেটেছিল, মাঝবেলা কংক্রিটের জঙ্গলে, শেষবেলা গঙ্গার ধারে। মারা গেছেন বছর দুই। মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে নদী বিষয়ক কয়েকটা ছবি এঁকেছিলেন পরপর, জলরঙে আঁকা সে সব নদী দেখে আমার গা ছমছম করে উঠত—কখনও নদীর সর্বাঙ্গে সাপের চেরা জিভ লকলকিয়ে উঠছে, কখনও বা নদী যেন এক রুগ্‌ণ বিপর্যস্ত সব-খোয়ানো নারী।

আমি একবার বললাম, একী, এ আবার কেমন নদী?

কেন? কান্না পাচ্ছে?

না, ভয় করছে।

হয়তো কেউ কাঁদবে, সেজন্যেই ছবিগুলো আঁকা। নদীর কান্না দেখে কেউ কাঁদবে, কেউ ভয় পাবে, আবার কেউ বা ...

নির্মলদার কাছেই শুনতাম ইছামতীর এখনকার অবস্থা—ইটভাটা, মেছোঘেরি কীভাবে জবরদখল করেছে নদীকে, এমনকী কোথাও নদীখাতে চাষও হচ্ছে! কীভাবে নদীতে জমছে নানা বিষ সেসব বলতে বলতে নির্মলদার দু'চোখ চিকচিক করে উঠত, আমি অবাক হতাম, নদীর জন্যে চোখ ভিজে যায় এমন মানুষও আছে?

জানো, আমার এখন মনে হয় প্রত্যেক মানুষের বুকের ভেতর একটা নদী থাকে, কেউ তা জানতে পারে, কেউ সারাজীবন ধরেও জানতে পারে না। নির্মলটা বোধহয় আমার

ভেতরের সেই ঘুমন্ত নদীর কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি কি তাই স্বপ্নের ভেতর আমার নদীটাকে খুঁজে চলেছি?

আচ্ছা, শিশুর প্রাণেই কি নদী সবচেয়ে বেশি বেঁচে থাকে? নির্মলদাকে তাঁর শেষজীবনের গঙ্গার কথা সেভাবে বলতে শুনতাম না, বেড়াতে বেরিয়েও তো জীবনে কত নদী দেখেছেন, কিন্তু নদী বলতেই তাঁর মুখে ইছামতীর নাম।

মাসকয়েক আগে, শেষরাতে স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠতেই কী মনে হল, মাথায় চাপল শৈশবের পাড়ায় যেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া, রাস্তায় বাস অটো নেই, হাঁটতে হাঁটতেই স্টেশন, ট্রেন ধরে চলে এলাম।

নিউবারাকপুরের এ পাড়াটায় আমরা সেই ছোটো থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত ভাড়া থেকেছি। কত বছর আসিনি এদিকে। তা প্রায় বছর কুড়ি তো হবেই। ট্রেনে বসে ভাবছিলাম— পাড়াটা কীরকম দেখব কে জানে? সেই খালধারের জঙ্গল, খালধারের নাকি নদী পাড়ের? খেলার মাঠ, পাড়াময় আম-কাঁঠাল-পেয়ারা-লেবুর গাছগাছালি, লাউয়ের মাচা, কলাবাগান, বাঁশবাগান, রেললাইনধারের বিরাট বটগাছ—আছে কি আর সে সব? থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক। অথচ কী আশ্চর্য! ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পাড়ায় এসে দেখি, বদল হয়নি এতটুকু, যেদিন পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম ঠিক সেদিনটাই যেন থমকে আছে!

বালু আমার বাল্য-কৈশোরের সবসময়ের সঙ্গী ছিল, ওদের সেই একতলা বাড়ির দুটো ঘর, পাশে রান্নাঘর, সামনে লম্বা টানা টালিছাওয়া নিচু বারান্দা—সব অবিকল মিলে যাচ্ছে। ক্লাস এইটের বালু, বারান্দায় বসে অঙ্ক করছে, নীল রঙের হাফপ্যান্ট, ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি। মুখ তুলে বলল, আয়, বোস, ভালো হয়েছে এসেছিস, জ্যামিতিটা মাথায় ঢোকে না একদম, বুঝিয়ে দে তো।

বালু, তুই একইরকম আছিস, একটুও বাড়িসনি?

নতুন একটা লাট্টু পেয়েছি, পরে দেখাব।

কে দিল রে? মেসোমশাই?

বাবা দেবে লাট্টু? ফিক করে হেসে ফিসফিসিয়ে বলল, রতনকাকুর দোকান থেকে গেঁড়িয়ে দিয়েছি।

বালুরা চার ভাইবোন। বালুই সবার বড়ো। মেসোমশাইয়ের ব্লাউজের ছোটো দোকান বাজারে।

বালু ছিল বেজায় ডানপিটে। আর আমি চিরকাল মিটমিটে শয়তান। দুষ্টুবুদ্ধি জোগাতাম আমি, কাজ করত বালু, ফলে মার আর বদনাম দুটোই ওর কপালে জুটত।

একবার আমরা দু'-তিনটে গলির ছেলেমেয়েরা মিলে সরস্বতী পুজো করেছিলাম। এবাড়ি ওবাড়ি থেকে ছেঁড়া কাপড়, চট, ভাঙাচোরা তক্তপোশ বাঁশ কঞ্চি দিয়ে প্যান্ডেল। পালদাদু পাড়ার দুর্গাপ্রতিমা গড়তেন, তাঁর কাছে দলবেঁধে গিয়ে আবদার, সরস্বতী প্রতিমাটাও বিনা পয়সায়। তারপর বাজারে গিয়ে দশকর্মা ভাণ্ডার। তরিতরকারি বা ফলের দোকানে আমরা

চার-পাঁচজন মিলে দরাদরি করি, এ তরকারি সে তরকারি ধরি আর ইচ্ছে করে ফেলে দিই, দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করি, আর সেই ফাঁকে বালু এটাসেটা টপাটপ ভরে ফেলে ব্যাগে। তিনটে দোকানে অপারেশন সাকসেসফুল, কিন্তু ধরা পড়ে গেল চার নম্বরে। চড়-চাপড় জুটল ওর কপালে, আমরা খেলাম বকা, বাচ্চা বলে ওতেই রেহাই। কিন্তু কে যেন চিনতে পেরে সোজা বালুর কান ধরে নিয়ে গেল মেসোমশাইয়ের দোকানে, তারপর...।

সেবারই চাঁদা চাইতে গিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। ভব জেঠু ছিলেন শিক্ষক মানুষ, আমরা তাঁর উঠোনে পা দিতেই বললেন, কী ব্যাপার?

বালু বলল, সরস্বতী পুজোর চাঁদা।

চাঁদা? দেব, পুরো একটাকা দেব, কিন্তু সরস্বতী বানানটা লিখে দিতে হবে।

বালু আমাকে দেখিয়ে বলল, ও লিখবে।

জেঠু বললেন, না, তা হবে না, তোকে লিখতে হবে।

বালুর তখন মহাবিপদ। গুটিগুটি পায়ে ব্যাজার মুখে পিছিয়ে এল, চাঁদা আর নেওয়া হল না, বেরিয়ে বালু বলল, বাংলায় কেন যে শ, ষ স—তিনটে হল, একটা হলে ঝামেলা হত না।

হাঁটতে হাঁটতে আরেকটু এগিয়ে ঝিমলিদের বাড়ি। মনে পড়ল, আমাদের আরেক বন্ধু বাবুনি ঝিমলিকে প্রেমপত্র দিয়েছিল। তখন ঝিমলি ক্লাস সিক্সে আর বাবুনি দু'বার ফেল করে ক্লাস সেভেন। সে ছিল দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর দিন। আমার বুদ্ধিতে প্রেমপত্রের সঙ্গে বাবুনি একশিশি সেন্টও উপহার দিয়েছিল। আর ওই সেন্টর জন্যেই ঝিমলির মায়ের কাছে পুরো ব্যাপারটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেন্ট কেনাও এক মজার কাণ্ড! মহালয়ার ভোররাতে বাবুনিদের বাড়ি রেডিয়োতে মহিষাসুরমর্দিনী শুনতে শুনতে আমরা কয়েকজন মিলে ঠোঙা বানালাম। বাবুনি সেদিন বিকেলে বাজারের নানা দোকানে ঘুরে ঘুরে ঠোঙা বিক্রি করল। সেই টাকাতে চপ মুড়ি আর সেন্ট কেনা হল।

খেলার মাঠের পাশেই বাবুনিদের বাড়ি। বাড়ির সামনে অনেকটা ফাঁকা জমিতে এলোমেলো বাগান, কত ফুলের গাছ—গাঁদা, দোপাটি, টগর, গন্ধরাজ, গোলাপ—অবিকল একইরকম আছে। মাঠ থেকে চেঁচিয়ে কে যেন ডাকল আমায়, তাকিয়ে দেখি—বাবুনি, বালু, তিমির, হাসিদি, সবাই হাত নেড়ে ডাকছে আমায়।

সেই কত যুগ আগের বয়েসে থমকে আছে সবাই। কাছে যেতেই হাসিদি একগাল হেসে বলল, আম পাড়তে যাচ্ছি, যাবি, চ। হাসিদির দুই বেণী, একটু উঁচু করে পরা শাড়ি দুলছে গোড়ালির ওপরে।

আমি কিছু বলার আগেই ওরা মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটতে শুরু করল, আমার মনে হল, এখানেই যেন কোথায় ছোটো নদীটা আছে, আমি চিৎকার করে বললাম, সেই ছোটো নদীটা কোনদিকে?

ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, নদী কোথায়? সে তো খাল! না, না নদী—

কোথায় গেল?

আয় তা'লে, আমবাগান ঘুরে তারপর নদী খুঁজতে যাব। বলেই ওরা আবার ছুটতে শুরু করল।

ওদের সঙ্গে তালমিলিয়ে আমি ছুটতে পারছি না, অথচ আমার মনে হচ্ছিল ধারেকাছেই কোথায় যেন নদীটা আছে!

পায়ে কী বেধে আমি পড়ে গেলাম—মুখ তুলে দেখি, কোথায় মাঠ! পিচ-বাঁধানো গলিতে পাকা ড্রেনের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি আমি, এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুই চিনতে পারি না—এ কোন পাড়া! এ কোন শহর! এ তো আমার ছেলেবেলার লীলাভূমি নয়!

হাত ধরে তুলল একজন, মাথা ঘুরে গিয়েছিল?

না, মানে, এখানে বালুদের বাড়ি কোন্‌টা?

বালু? ঠিকানা কী বলেছে?

বালু, মানে, পুরো নাম বলাই বিশ্বাস, বাজারে ওদের ব্লাউজের দোকান ছিল।

ও, আপনি জ্যাকিদের বাড়ি খুঁজছেন?

জ্যাকি কে?

বলাই কাকার ছেলে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম বক্তাকে, হ্যাঁ, বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে ছেলেটির, সে বালুকে কাকাই তো বলবে।

কিন্তু বলাই কাকা—

কী?

উনি হারিয়ে গেছেন।

মানে?

বাংলা বোঝেন না?

মানে?

চারপাশে একটা হাসির হররা, ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছে। সবাইকে থামিয়ে মাতব্বর গোছের একটা ছেলে এগিয়ে এল।

বলাই কাকা বছর দুই আগে গঙ্গাসাগর মেলায় গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি, অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল, কিন্তু জানা যায়নি কিছু।

শুনতে শুনতে হঠাৎ বুকের ভেতর কেমন যেন দমচাপা ভাব হয়ে এল, চারপাশে তাকাই, বড়ো বড়ো বাড়ি, দোতলা তিনতলা, প্রায় গাছপালাহীন, পাকা ড্রেন, পিচবাঁধানো গলি, লাইটপোস্টে টিউবলাইট, ফোন আর কেবলের তারে জড়াজড়ি, মেইন রাস্তা ধরে পরপর স্টেশনারি, ওষুধ, জেরক্স, বিউটি পার্লার, এসটিডি বুথ—কত দোকান!

পালটাবেই তো, কুড়ি বছর নিতান্ত কম সময় নয়। ক্লাস নাইনে ওঠার পর এপাড়া

ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। মধ্যমগ্রামে বাড়িভাড়া করেছিলেন বাবা। প্রথম প্রথম বছর দুই বেশ আসা যাওয়া ছিল পুরনো পাড়ায়, তারপর ক্রমশ কমতে থাকে, শেষ বছর কুড়ি কোনো যোগাযোগ নেই। বছর তিন আগে বাবুনির সঙ্গে একবার এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনে দেখা হয়েছিল। আমি চিনতে পারিনি, ও আমাকে চিনেছিল। দু'-তিনটে ট্রেন ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল দু'জনে। সেলস্ লাইনে কাজ করে ও, তখন অবশ্য বেকার, এরকমভাবেই নাকি চলে ওর, এ-কোম্পানি সে-কোম্পানি। আমি বলেছিলাম, দারুণ ব্যাপার, চাকরি ধরছিস আর ছাড়ছিস!

নিবু নিবু আলোর মতো হেসে বাবুনি জানিয়েছিল মোটেই স্বস্তি নেই কাজকর্মে, সাংঘাতিক কমপিটিশন, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক কোম্পানি। হাত পা নেড়ে খুব দ্রুত কথা বলার অভ্যাস একইরকম রয়ে গেছে, ছোটো ছোটো চোখ দুটো আরও ছোটো করে এনে বলল, গ্লোবালাইজেশন বুঝিস, গ্লোবালাইজেশন?

তা আর বুঝি না? চুপ করে ভাবছিলাম আমি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির চেহারাটা তো বুঝছি হাড়ে হাড়ে, ইমপোর্ট রেসট্রিকশন তুলে নেওয়ার পর দেশের কোন ইন্ডাস্ট্রিই বা স্বস্তিতে আছে! হু হু করে ঢুকছে সস্তা দামি নানান বিদেশি মাল!

বাবুনি অবশ্য ওর মতো করে বলে যাচ্ছিল নানা কথা। চোখের নীচে ফোলা ফোলা, অস্বাভাবিক মেদবহুল শরীর, মাঝে মাঝে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল, সব কথা স্পষ্ট বুঝছিলাম না। অতিরিক্ত মদ্যপান করছে ইদানীং, তাও জেনেছিলাম।

আচ্ছা, নির্মলদা কি আদৌ নদীর ছবি এঁকেছিলেন? নাকি অন্য কিছু, সময় মানুষ জীবন নাকি এক দুঃস্বপ্ন—অথচ কেবল মনে হত শৈশবে একটা ছোটো নদী দেখেছিলাম—সেও কি স্বপ্ন নাকি—আমার কীরকম সব গোলমাল হয়ে যায়।

আরেক রাতে স্বপ্নে নদী খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম আবছা একটা মুখ, তার দু'চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। কার মুখ? স্বপ্ন ভেঙে জাগরণে ফিরে এসে বিছানায় এপাশ ওপাশ—তারপর একসময় আবছা মুখটা স্পষ্ট হয়ে এল।

হয়তো বা নদী বেঁচে থাকে প্রথম যৌবনের স্পর্ধায়। আমার বান্ধবী, আত্রেয়ী, সেও তো এক নদী—কলেজে এক সেকশনে এক ইয়ারে ছিলাম আমরা। একসঙ্গে কত আড্ডা, থিয়েটার দেখা, অল্পস্বল্প থিয়েটার করা—সে এক সময়। আত্রেয়ী ভালো আবৃত্তি করত—নিজের মুখের থেকে রোদের সোনালি রেণু মুছে ফেলে নদী/ শেষ রেণু মুছে ফেলে/ সে যেন অনেক বড় মেয়ে এক চুল তার ম্লান—চুল শাদা...কী যেন...হ্যাঁ, শুধু তার ফুল নিয়ে খেলিবার সাধ/ফুলের মতন কোনো ভালোবাসা নিয়ে—আত্রেয়ীর স্পষ্ট উচ্চারণ সুরেলা কণ্ঠ কানে বাজে এখনও। অভিনেত্রী হিসেবেও মন্দ ছিল না। আসলে কলেজের এক লেকচারার, আমাদের প্রিয় সুরঞ্জন স্যার, ওঁরই উৎসাহে, ওঁর পরিচালনায় ওঁরই লেখা স্ক্রিপ্ট 'আলোর খোঁজে' আমরা কয়েকজন সহপাঠী মিলে বেশ কয়েকটা শো করেছিলাম। সত্তরের আন্দোলন,

সন্ত্রাস—এই পটভূমিকায় লেখা নাটকটা বেশ সাড়া জাগিয়েছিল তখন। অবশ্য টেকেনি গ্রুপটা। সুরঞ্জন স্যার কী একটা স্কলারশিপ পেয়ে চলে গেলেন ইস্ট জার্মানি। আমরা তখন থার্ড ইয়ারে, আত্রেয়ী কলকাতার মোটামুটি নামী একটা গ্রুপ থিয়েটারে জয়েন করল। তারপর থেকেই ওর ধ্যানজ্ঞান—অভিনেত্রী হবে।

ওদিকে সে বছরই বাবা চলে গেলেন। হঠাৎ যেন অন্ধকার নেমে এল সংসারে, সামলাতে হিমশিম আমি টিউশনি শুরু করলাম। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে সকাল সন্ধে ব্যাচের পর ব্যাচ শুধু টিউশনি করি আমি। আত্রেয়ী আসত মাঝে মাঝে, ওদের থিয়েটার গ্রুপের কথা বলত, আবৃত্তি শোনাত, আর বারবার বলত, একটু সময় বের করে থিয়েটার কর, আমাদের গ্রুপে চল।

হ্যাঁ, সেই আত্রেয়ীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি, শ্যামবর্ণা, ছোটোখাটো শরীর, সুঠাম স্বাস্থ্য আর মুখখানা যেন তুলি দিয়ে আঁকা। হালকা রঙের একটা ছাপা শাড়ি, ঘন চুলের যেমন-তেমন একটা হাতখোঁপা, কপালে ছোটো টিপ, দু'-চোখে নিবিড় মায়া-ছলছল নদী।

জানিস, গান শিখছি।

তাই?

হ্যাঁ, গান জানলে অভিনয়ে খুব কাজে লাগে।

দিন যায়, দেখাসাক্ষাৎ ক্রমশ কমে আসছিল আমাদের। একদিন শেষবিকেলে ঝড়ের মতো এল, কেমন যেন বিষণ্ণ অস্থির। আমি বললাম, কী রে, কী খবর?

চলছে একরকম।

গ্রুপের খবর কী?

ভালো না, বড্ড দলাদলি, ভালো লাগছে না একদম। আয়-না, তুই, আমি আরও কয়েকজন—আমাদের কলেজের সোমনাথ, প্রণব সবাই মিলে একটা গ্রুপ গড়ি।

সে সব কবেকার কথা! মনে হচ্ছে যেন এক জাদুঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। আমি কি এক স্বপ্নের ভেতর ঢুকে পড়ছি?

দেখতে পাচ্ছি, শুকনো পাতায় যেন ঢেকে যাচ্ছে আত্রেয়ীর শরীর, একটা কাঁপা কাঁপা হাত বেরিয়ে এসে বলছে, তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।

কী কথা?

কী কথা তুই বুঝে নে, সব কথা কি উচ্চারণ করে বলে দিতে হবে! আমি বুঝেও না বোঝার ভান করলাম। নদীর নাম আত্রেয়ী—তাকে তিরতির করে বইতে দেওয়ার মতো জমি কই আমার? আমার ভাঙা কুঁড়েতে তখন সাত ভূতের নাচন!

পরদিন রাতে আবার স্বপ্নে আমি আমার হারিয়ে-যাওয়া নদীটাকে আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কি আমার ছোটো নদী নাকি অন্য কোনো নদী? আমি পাগল হয়ে বালির ওপর দিয়ে দৌড়োতে থাকলাম। অথচ দৌড়োতে দৌড়োতে যেখানে গিয়ে পৌঁছোলাম

সে এক বিবর্ণ আলোয় চাপা-পড়া গলি—দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী, বয়েস বেড়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই তবু চিনে নিতে অসুবিধা হল না আমার, কিন্তু আত্রেয়ী চিনতে পারল না আমায়, চিনতে পারল না, নাকি চিনতে চাইল না? সে যেন আমায় তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচে!

মজা নদীর পাথুরে চরে হোঁচট খেয়ে আমার স্বপ্ন ভাঙল আর আমি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে থাকলাম আমার প্রথম যৌবনের নদীটাকে? সেই কি আমার আঁকাবাঁকা পথে তিরতির-বয়ে-চলা ছোটো নদী, মজে হেজে শুকিয়ে গেছে?

অনেক খোঁজখবর করে জানলাম, গ্রুপ থিয়েটার ছেড়ে পেশাদার থিয়েটার, সিনেমার নানা গলিঘুঁজির মধ্যে পাক খেতে খেতে আত্রেয়ী এখন সংসার আর নিষিদ্ধ পল্লীর এক মাঝামাঝি জায়গায় টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে আছে। কী সব মধুচক্রটক্র—না থাক, কী হবে আর এসব কথা বলে!

আচ্ছা, পৃথিবী থেকে সব নদী কি আস্তে আস্তে একদিন মুছে যাবে? নদীহীন পৃথিবীতে মানুষ কি বেঁচে থাকতে পারবে? নির্মলদা বলতেন, বন ধ্বংস করে নির্বিচারে যত গাছ কাটা হবে ততই মজে যাবে নদী, বৃষ্টির জল গাছের ভেতর জমা হয়ে একটু একটু করে মাটির বুকে আশ্রয় পেত, সে জল এখন গাছপালাহীন ন্যাড়া মাটি ক্ষইয়ে দিয়ে নদীর বুকে জমা করে বালি মাটি পাথর। আরও বলতেন, ছোটো ছোটো মাটির বাঁধ কিংবা বড়ো বড়ো বাঁধ, যতই বাঁধবার চেষ্টা হচ্ছে নদীকে নদী ততই ফুলে ফেঁপে অশান্ত হয়ে উঠছে; মরতে মরতে ভয়ানক আক্রোশে সে ভাসিয়ে দিতে চাইছে সব!

আচ্ছা, মানুষের বুকের ভেতর কি আর কোনো নদী থাকবে না? থাকলেও মানুষ কি আর জানতে পারবে না? সব কীরকম আবছা ধোঁয়া ধোঁয়া! গোলমাল হয়ে যায় সব!

তারপর, গতরাতে—হ্যাঁ, শেষরাতই হবে, স্বপ্নে নদী খুঁজতে খুঁজতে দিশাহারা হয়ে অবশেষে আমি যে ছোটো নদীর সামনে দাঁড়ালাম, কী ভয়ানক! সর্বাঙ্গে আগুন, দাউদাউ জ্বলতে জ্বলতে পুড়ে যাচ্ছে সে নদী। আগুন মাটিতে, আগুন জলে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে আছে আকাশ!

চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আমি নেমে গেলাম নদীর বুকে, আমার সমস্ত শরীর বিছিয়ে জাপটে ধরে চেষ্টা করলাম আগুন নেভাতে। আর কী-ই বা করার ছিল আমার। নদী পুড়ে গেল অথচ আমি পুড়লাম না! জ্বলন্ত নদীর সর্বাঙ্গে আমার শরীর বিছিয়েও পুড়লাম না এতটুকু!

আমি কি আজ থেকে স্বপ্নহীন নিটোল ঘুমের ভেতর বন্দি হয়ে যাব? আমার স্বপ্নে নদী খোঁজা, নদী খোঁজার স্বপ্ন কি মুছে গেল?

আমি কি আর স্বপ্নেও নদী খুঁজব না?

উচ্ছেদ

হ্যাঁ, মানছি, সন্ধে হয়ে এল, তোমাকে অনেকদূর যেতে হবে, বনগাঁ লাইন তো, মার্কামারা, কখন কী হয় ট্রেনের—আরেকটু সময় বসে যাও তবু, এ কথায় সে কথায় আসল কথাটাই বলা হল না তোমাকে, যে জন্যে ডেকে আনা তোমায়, সেই অদ্ভুত নাকি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা নাকি—ঠিক বিশেষণটা খুঁজে পাচ্ছি না, না, 'ভয়ংকর' শব্দটা অভিজ্ঞতার আগে বসাতে চাইছি না, একটু বিয়ার চলবে? না থাক, তুমি তো আবার আমাশায় ভুগে ভুগে—

অভিজ্ঞতা বা ঘটনাটা কাউকে জানানো দরকার আর মনে হল তুমিই হতে পার সেই উপযুক্ত শ্রোতা, অন্তত আমার কাছে, তোমার সঙ্গে মেলামেশা নিতান্ত কম দিনের নয়, সেই নিউবারাকপুরে থাকার দিনগুলো থেকে —

এখানে এই ফ্ল্যাটবাড়িতে তা প্রায় বছর কুড়ি তো কাটল। নিউবারাকপুর ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম কীরকম যেন দমবন্ধ হয়ে আসত। আর যাই হোক ওখানে তখন অনেক ফাঁকা জায়গা, প্রচুর গাছপালা, পলিউশান ফ্রি, এখনও বোধ হয় এখানকার তুলনায় অনেকটা সেরকমই—কী বল?

প্রথম প্রথম একটা নস্টালজিয়া আমায় আচ্ছন্ন করত, বাল্য-কৈশোরের কত স্মৃতি, তুলনায় খানিকটা শান্ত মন্থর জীবনযাপন, জন্মশহরের টান—এখন অবশ্য ওসব ভাবলে হাসি পায়, ডিসগাসটিং, আসলে উদ্বাস্তু কলোনির নিম্নমধ্যবিত্ত ন্যাকামি স্বভাবটা কি সহজে যেতে চায়?

তবু একটা অনুভূতি, এখন ভারী বোকা বোকা বিশ্রিই মনে হয়, অনেকদিন পর্যন্ত আমার মন-মগজ সব কুরে কুরে খেত, নাকি ওই যে—আরে ওই লাইনটা—ধুর, বলনা, আজকাল আর মনে পড়ে না, সে এককালে যখন তোমাদের সঙ্গে মিলেটিলে পদ্যচর্চা করতাম, ওই যে—হ্যাঁ, অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে... সেই অনুভূতিটাও যেন আমার রক্তের ভেতর খেলা করত, আর এখন—সত্যি কথা বলতে কি সে তুমি যতই আমায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলে গাল দাও না কেম, আমার সব অনুভূতি উবে গেছে, বেঁচে থাকা বাপু দুদিন বৈ তো নয়, সুতরাং যত পার ভোগ করে নাও, পেট দিয়ে মুখ দিয়ে ইয়ে দিয়ে—হাঃ, হাঃ, চেটেপুটে বুঝে নাও সব!

এই যে তুমি, তুমি দিনরাত লম্বা চওড়া বাতেলা মার, আমাকে মোটেই পছন্দ কর না সেও আমি জানি, কিন্তু আমি ফোনে ডাকলে না এসে পার না, প্রতিবছর তোমায় মোটা টাকার বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিতে না পারলে তুমি থোড়াই আসতে আমার ডাকে —

আরে চটো কেন, বসো বসো, একটু ইয়ার্কি করলাম।

এই বাঙালি জাতটার কিছু হল না, কেন জান? এরা বড় আবেগপ্রবণ, স্পর্শকাতর! নির্মম নির্দয় হতে শিখল না। অথচ বোঝে না নির্মম নির্দয় হতে না পারলে বড় কিছু করা

যায় না, গায়ের চামড়া একটু মোটা করে নিলে অসুবিধা কী? এই ধর, তোমাকে একটু টিজ করলে কী হবে তোমার? অঙ্গ খসে যাবে? কিন্তু বিনিময়ে এতগুলো টাকার বিজ্ঞাপন তো পাবে, আরে বাবা ফ্ল্যাট থেকে নেমে না হয় আমায় শুয়ারের বাচ্চা বলে গাল দিয়ে মনের ময়লা মুছে ফেলবে, ব্যাস চুকে গেল! পেট থেকে পড়েই সব কবি হবে নয়তো বিপ্লবী—তাও যদি ঠিকঠাক হতে পারত—

যাক, যে কথা বলছিলাম, সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—তুমি এর আগে জানলা দিয়ে তাকালে ওই সরু খালের পাড়ে ভারী বিশ্রী একটা দৃশ্য দেখতে পেতে, আসবার সময় নিশ্চয় তোমার নজরে পড়েছে সেই বিশ্রী দৃশ্যটা আর নেই। সারি সারি কদাকার ঝুপড়িভর্তি কদাকার মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা, ধোঁয়া-ধুলো, চিৎকার-চেঁচামেচি সব সাফ হয়ে গিয়ে রাস্তা এখন কত চওড়া। খালের পাড় দিয়ে এখন ফুলগাছ বসবে, যেখানে একটু বেশি জায়গা সেখানে শুনেছি ফোয়ারাও বসানো হবে।

আমাদের কমপ্লেক্সের পাশে ঝুপড়িগুলো একটা মূর্তিমান অভিশাপের মতো ছিল। যখন প্রথম এখানে আসি তখন তো ফাঁকাই, বছর আট-দশ আগে থেকে একটা-দুটো করে ঝুপড়ি গজিয়ে উঠতে লাগল, দু-তিন বছর যেতে না যেতেই রীতিমতো একটা বড়সড় বস্তি!

অভিশাপ কেন? তা'লে বলি শোন, পুজো-টুজোর সময় বা এদের কোন বিয়ে-টিয়ে বা যে কোন একটা ছুতো-নাতায় এমন গাঁকগাঁক করে মাইক বাজায়—দু-দুবার পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। তারপর, প্রথম প্রথম কেউ মরলে বা হাসপাতালে থাকলে বা যে কোন অছিলায় এরা কমপ্লেক্সে ঢুকে টাকা-পয়সা চাইতো, পরে সিকিউরিটি গার্ডকে ধমক দেওয়ায় সেটা বন্ধ হল বটে, শুরু হল নতুন এক উৎপাত। কমপ্লেক্সে আর না ঢুকলেও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত পাততো। তাছাড়া, এরা যে একেবারে শক্তিহীন অসহায় তা ভেবো না, ভোটেরবাজারে ফলস্ ভোট দেওয়ায় যথেষ্ট কদর এদের!

না, ঝুপড়ির মেয়েছেলেদের কাউকেই আমরা বাড়ির কোন কাজে বহাল করিনি। সে সব কাজে বারুইপুর-টুরের ওদিক থেকেই আসে সব।

হ্যাঁ, ঝুপড়ির কাউকে কাউকে অল্প চিনতাম না তা নয়, ধর, গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে এগিয়ে যে পান-বিড়ির দোকান—যেটা অবশ্য ভেঙেচুরে তুলে দিয়েছে, দোকানটা যার সে নরেশ বা পরেশ কী যেন নাম, ওর সঙ্গে মাঝেমধ্যে এটা সেটা কথা হত। ব্যাটাদের খাওয়ার ঠিক নেই কিন্তু বাচ্চা পয়দা করার সময় সেটা মনে রাখে না। ভাবতে পারো এ বাজারে চার-চারটে ছেলেমেয়ে, সবচেয়ে যে বড় সে তো এখন জোয়ান-মদ্দ, তবু এখনও আরেকটি ওর বউয়ের মাই চুষছে!

তা, সে পরেশ না নরেশ, সে ব্যাটার দোকান থেকে মাঝে মাঝে সিগারেট-টিগারেট নিতাম, একদিন মওকা পেয়ে বলে—দাদা, জোয়ান ছেলেটার কাজ-কাম জুটছে না, মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে, একটা কিছু জুটিয়ে দিন—বোঝ কাণ্ড! কাম-কাজ কি হাতের মোয়া! আমি

বললাম—বাজারে বা স্টেশন চত্বরে তরিতরকারি নিয়ে বসিয়ে দাও, না হলে ট্রেনে-বাসে বাদাম বেচুক, ওতে আর কী এমন পুঁজি লাগে? তা, সে নানা কথা শুরু করল, ওসব জায়গাতেও বসতে নাকি এলাকার কাদের মোটা টাকা দিতে হয় আর টাকা দিয়েও সবসময় জায়গার স্থায়িত্বের নাকি কোন গ্যারান্টি নেই!

আসলে ওসব বাহানা, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, কী বল? এই আমার কথাই ভাবো একবার, কোত্থেকে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, তোমাদের ওই নিউবারাকপুরে সেই সিকসটিজের কথা ভাবো, এক হ্যারিকেনের আলোয় তিন ভাই-বোন পড়াশোনা করেছি, এম-কম পর্যন্ত তো ওভাবেই, ইলেকট্রিক এল তো তারপর, টিউশনি করে পড়ার খরচ জোগাড় করেছি, বাবা স্কুল টিচারি করে ক পয়সা পেতেন! একটা ঘড়ি কিংবা সাইকেল তখন আমার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল। তারপর কত স্ট্রাগল! কষ্টের কত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে —লেবার লেবার! সততা একাগ্রতা! বুঝলে ভায়া—এখন এই শর্মা—

আসলে একসময় তোমাদের মতো আমিও ভাবতাম এইসব মানুষগুলো ব্যবস্থার শিকার, সুস্থ পরিবেশ, সুযোগ পেলে, সাহায্য-সহানুভূতি পেলে এরাও মানুষের মতো মাথা তুলে বাঁচতে পারে—কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি, এখন ওসব ভাবনা রাবিশ মনে হয়! আসলে এরা সব ফাঁকিবাজ, অলস। আমাদের কোম্পানির লেবার আর কেরানিগুলোকেও দেখছি, বাবুরা খাটবেন না অথচ ভোগ-সুখের ইচ্ছে ষোল আনা! নরেশ না পরেশ ওর ছেলেটাও আসলে মাস্তানি মেরে কাঁচাপয়সার মোচ্ছব চায়, রাতারাতি বড়লোক বনতে চায়, কিছু দিন আগেই শুনলাম ব্যাটাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে—

চাবুক। চাবুক দরকার বুঝলে! এদেশে চাবকিয়ে ছাড়া কাজ করানো যাবে না, ব্রিটিশ সেটা পারতো, তাই আর যাই হোক যতদূর শুনেছি ওদের রাজত্বে একটা শক্তপোক্ত শৃঙ্খলা ছিল দেশে—আর এখন, তোমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে—থাক সে কথা, যা বলতে চাইছিলাম, হ্যাঁ, আপদ মানে ঝুপড়িগুলো উচ্ছেদ করা গেছে।

তোমার কাছে লুকোবো না, আমাদের এই পাশাপাশি তিনটে কমপ্লেক্সের জয়েন্ট প্রেসার ছিল, আমরা সবাই মিলে কাউন্সিলার থেকে এম-এল-এ পর্যন্ত দরবার করেছি, চাপ দিয়েছি হুমকি দিয়েছি, ওরা কাদের লোক স্পষ্ট করে সেটা বলতে হবে, আমাদের না ওই ঝুপড়ির বাসিন্দাদের? স্পষ্ট কর, নো ধানাই-পানাই।

জানি, তুমি এখনই ঘ্যানঘ্যান শুরু করবে, এতগুলো লোক যাবে কোথায়, থাকবে কোথায়, বাঁচবে কীভাবে—চুলোয় যাবে, জাহান্নমে যাবে, শোন, একটা কথা বলি, ভালো কাজে, দেশের উন্নতির জন্য, নাগরিকদের ন্যায্য সুখ-সুবিধার জন্য কিছু আগাছাকে চাপা পড়তেই হয়—পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশটার দিয়ে তাকাও, দেশটার গোড়ার ইতিহাসের কথা ভাব একবার, ওই অসভ্য বর্বর রেড ইন্ডিয়ানগুলোকে মেরেধরে ধ্বংস না করে কি গড়ে উঠতে পারত সে দেশটা? পৃথিবীর যা কিছু মানুষের তৈরী বৈভব সম্পদ—চিন্তা করে দেখো, এর পেছনে রয়েছে কোটি কোটি দাস-শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রম। না, না

দাসব্যবসাকে তুমি একটু অন্যদিক থেকে দেখো, সবকিছুরই নেগেটিভ-পজিটিভ দুটো দিক আছে, দাস-ব্যবসারও পজিটিভ দিক হল এটাই, দাসদের জোর করে খাটাতে না পারলে আজকের এই সভ্যতা এই বৈভব ঐশ্বর্য আমরা পেতাম কি? ইউরোপ-আমেরিকার এতো সমৃদ্ধি কি হত যদি না ওই কালো মানুষদের চাবুক মেরে কাজ না করানো যেত?

ব্যঙ্গ করছ? ধর্ষণের পজিটিভ দিক? ভাবলে হয়তো তাও পাওয়া যাবে। শোনো, বোসো, উত্তেজিত হয়ো না, উত্তেজনা শরীরের ক্ষতি করে, ভাবনা-চিন্তা গুলিয়ে দেয়।

যে কোন বিষয়কেই নানাভাবে দেখা যায়, ব্যাখ্যা করা যায়, তুমি কীভাবে দেখবে সেটা নির্ভর করে তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে সেটা দেখছ, অনেক উঁচু কোন বাড়ি থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলে যেরকম লাগবে আবার সেই একই দৃশ্য খুব কাছ থেকে দেখলে আরেকরকম, তুমি হয়তো কোনদিন প্লেনে চড়নি কিন্তু পাহাড়ে গেছ তো? দার্জিলিং? দেখবে নিতান্ত তুচ্ছ দৃশ্যগুলোকেও ওপর থেকে কীরকম মনোহর লাগে, মনটাকেও যদি ওরকম উপরে অনেক উপরে নিয়ে যেতে পার, দেখবে দৈনন্দিন তুচ্ছতা সংকীর্ণতা দারিদ্র্য—এগুলো আর তোমায় পীড়া দিচ্ছে না, তুমি শান্ত হয়ে যাবে, তুমি কোন কিছুতেই আর বিচলিত হবে না, অবিচলিত থাকা একটা বড় গুণ, অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তা অনেকটা আয়ত্ত করা যায়, তখন সুখ-দুঃখ কিছুই তোমাকে আর স্পর্শ করবে না, তোমার জুতোর তলায় যে পিঁপড়ে মরছে তাদেরও তো প্রাণ আছে, তুমি কি শোক কর তার জন্যে?

কিছু মানুষের ভালোভাবে বাঁচার জন্যে অনেক মানুষকে মরতে হবে পিঁপড়ের মতো—এটাই সত্য, মেনে নিতে শেখো এটা, এ প্রকৃতির নিয়ম, প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাঙ খেয়ে বাঁচে সাপ আবার সাপ খেয়ে বাঁচে ময়ূর—প্রকৃতির সৃষ্টি তুচ্ছ মানুষ কী করে পাল্টে দেবে এ নিয়ম?

বুঝতে পারছি, তোমার মন মেনে নিতে চাইছে না, কেমন যেন বিদ্রোহ করে উঠছে ভেতরে ভেতরে, এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়, আমিও একসময় তোমার মতোই ভাবতাম, ট্রেনের জানলায় কোন রুগ্ন বৃদ্ধা শীর্ণ হাত বাড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় দুটো পয়সা চাইলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর সূঁচ ফুটত, চায়ের দোকান কিংবা রেস্টুরেন্টে কোন শিশু-কিশোরকে কাজ করতে দেখলে মন খারাপ হয়ে যেত—কিন্তু এখন আর সেরকম হয় না।

আসলে পৃথিবীতে এক এক সময় এক এক রকমের হাওয়া বয়, সেই হাওয়া বুঝে পাল ভাসাতে জানতে হয় ব্রাদার, সে হাওয়াকে সেঁধিয়ে দিতে হয়—কী বলে, এই অন্তরাত্মায়! নচেৎ অনুতাপ বিবেকতাড়নায় জ্বলতে জ্বলতে ভেতর থেকে ভেঙে যায় মানুষ, নিজের কাছে যুক্তিগুলো স্পষ্ট করে তোলা খুব জরুরি।

তোমার খাওয়া জুটছে না বলে তুমি ফুটপাথ দখল করে মাল বেচতে বসে পড়বে, এ চলতে পারে না। আজ ফুটপাথ দখল করেছ, কাল অন্যের বাড়িটাও দখল করে নেবে, তুমি কীভাবে খাওয়ার জোগাড় করবে সেটা তোমার ব্যাপার, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নেবে কেন? যে

নাগরিকেরা রাষ্ট্রকে মোটা টাকা কর দিচ্ছে তাদের সুখ-সুবিধার কথা ভাববে না রাষ্ট্র? তোমার থাকার জায়গা নেই কিংবা জায়গা থাকলেও সেখানে রুজির সুবিধা নেই বলে যেখানে-সেখানে তুমি ঝুপড়ি বানিয়ে বসে পড়বে—এ চলতে পারে না। তাই উচ্ছেদ জরুরি, শুধু ঝুপড়ি কেন আমাদের জীবন ভাবনাচিন্তা মনপ্রাণ থেকে অনেক কিছুরই উচ্ছেদ প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের বাঙালি জাতটা আবেগের সুড়সুড়ি খেতে বড় ভালোবাসে, স্যাঁতসেতে মায়া-মমতাকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ধর, গরীব বাপ-মায়ের মেধাবী কেরিয়ারিস্ট সন্তান যদি বিয়ের পর ধনী শ্বশুরের দৌলতে আরও মসৃণ ঝকঝকে কেরিয়ার বানাতে বাপ-মাকে অবহেলা করে বউয়ের বাপ-মাকে বেশি খাতির-যত্ন করে, তা হলে তোমরা ছিঃ ছিঃ করে উঠবে, তা নিয়ে দিব্যি গল্প-উপন্যাস চাই কি হিট টিভি সিরিয়ালও বানিয়ে তুলবে, কী ব্যাপার? না, ছেলেটি স্বার্থপর, হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ—আরে বাবা, ঠিকই তো করেছে ছেলেটা, উন্নতি, আরও উন্নতি, এইতো জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত, পেছনে তাকাবে কেন? পেছনে তাকাবার সময় নেই আজ আর, উন্নতির সিঁড়ি বরাবর এমনই, অনেককিছু পেছনে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে তবেই না পৌঁছে যাওয়া যায় উন্নতির শীর্ষে—

জানি, তুমি এসব কথা মানতে চাইবে না, আমিও একসময় মানতে চাইতাম না, উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে একসময় দেখলাম আমার হাতে অনেক টাকা—আর টাকা থেকে ক্ষমতা—না, বোধহয় ভুল বললাম, আমার নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা নয় বরং বলা যায় আমি ক্ষমতা কেন্দ্রের অনেক কাছাকাছি, ক্ষমতাকে ছুঁতে পারি—আর আমার দেখার চোখ বোধশক্তি সব কেমন পাল্টে যেতে লাগল, কী বোকার মতো জীবনযাপন করে যায় মানুষ! কী সব অর্থহীন বস্তাপচা বুলি সারাজীবন আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে মানুষ—হাসি পায়, অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছে করে কিন্তু আজকাল আমি আর প্রাণ খুলে হাসতেও পারি না, হাসতে গিয়ে মনে হয় হাসির ফাঁক দিয়ে জীবনের এত হিসেবনিকেশ খাটনিতে গড়া সঞ্চয় সব বুঝি গলে যাবে। কিছুদিন আগেও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখলে বুকের কোণে সামান্য ছিঁটেফোঁটা কষ্ট হত, খুব মজার ব্যাপারে যা হোক এক চিলতে হাসি ফুটে উঠত ঠোঁটের কোণে, খবরের কাগজে দাঙ্গা বা ওইরকম কোন ব্যাপারের বীভৎস ছবি দেখে একটু অস্বস্তি হত—কিন্তু কী আশ্চর্য আজকাল আমি সবকিছুতেই কীরকম অবিচলিত শান্ত থাকতে পারি, কোনকিছুই এখন আর আমাকে স্পর্শ করে না। ধর, এই এখন যদি এমন হয় যে তোমার বেঁচে থাকাটা আমার স্বার্থহানি করতে পারে, সত্যি বলছি তোমাকে খুন করে ফেলতেও আমি একটুও বিচলিত হব না, দিব্যি নিরুদ্বিগ্ন শান্তভাবে আর দশটা কাজের মতো সেরে ফেলতে পারব।

ভয় পেলে নাকি, আরে বসো বসো, সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথাটাই বলা হল না—হ্যাঁ, একেবারে আসল কথায় যাব এবার। ঝুপড়ি উচ্ছেদ হয়ে গেল, সেদিন রবিবার। জানলা দিয়ে দেখছিলাম, পুলিশ থিকথিক, বুলডোজার, কী সব নাগরিক মঞ্চ-ফঞ্চের লোকজনও এসেছিল। প্রথমে পুলিশকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি, ঝুপড়ির বাসিন্দারা যেন হেরেই বসেছিল, পুলিশ হ্যাণ্ডমাইকে ওয়ার্নিং দিতেই পিলপিল করে ছেলে-বুড়ো-বুড়ি-মেয়ে-বাচ্চা-

কাচ্চা সব বেরিয়ে এল, যার যা মালপত্র বেঁধেছেঁদে রেখেছিল, কেউ কেউ বাঁশ বেড়া খুলতে শুরু করল, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, বেশ হাঁউমাঁউ করেও কাঁদছিল কয়েকটা বুড়োবুড়ি, দু-চারজন পুলিশের দিকে রুখে যেতেই অল্প লাঠি চালালো পুলিশ, খবরের কাগজে যাকে বলে মৃদু লাঠি চার্জ!

আমি দেখছিলাম, আমার প্রিয় পানীয়টিতে চুমুক দিতে দিতে জানলা দিয়ে দেখছিলাম, একবার কী জানি কেন মনে হল, আমিও এক উদ্বাস্তুর সন্তান, আমার বাপ-ঠাকুর্দাও একদিন ভিটেমাটি হারিয়ে রিফিউজি ক্যাম্পে উঠেছিলেন, তবে সে ভাবনা থিতু হতে দিইনি, না, উন্নয়ন, উন্নয়নের কথা ভাবতে লাগলাম আমি, রাস্তা চওড়া হবে, ড্রেনেজ সিস্টেম ডেভলপ করবে, কমপ্লেক্সের বাচ্চাগুলো বিকেলে খালধারে ফুলবাগানে দোলনা চড়বে—

কিন্তু বেলা বাড়তেই কীভাবে যেন গোলমাল লেগে গেল। আসলে সবাই তো বাঁচতে চায়! উন্নয়নের রথের তলায়চাপা পড়ে মরতে কেই বা চায় বল। প্রাণ তো বাঁচতে চাইবে, প্রাণের ধর্মই তো এই—না, না সব ভুলভাল বকছি, ঝুপড়ির বাসিন্দারা বেআইনি দখলদার, তাদের থাকার জায়গা নেই বলে কি তারা আমার বাড়ির উঠোনে তাঁবু গাড়বে?

তা, কিছু বদমায়েস লোক, ওই যে কীসব নাগরিক মঞ্চ-ফঞ্চ, ওদের উসকানিতে ঝুপড়ির কিছু কমবয়েসি ছোঁড়া পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করল, পুলিশও অগত্যা মারমুখী—আমি দেখছিলাম, একটু উঁচু থেকে সেইসব দৃশ্য, যেন কোন টিভি চ্যানেলের নিউজ প্রোগ্রাম, মন্দ লাগছিল না, কীরকম একটা থ্রিল, আর সে থ্রিলকে উপভোগ করতে গেলে যে কোন একটা পক্ষ নেওয়া খুব জরুরি হয়ে ওঠে, তাই না? ধর, জার্মানি আর ইতালির ফুটবল ম্যাচ চলছে বিশ্বকাপে, তুমি আমি কোন পক্ষেরই নই—তবু খেলা উপভোগ করতে কিছু একটা অজুহাত খাড়া করে যে কোন একটা দেশের দিকে আমরা ঝুঁকে পড়ি—সেরকম ঝুপড়ি উচ্ছেদ নিয়ে এই চোর-পুলিশ খেলায়—

খেলা নয়? হ্যাঁ, হয়তো যারা নিরাশ্রয় হয়ে ভয়ে রাগে ঢিল ছুঁড়ছে তাদের দিক থেকে এটা খেলা নয়, কিন্তু যে সব রাজনৈতিক শক্তি-টক্তি পেছন থেকে এদের উস্কে দিচ্ছে তাদের দিক থেকে এটা খেলাই বটে, ক্ষমতা দখলের খেলা, তারা যখন যেখানে ক্ষমতা পাবে বা পাচ্ছে, একই উচ্ছেদ তারাও করবে বা করছে। অংক খুব সরল, আমার হাতে যখন ক্ষমতা তখন উচ্ছেদ জরুরি, আবার আমি যখন ক্ষমতার বাইরে তখন উচ্ছেদ অমানবিক!

তা, এ খেলা বেশ উপভোগ করছিলাম। পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটার সঙ্গে কান্না ও চিৎকারের বেসুরে বাতাস এলোমেলো ছিটকে যাচ্ছিল চারপাশে—অনেক আগে যখন তোমাদের সঙ্গে মিলে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াতাম, তখন মানুষের কান্নার একটা দিকই চোখে পড়ত, মানুষের কান্না শুনলে নিজের ভেতরেও একটা কান্না জাগত, কখনও সে কান্না থেকে কী এক রাগ ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলত সারা শরীর, অথচ কান্নার যে অন্য একটা দিক আছে, সে যত অসহায় দুর্বল মানুষের কান্নাই হোক—কান্নায় একধরণের উল্লাস জাগে

ভেতরে, এ দিকটা আগে কখনও বুঝিনি, পুলিশের হুংকার, চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে সপাটে বাড়ি আর কেঁদেককিয়ে ওঠা মানুষ—কেমন এক অদ্ভুত উল্লাস জাগছিল—আসলে এ বোধহয় বীররস, বাঙালি বীররসকে গুরুত্ব দিতে শেখেনি, মধুর রসেই মজে আছে আবহমানকাল—বীভৎস রস? তা-ই হল না হয়, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম আমি এক সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি, সমস্ত স্যাঁতসেঁতে ন্যাকামির অবশেষ মুছে ফেলে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী এক মানুষ—

ব্যাপারটা নিতান্ত সোজাসাপটা নয়, এই যে বদল, নিজেকে প্রায় একশো আশি ডিগ্রি কোণে বদলে ফেলা, একমেরু থেকে অন্যমেরুতে চলে যাওয়া অথচ এতটুকু দংশন নেই বিচলন নেই—আছে কি? অথচ এখনও আমাদের সমাজে এই বদলকে মোটেই সুনজরে দেখা হয় না, হ্যাঁ, এককালে কেউ পুলিশের তাড়া খেয়েছে, দুবেলা খাবার জোটেনি, তখন সে সাম্যের কথা বলবে, গণতন্ত্র মানবাধিকারের কথা বলবে, পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখর হবে—সেটা যেমন স্বাভাবিক, তেমন আজ যখন ক্ষমতার কিছুটা ব্যাটন যখন তার হাতে সেও মানবাধিকার গণতন্ত্রের নাম নাকমুখ কুঁচকে পুলিশের গুণগান করবে, তার অস্তিত্বের প্রশ্নে বিপজ্জনক বিরোধীদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবে এতেই বা 'গেল-গেল' রব তোলার কী আছে?

হিপোক্র্যাসি? তা কেন? আমি খোলাখুলিই তো বলছি সব, ভেতরের কথা গোপন করছি কি? আমার বোধের সঙ্গে জীবন একাকার হয়ে গেছে, কোন দোলাচল দেখছ কি? ও, ওই ছবিটা, হ্যাঁ, ওটা রমার ছবি, ওর একটা পাসপোর্ট সাইজের সাদাকালো ছবি ছিল আমার কাছে, সেটা থেকেই আঁকিয়েছি—একসময় আমার জীবনে 'রমা পর্ব' নিয়েএক ধরণের অপরাধবোধ কাজ করত তা আমি অস্বীকার করছি না, কী বোকা বোকা ব্যাপার, না? কিন্তু যে মহিলা আমার কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনের অনেকটা সময় জুড়ে আমায় মজিয়ে রেখেছিল আজ এই পড়ন্ত বেলায় তার ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখতে আপত্তি কীসের? আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়তে পারেনি সে, দুর্বল ছিল, পিছিয়ে পড়েছে, অকালে স্বেচ্ছায় শেষ করেছে নিজের জীবন, কিন্তু একসময় সে আমাকে ছায়া দিয়েছে, সেই স্বীকৃতিটুকু দেব না আমি? ছবিটা কার আঁকা জান? ওর জন্যে কত টাকা খরচ হয়েছে জান? হ্যাঁ, দেবলীনাও এটা ইজি ভাবেই নিয়েছে, ওর পুরুষবন্ধুদের নিয়ে আমি যেমন প্রশ্ন তুলি না, ও আমার বান্ধবীদের নিয়েও প্রশ্ন করে না, আর এ তো এক মৃত মানবীর ছবিমাত্র!

তা ছাড়া হিপোক্র্যাসির প্রয়োজন তাদের যাদের আমজনতার সমর্থন না হলে চলে না, আমি সেলফমেড ম্যান, আমজনতার সহায় সমর্থন নিয়েও চলতে হয় না আমায়, আরও একটা কথা—পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলে ফেলা হিপোক্র্যাসি হবে কেন? অতীতে কেউ যে কথা বলেছে তা-ই চিরকাল বলে যাবে এরকম একটা বিশ্বাস যাদের, তারা আসলে বোকা! আর জানতো বোকাদের মরণ সর্বত্র, চিরকাল! বদলটা ভালো না মন্দ? সে কে ঠিক

করবে বল? যে যার সুবিধার অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাপারটা দেখবে, যে বদলে আমার ভালো, আমি বেশ খেয়ে পরে আরামে বিলাসে সম্মানে প্রতিপত্তিতে থাকতে পারব সেটাই আমার কাছে ভালো, ইংরিজিতে একটা কথা আছে—বিশে যে বিপ্লবী নয় তার হৃদয় নেই আর চল্লিশে যে বিপ্লবী তার বুদ্ধি নেই! কথাটা খাঁটি বলে মনে হয় না তোমার? বরং একটু শুধরে নিয়ে বয়েসের মাপটাকে বিশ-চল্লিশ না করে আঠারো-ত্রিশ করলে মন্দ হয় না কী বল?

হিপোক্র্যাসি শব্দটা খুব প্রিয় নাকি তোমার? গোঁয়ারের মতো ওই শব্দটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছ কেন বলতো? বেশ, ছাড় যারা হিপোক্রিট, হোক তারা, আমি তেমন নই, আই অ্যাম এ সেলফমেড ম্যান, রমা যদি আমার জীবনের কোন পর্বে আমার সাহায্য করে থাকে সে তা করেছিল তার স্বার্থে, আমার মধ্যে প্রতিভা দেখেছিল সে, আমার সঙ্গে জীবন জুড়ে এক প্রাচুর্যময় বিলাসী জীবন পেতে চেয়েছিল অথচ যা তার নিজস্ব ক্ষমতায় কোনদিনই প্রাপ্য হতে পারে না, আমার মতো দুরন্ত জেদি ঘোড়ার সঙ্গে তার মতো এক দুর্বল ভীরু নারীর কীভাবে—যাক সে কথা, পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে উন্নত জীবনযাপনের মধ্যে কোথায় যে তুমি হিপোক্র্যাসি—

অভিযোজন বোঝ? অভিযোজন? বেঁচেবত্তে থাকতে হলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বদলে ফেলতে জানতে হয়—যারা তা পারে না সেই সব অক্ষম মানুষদের গালাগাল শুনে আমি আর এতটুকু বিচলিত হই না।

আর হ্যাঁ, সেদিনের সেই উচ্ছেদ দৃশ্য উপভোগ করতে করতেই হঠাৎ— মেঘে ছেয়ে আসা সেই বেলাদুপুরে এক প্রকাণ্ড রথে চড়ে এসে দাঁড়ালেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ, ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল এক আশ্চর্য সুবাস, সে গন্ধে কী মাদকতা! এক ঘোরের মধ্যে সেই পুরুষের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়লাম, তিনি কে আমি জানি না, হয়তো তিনি আমার ঈশ্বর, ঈশ্বর আছেন কি নেই কে জানে! কিন্তু যদি তিনি নাও থেকে থাকেন, আমার মতো আরও অনেক মানুষের একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন, না থাকলেও আমাদের বানিয়ে নিতে হবে নিজস্ব ঈশ্বর, না হলে সুখে-দুঃখে অবিচলিত থাকব কীভাবে? কার পায়ে সমর্পণ করব সব ভার গ্লানি দৈন্য নিরাশা বোধবুদ্ধি? আমার সে ঈশ্বর করুণাময় নন, তিনি শক্তিমান, তিনি একটু নিচু হয়ে দুহাত দিয়ে সবলে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন তাঁর মুখোমুখি, নির্বান্ধব সঙ্গীহীন মানুষের একমাত্র সঙ্গী ঈশ্বর ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারে, বল?

তিনি তাঁর দুহাত বাড়িয়ে আমার বুকের ভেতর থেকে কী যেন খুবলে নিয়ে গেলেন অথচ আমার একটুও ব্যথা লাগল না, কী যেন উচ্ছেদ হয়ে গেল আমার শরীর আমার চেতনা থেকে—আমার স্নায়ুগুলো আরও দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল, ক্রমশ মনে হতে লাগল আমি বুঝি এক লৌহপুরুষ, আমার চোখে আর কোনদিন জল আসবে না, আবার বুকের ভেতর কীরকম যেন হালকা হয়ে গেল—উঠো না, শোন, কী আশ্চর্য ব্যাপার, না? যেও না, শোন, আমার কোন সঙ্গী নেই— শোন, আরেকটু বসো, প্লিজ, শোন ...

মইনুলকে নিয়ে কয়েকপাতা

মইনুলের আত্মহত্যার খবর আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, যারা মুখে আত্মহত্যার কথা বলে তারা বাস্তবে আত্মহত্যা করতে পারে না। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'লাইফ-লাইন'-এর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর জানতে পারি আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। গত ছ-সাত মাসে যতবার মইনুলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, প্রত্যেকবারই সে আত্মহত্যার ইচ্ছা জানাতো। লাইফ-লাইন ও আমাদের দু-একজনের সাধ্যমতো চেষ্টা সত্ত্বেও ওকে বাঁচানো গেল না।

বড় প্রাণবন্ত ছিল ছেলেটি। আমাদের চারপাশে অজস্র মৃত মানুষের তুমুল ভিড়ে সে ছিল প্রকৃত অর্থে ব্যতিক্রম। গত কয়েকমাসের মইনুলকে যারা দেখেনি, পুরনো মইনুল যাদের মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তাদের পক্ষে ওর আত্মহত্যা মেনে নেওয়া একরকম অসম্ভবই বলা চলে।

লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, লিকলিকে শরীরটা চলাফেরার সময়ে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে যেত, মুখময় দাড়ির জঙ্গল, এলোমেলো একবোঝা চুল, নানা বিষয়ে অনর্গল কথা বলে যেত দ্রুত, মাঝে মাঝে ঝকঝকে হাসির ফোয়ারায় চারপাশের গুমোট হালকা হয়ে যেত।

আমরা একই কলেজের ছাত্র ছিলাম। ওকে প্রথম চিনেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে, আমি তখন থার্ড ইয়ারে। নতুন ছেলেটি নিজেই এগিয়ে এসে গান গেয়েছিল, আলোকের এই ঝর্নাধারায়..., গম্ভীর অথচ ভারী সুরেলা কন্ঠের সেই গান আজও মনে পড়ে—সে সব কত বছর আগের কথা, তা সতেরো-আঠারো বছর হবে।

ও তখন থাকত দোলতলায়, যশোর রোড ধরে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা থেকে একটু এগিয়ে, জন্ম থেকে বাপহারা ছেলেটি জ্যাঠার বাড়ি-মামাবাড়ি মিলিয়ে মানুষ। কলেজ জীবনের পরেও ছাত্র-রাজনীতির সূত্রে আরও কয়েকবছর বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ওর সঙ্গে। তাছাড়া আমরা দু'জনেই একই ফিল্ম সোসাইটির সদস্য ছিলাম, সরলা মেমোরিয়াল হলে ছবি দেখে ফেরার পথে কত আলোচনা আমাদের।

নব্বইয়ের গোড়ায়, নানা কারণে বিশেষত আমার চাকরি ও বিবাহোত্তর সাংসারিক কাজের ব্যস্ততায় মেলামেশা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছিল, তবে খবর পেতাম ভিডিও ক্যামেরার কি একটা কোর্স শেষ করে অডিও ভিস্যুয়াল মিডিয়ায় টুকটাক কাজকর্ম শুরু করছে। ভালো ছবি বানানোর স্বপ্ন দেখত ও, নানাভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল সে জন্যে, কলকাতার 'চিত্রবাণী'-তে নিয়মিত যাতায়াত ছিল ওর, পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ডাইরেকশন কোর্সের অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে চান্সও পেয়েছিল, তবে টাকাপয়সার অভাবেই সম্ভবত সেটা পড়া হয়ে ওঠেনি।

ইতিমধ্যে দোলতলার বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় কেশব সেন স্ট্রিটে এককামরার একটা ঘর

ভাড়া করে থাকত। ওই পর্যায়ে ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল তিরানব্বই সালে। বিরানব্বইয়ের ছয়ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডের পর কলকাতায় যে দাঙ্গা হয়েছিল, তা নিয়ে ওরা কয়েকজন মিলে দশ মিনিটের তথ্যচিত্র বানায়, ম্যাকসমুলার ভবনে প্রথম শোয়ের দর্শক ছিলাম আমি, ছবিতে ক্যামেরার কাজ পুরোটাই ছিল মইনুলের আর ছিল খালি গলায় ওর গাওয়া 'কেন চেয়ে আছো গো মা...' গানটির কয়েক কলি।

শো শেষে আমাকে চমকে দিয়ে যার সঙ্গে আলাপ করাল, সে ওর বউ তিস্তা, আগের দিন ওদের রেজিস্ট্রি হয়েছে। কেশব সেন স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে ওরা তখন মানিকতলা মোড়ের কাছে একটা এককামরা ফ্ল্যাটে ভাড়া নিয়ে থাকছে।

মৃত্যু পর্যন্ত আর বাসা বদল হয়নি ওর। ঘরে ঠাসা ওর নানা বই, পত্র-পত্রিকা, ফাইল, সিডি-র স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত কথা, কত স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল।

হালকা নীল রঙের ফাইলটার ওপর কালো কালিতে বেশ বড় হরফে লেখা—হায় রাম!

গুজরাট গণহত্যা নিয়ে ওর অসমাপ্ত তথ্যচিত্রটার এরকম একটা নাম দেওয়ার কথা একবার ভেবেছিল, পরে অবশ্য আরও কয়েকটা নাম ভাবে, যেমন—ব্ল্যাক স্টার ওভার ইন্ডিয়া, পোগ্রোম ইন গুজরাট ইত্যাদি।

ফাইলটা খুলতেই দেখা গেল বেশ কয়েকটা পেপার কাটিং, বিশেষ অংশগুলো নীল হাইলাইটার দিয়ে দাগানো রয়েছে। যেমন, টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ২০ মার্চ, ২০০২-এ লেখা হর্ষ মান্দারের নিবন্ধটির একটা অংশ, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—'আর নিষ্ঠুর এই পাশবিকতা, অবিচার ও গণহত্যার দিনে কোথায় গেলেন গুজরাটের ভদ্রসমাজ, গান্ধীবাদীরা, উন্নয়নকর্মীরা, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো আর বানিয়ে তোলা কিংবদন্তী—স্বতঃস্ফূর্ত গুজরাটি পরোপচিকীর্ষা, যা দেখা গিয়েছিল কচ্ছ এবং আমেদাবাদের ভূমিকম্পে? ...এই সংগঠিত গণহত্যা যখন তুঙ্গে তখন গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের দরজাও সম্পত্তি রক্ষার নামে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।'

কলকাতার একটি দৈনিক, সংবাদ প্রতিদিন, ১৩ মার্চ, ১৩০২ সংখ্যায় কুলদীপ নায়ারের একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনের অংশবিশেষ—

'রাজা মেনন নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন'—আমরা যারা সৈন্যবাহিনীর লোক আমাদের কাছে দাঙ্গার সংজ্ঞা খুব পরিষ্কার। দাঙ্গা বাধায় উচ্ছৃঙ্খল জনতা। তাদের মধ্যে কোনো বাছাবাছির চেতনা থাকে না। সেইজন্যে যখন গুলি চালানোর প্রয়োজন ঘটে তখন দু-একজন নেতাকে গুলি করে ফেলে দিলে জনতা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অন্যদিকে যাদের খুন করতে চাওয়া হচ্ছে ধর্মীয় পরিচয় দেখে তাদের তালিকা তৈরি করা, মুসলিম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিন্দুক কেটে খোলার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে যাওয়া, রান্নার গ্যাস দিয়ে এমনভাবে বিস্ফোরণ ঘটাতে শেখানো যাতে নিজেরা উড়ে না

যায়—এসব পূর্ব পরিকল্পিত গণনিধনের সুস্পষ্ট নির্দেশক।

রাজা মেনন বলছেন—১৯৮৩ সালে তিনি নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জার্মানিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের একটি এলাকা বেলসনে তিনি গিয়েছিলেন। সেই বীভৎস ইহুদি নিধনের কথা সবার জানা। কিন্তু যেটা তিনি বুঝতে চাইছিলেন হিটলারের ব্রাউন শার্ট ও এস এস বাহিনী কী করে প্রত্যেক শহরে ইহুদিদের খুঁজে বের করত। উত্তর যা পেয়েছিলেন তা হল পুর প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার থেকে তারা তার তালিকা পেত।

এখানে দেখা যাচ্ছে—গোধরা-নিধনের অনেক আগে থেকে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলি ঠিক একইভাবে পুরসভার নথিপত্র, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের রেজিস্টার, টেলিফোন বিলের ঠিকানা, ভোটার-তালিকা একটি জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবসা-তালিকা থেকে মুসলিমদের বাড়ির ঠিকানার নথি তৈরি করেছিল। একে তিনি বলেছেন—ব্রাউন শার্টদের 'দীর্ঘ ছুরিকার রাত্রি'-র দিকে প্রথম পদক্ষেপ।"

এরকম বেশ কয়েকটি পেপার কাটিং, আউটলুক, গণশক্তি, আনন্দবাজার, দি হিন্দু ইত্যাদি।

যতদূর জেনেছিলাম, তথ্যচিত্রের ভাষ্য তৈরি করতে এগুলো ব্যবহার করত ও, হয়তো দু-একটি পেপার কাটিং সরাসরি পর্দায় নিয়ে আসত।

তিরানব্বই সালের পর ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। চাকরি সূত্রে পাঁচবছরের জন্যে ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম আমি।

ফের যোগাযোগ হল, গুজরাট গণহত্যার পরপর কলকাতায় এক সেমিনারে।

আগের তুলনায় গায়ে মাংস লেগে চেহারাটা যেন একটু ভারী, থুতনির দিক থেকে দাড়িতে পাক ধরেছে, স্টুডেন্টস হলের সেই সেমিনারে ক্যামেরা ঘাড়ে ও ওর কাজ করে যাচ্ছিল, চিনতে পেরে আমিই এগিয়ে যাই।

সেমিনার শেষে শিয়ালদা স্টেশনের দোতলার কাফেতে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা।

গুজরাট গণহত্যার পরেই আমেদাবাদ গিয়েছিল। ত্রাণ শিবিরগুলোয় ঘুরে ঘুরে প্রচুর শ্যুটিং করেছে, বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে শোনাতে মাঝে মাঝেই থমথমে মুখে নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছিল।

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের জন্য তথ্যচিত্র নির্মাণ, রিসার্চ ওয়ার্ক, স্ক্রিপ্ট লেখা—এ সবই পাকাপাকি পেশা এখন। ডিসকভারি চ্যানেলের জন্যে আট মিনিট এপিসোডের বারো পর্বের একটা কাজ সম্প্রতি শেষ করেছে। পেশার প্রয়োজনে সারা ভারত তো বটেই, মাঝেমধ্যে দেশের বাইরেও যেতে হয়।

বিয়েটা টেকেনি। দু'বছরের মাথায় ছাড়াছাড়ি, মেয়ে নিয়ে তিস্তা তার বাপের বাড়িতেই থাকে।

লক্ষ্য করছিলাম, ওর সেই প্রাণোচ্ছল ভাবটা কেমন যেন কমে এসেছে। নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলোয় ওর চোখেমুখে একটা গভীর যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। কথা হল

দিনকয়েক পরে ওর বাসায় যাব আমি, যা শ্যুট করেছে সেসব দেখাবে।

ফাইলের ভেতরে পেপার কাটিং ছাড়াও ছিল হাতে লেখা বেশ কয়েকটা পোস্টার। বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন হরফে লেখা সে সব পোস্টারে কোথাও কবিতার কয়েক পংক্তি, কোথাও বা বিভিন্ন বাণী—লালন, কবীর, কোরাণ, উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ—নানা উৎস। জীবনানন্দের 'মহাত্মা গান্ধী' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি গাঢ় লাল রঙে লেখা হয়েছে—

'প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেই সব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যিই আনন্দ সৃষ্টির
সেসব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর বলে;
আমরা অজ্ঞান নই—প্রতিদিনই শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার করি তবু
কেমন দুরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।'

আরেকটি পোস্টারেও রয়েছে জীবনানন্দেরই 'আমিষাশী তরবার'-এর কয়েক পঙ্‌ক্তি—

'...চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্ব'সে
কেবলই পড়িতে আছে; সঙ্গীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
নষ্ট করে দিয়ে যায়;—
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয় এইসব গভীর অসূয়া!

জেনেছে বরুণ, অগ্নি, নরনারী; কর্মক্ষম জীবনের শেষে
একপাল ভেড়া ল'য়ে হেমন্তের মাঠে
শান্তির সারাৎসার নয়;—আলো জ্বেলে শকুনিমামার সাথে হেসে
নগরীর রাত্রি চলে—আমিষাশী তরবার হয়ে তার প্রভাতকে কাটে।'

এসব দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল, মইনুল গুজরাট গণহত্যা নিয়ে কোনো দলিলচিত্র নির্মাণ করতে চায়নি। প্রথমদিকে ও শিল্পোত্তীর্ণ এমন এক তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিল, যা নিছক ঘটনা বা সংবাদকে অতিক্রম করে সমস্যার গভীরে গিয়ে দর্শকের মনন বোধি আবেগকে নাড়া দেবে। পরে আবার খানিকটা ধন্দে পড়ে যায়। এই অমানবিক বীভৎসাকে এই মুহূর্তে হুবহু তথ্য প্রমাণ সহ ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই বেশি জরুরি কি? শিল্পকুশলতার দিকে জোর পড়লে তা কি এক তিমিরবিলাস হয়ে উঠবে?

আর এই কাজ করতে করতেই ভিতরে ভিতরে ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল মইনুল। খুব দ্রুত অনর্গল কথা বলার স্বভাবও পাল্টে যাচ্ছিল। থেমে থেমে কোনো কোনো শব্দের প্রলম্বিত উচ্চারণে বলত, কী হবে এই ছবি করে? বাবরি মসজিদ ভাঙার পর দেশজুড়ে দাঙ্গা, আমাদের এই গর্বের কলকাতাতেও—দেশজোড়া কত প্রতিবাদ, মিছিল, মিটিং, লেখা, ছবি, নাটক—

কী হল?

নির্মীয়মাণ চলচ্চিত্রটি নিয়ে কোনোরকম বাণিজ্য করারও আদৌ ইচ্ছে ছিল না মইনুলের। বেশ কয়েকটি লোভনীয় প্রস্তাব সে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে বলত, দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা ঘিরে নোংরা রাজনীতির মতো বাণিজ্যও কি নোংরা নয়? তা ছাড়া এসব ঘিরে হইচই খানিকটা হজুগ! বিবৃতি, সেমিনার, পদযাত্রা সবই মিডিয়ায় নিজেকে ফোকাস করা—সারাবছর ধরে গলিতে গলিতে মহল্লায় পাড়ায় সর্বত্র তিলতিল করে অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে যে আন্দোলন, তা কই?

বিশেষত শহরবাসী মধ্যবিত্তের প্রসঙ্গ উঠলেই সে নাকমুখ কুঁচকে বলত, পচে গেছে দাদা! পচে গেছে! সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের মনের গভীরে শিকড় ছড়িয়ে পচিয়ে দিয়েছে আমাদের! জীবনে কোনোদিন 'মানুষ' পরিচয়ের ওপরে 'মুসলমান' পরিচয় উঠতে দিইনি—কিন্তু আজ এতগুলো বছর পরে ক্রমশই দেখছি সর্বত্র আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন মুসলমান! আমার পরিচিত গণ্ডির মধ্যেও আমাকে কিছুতেই ভুলতেই দেওয়া হচ্ছে না যে আমার 'ভারতীয়' 'বাঙালি' 'মানুষ' এইসব পরিচয়ের উর্ধ্বে আমি একজন 'মুসলমান'!

মইনুলের স্ত্রী তিস্তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় মাত্র মাসকয়েক আগে। ওরা একসঙ্গে না থাকলেও আইনসম্মত বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। তিস্তা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কাজ করে। নানা ছলে-কৌশলে মইনুলের কাছ থেকে ওর ফোন নম্বর ও ঠিকানা সংগ্রহ করে এক সন্ধ্যায় হানা দিলাম ওদের দমদমের বাড়ি।

মইনুল বেশ অসুস্থ তখন। গভীর ডিপ্রেসনে ভুগছে। আমার পরিচিত এক সাইকো-অ্যানালিস্টের ট্রিটমেন্টে আছে। তারই পরামর্শে আমি তিস্তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

ওদের বিয়েতে দু'বাড়ির কোনো পক্ষেরই সম্মতি ছিল না। জন্মসূত্রে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন গোড়া থেকেই আমাদের এই প্রগতিশীল বাংলায়ও সহজ হয়নি। কিন্তু ওদের সম্পর্ক ভেঙেচুরে যাওয়ার পিছনে অবশ্য ধর্মাচরণ ঘিরে কোনো সঙ্কট বা ভুল বোঝাবুঝি প্রত্যক্ষ কারণ নয়। তবে ধর্মীয় কারণে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা হয়তো একটা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

মইনুলের তখনকার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দু-এক কথা বলে তিস্তার সাহায্য কত প্রয়োজনীয় এই মুহূর্তে সে কথা বিশদে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেই, তিস্তা মৃদু হেসে আমায় হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, আপনি ওকে কতটুকু চেনেন?

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে আমি জবাব দিয়েছিলাম, আপনার থেকে অনেক অনেক কম!

শুনে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে ছিল তিস্তা। তারপর মৃদুস্বরে একটানা যা বলেছিল তার সারমর্ম এই যে একজন অসুস্থ বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করে তাকে রোগমুক্ত করে তুলতে ওর আপত্তি নেই কিন্তু নতুন করে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলা অসম্ভব এবং এই কারণেই ওর

মেলামেশা সহায়তায় হিতে বিপরীত হতে পারে।

তিস্তা জানিয়েছিল মইনুল স্বভাবে খুবই আবেগপ্রবণ, যে আবেগ কোনো যুক্তি শৃঙ্খলার ধার ধারে না এবং এই অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতাই ওদের সম্পর্ক বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ।

এসব কথা শুনতে শুনতে তিস্তার চোখেমুখে যন্ত্রণার ছায়া ফুটে উঠতে দেখছিলাম। যদিও তিস্তা ও ওদের মেয়ে বন্যা মইনুলের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ করে,তা শেষ পর্যন্ত মইনুলকে সুস্থ করে তুলতে পারল না।

বয়েসের তুলনায় বেশ গম্ভীর, বারোমাস রোগে ভোগা দুর্বল স্বাস্থ্যের ছোট্ট মেয়ে বন্যাকে একদিন আদর করতে করতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা-মাকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে না তোমার?

বন্যার উত্তরের আগেই তিস্তা চোখের কঠোর ভঙ্গিতে আমায় শাসন করে বলল, দয়া করে আমার সমস্যা আর বাড়াবেন না দাদা!

গুজরাটের শাহ আলম ত্রাণশিবিরে একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখেছিল মইনুল, মেয়েটি প্রাণে বেঁচে ফিরলেও অত্যাচারিত হয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে পরিবারের সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে ঘাতকেরা, অপরিচিত কাউকে দেখলেই মেয়েটি আতঙ্কে চিৎকার করত। মইনুলের ক্যামেরায় সে চিৎকার আর কান্না ধরা ছিল, এডিট করার জন্য সেটি বারবার দেখতে হয়েছিল মইনুলকে, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এই দৃশ্যটিও আমার মনে হয় মইনুলের সংবেদনশীল মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

মেয়েটিকে দেখতে দেখতে ওর কি বন্যার কথা মনে পড়ত?

গুজরাটে গিয়ে মইনুল জুহপাড়া, শাহ আলম ইত্যাদি বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত মানুষজনের কথা ক্যামেরাবন্দী করেছিল। এ ছাড়াও ট্যাক্সিচালক, দোকানদার, চাকরিজীবী সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে চেষ্টা করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখ খুলতে চায়নি কেউ। আমেদাবাদেই এক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে পেয়ে গিয়েছিল তিস্তা শীতলাবাদ, স্টার টিভির বরখা দত্ত, এবং পদত্যাগী আই এ এস অফিসার হর্ষ মান্দারকে, এঁদেরও দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিল।

ত্রাণশিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সে সব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বস্তুত শুনতে শুনতে সুস্থ থাকা যায় না, প্রথমদিন খানিকটা শোনার পর আমিই মইনুলকে বলেছিলাম, বন্ধ কর, আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

জুহপাড়া আশ্রয়শিবিরে আট বছরের এক বালক যখন আতঙ্কিত মুখে শোনায় কীভাবে তার চোখের সামনে তার মা আর চার ভাই-বোনকে পিটিয়ে থেঁতলে মারা হয়েছে—তা কি শোনা যায়?

শোনা কি যায় যখন শাহ্ আলম ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া ফতিমাবাই কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে জানাচ্ছিলেন কীভাবে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা বান্ধবী শালিয়া বেহনের পেট চিরে দিয়ে হত্যাকারীরা তিনবছর আর ছ-মাস বয়েসের দুই সন্তান মুস্কান ও শোভান সহ্ তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল?

গণশক্তির ৬ এপ্রিল, ২০০২ সংখ্যায় হর্ষ মন্দার যা লিখেছিলেন আমানচক থেকে বেঁচে ফিরে আসা মেয়েদের কথা, ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সেই মর্মান্তিক কথাই বলেছিলেন তিনি। সেখানে ধর্ষিত মহিলাদের উলঙ্গ রেখেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা তখন এককোণে জবুথবু হয়ে দলবদ্ধ জন্তুর মতো দ্বিতীয় আঘাতের জন্য অপেক্ষমাণ। তারপর এসেছে বিকৃতির সশস্ত্র জানোয়াররা, নিজেরাই নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই জীবন্মৃত মেয়েদের সামনে। মায়ের বয়েসী মহিলাকে ধর্ষণে মেতেছে ছেলের বয়েসী ত্রিশূলধারী, মেয়ের মতো কিশোরীকে রমণ করতে মেতেছে বাপের বয়েসী প্রৌঢ়—সে এক অবর্ণনীয় যৌন সন্ত্রাস! এই কথাগুলো আপনাদের শুনতেই হবে। আপনি কানে হাত চেপে সেই অবসন্ন, ধর্ষণে ধ্বস্ত, মনুষ্যত্বের সবচেয়ে মহার্ঘ উপকরণ, আব্রু কিংবা বসনভূষণ হারানো মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না।

এভাবে নানা সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষদর্শীদের বীভৎস বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলাম আমরা। আমি প্রথমদিন কিছু অংশ দেখবার পর দ্বিতীয়দিন আর দেখিনি, কিন্তু মইনুলকে তো দেখতে হবেই। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টার তথ্যরাশিকে কেটেছেঁটে আধঘণ্টার মধ্যে আনতে হবে তাকে।

মইনুল আমায় বলেছিল যে, সে ছবিটা শুরু করতে চায় ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালের দিনটি থেকে। গান্ধীহত্যার সেই দিনের কিছু দৃশ্যের নিউজ রিল আর্কাইভ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল। গান্ধীহত্যার সেই দিনটি থেকেই সে চলে আসতে চেয়েছিল '৯২-এর দেশব্যাপী দাঙ্গার পর বম্বে শহরে একটি অরাজনৈতিক মিছিলের দৃশ্যে, টিভি টুডের একটা ক্যাসেট থেকে টুকরো কিছু দৃশ্য সংগ্রহ করেছিল—মিছিলে চলমান ট্রাকের ওপর রাখা হয়েছিল এক বিশাল তৈলচিত্র, চিত্রে ভারতবর্ষের সুবিশাল মানচিত্র, যার সর্বাঙ্গ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্তধারা, সেই রক্তধারায় হিন্দি অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে— মৌলিক অধিকার, ধারা পঁচিশ, সকল ব্যক্তিরই বিবেকের স্বাধীনতায় এবং স্বাধীনভাবে ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারে সমান অধিকার থাকবে।

এক-দেড় মাস ধরে এডিটিং সহ ছবিটির নির্মাণ সংক্রান্ত নানা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে থাকতে থাকতেই মইনুল ক্রমশ ডিপ্রেসনে ভুগতে থাকে।

একদিন ফোনে ডাকল আমায়, সন্ধ্যেয় নন্দনের সামনে পুকুরধারে বসলাম আমরা। একনজরেই ওকে বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছিল, কথার সুরে চোখের ভাষায় ছেয়ে আছে অবসন্নতা, ক্লান্তি।

দু-এক কথার পর মইনুল বলল, ছবিটা আমার করা কি উচিত হবে?

মানে?

মানে আমি একজন মুসলমান, সংখ্যালঘু; তাই গুজরাটে অত্যাচারিতরা যখন মুসলমান সে কথা আমি বললে কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? মনে হবে না যে আমি বাড়িয়ে বলছি কিংবা ঘটনার গভীরে না গিয়ে একচোখো হয়ে একটা সাইড নিয়ে নিচ্ছি।

তুমি হঠাৎ এমন বোকা বোকা কথা বলছ কেন? তাছাড়া তুমি তো ম্যাগাজিনে কোনো আর্টিকেল লিখছ না, সরাসরি তুলে ধরছ অত্যাচারিতদের কথা, প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা নানাভাবে যারা বিষয়টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন তাদের কথা—সেখানে ম্যানিপুলেট করার স্কোপ কোথায়?

না, মানে আমি শুধু গুজরাটের পোগ্রোম নিয়েই তো বলতে চাইছি না, আমি চলে যাচ্ছি গান্ধীহত্যা, দেশভাগ, কিংবা আরও পেছনে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের জন্মলগ্নে—আমি মানে যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরই—মানে একদম রুটে গিয়ে—

কথা শেষ না করে চুপ করে গিয়েছিল সে।

আমি বললাম, তোমার দৃষ্টিকোণ, বিশ্লেষণ—এসব থেকেই বুঝে নেওয়া যাবে যে কোনো ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে তুমি—সেকুলার মূল্যবোধকে তুমি—

মইনুল আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, সেকুলার! আচ্ছা, এই সেকুলার চিন্তা কি আমরা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার থেকে পেয়েছি? মানে, কবীর শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন কিংবা বাউল লালন—পাশ্চাত্য থেকে আনা সেকুলার চিন্তায় এঁদের স্থান কী? এই মুহূর্তে কী বলা উচিত আমাদের? যে কোনোরকম রিলিজিয়নের সম্পূর্ণ বর্জন নাকি ধর্মের মানবিক মুখ—দীন এলাহি, ধর্ম সমন্বয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পাল্টা মানবিক ধর্মের জয়গান—আমি কি এক্সপ্লেইন করতে পারছি?

এবার আমি চুপ ছিলাম কিছুক্ষণ, তারপর বললাম, এ সব নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলতেই পারে কিন্তু তা বলে এর সঙ্গে ছবিটা বানানো না-বানানোর কী সম্পর্ক? কী সম্পর্ক তুমি হিন্দু না মুসলমান না খ্রিস্টান এসব প্রশ্নের?

এ কথার উত্তর না দিয়ে মইনুল বলল, আমার এক একসময় মনে হয় দেশভাগের পর পাঞ্জাবের মতো গোটা দেশের সর্বত্র যদি সম্পূর্ণ বিনিময় ঘটে যেত—ভারত, পাকিস্তান কোথাও আর সংখ্যালঘু বলে কিছু থাকত না—তাহলে আর এভাবে—

তাই কি? খালিস্তানের নামে পাঞ্জাবে এত রক্ত ঝরল কেন তাহলে? শিয়া বনাম সুন্নির লড়াই কেন? কেন আগুনে পুড়ে যায় হরিজন বস্তি? গ্রাহাম স্টেইনসকে পুড়ে মরতে হয় কেন?

নন্দন-টু-র শো শেষ, সাম্প্রদয়িকতা বিরোধী কিছু শর্ট ফিল্ম ও ডকুমেন্টারির প্রদর্শনী চলছিল সপ্তাহ জুড়ে, বেরিয়ে আসা দশকের দিকে তাকিয়ে মইনুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

কী হবে ছবিটা বানিয়ে? নন্দন-টু কিংবা ম্যাকসমুলার ভবনে একটা দুটো শো, বিদেশে বিক্রি, দু-একটা পুরস্কার...অর্থহীন, পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন!

মইনুলের সেই 'হা রাম'! লেখা ফাইলটার ভেতরে সবশেষে একটা পাতলা ডায়েরি পেয়েছিলাম। প্রথম পাতায় একটি কবিতা—কয়েক লাইন পড়তে পড়তেই মনে পড়ল, এ তো মইনুলেরই লেখা, সেই তেরো চোদ্দ বছর আগে, আমাদের ফিল্ম সোসাইটিকেন্দ্রিক তুমুল আড্ডার দিনে শুনিয়েছিল আমাকে —সম্ভবত কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'অভিমুখ' নামে একটা ছোট পত্রিকায়, যে পত্রিকায় ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' নিয়ে ছোট একটা নিবন্ধ লিখেছিলাম আমি।

কবিতার পরে ডায়েরির পাতায় আত্মকথন মইনুলের, বেশি নয় দশ-বারো পাতা। তারপর একপাতা জুড়ে শুধু লেখা 'হায় রাম'! কয়েক পাতা জুড়ে এরপর একটি বাক্য লেখা রয়েছে একবার করে, বাক্যটি হল—তিস্তার বন্যায় আমি কি ভেসে ভেসে ডুবে যাব?

আত্মকথনের একটা অংশে ও লিখেছে 'তিস্তা বলে আমি নাকি বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ, আচ্ছা, সৎ আবেগ ছাড়া কেউ সৃষ্টিশীল হতে পারে? যুক্তির নামে বাস্তববাদী হওয়ার নামে তিস্তা নানারকম আপসের পথে চলতে চেয়েছিল—এ ফাঁকি আমি সহ্য করতে পারিনি। যে আত্মীয়রা আমাদের বিয়ে মেনে না নিয়ে আমাদের একঘরে করতে চেয়েছে, তারা কীসের আত্মীয়, কেন সম্পর্ক তৈরি করতে অনুনয় বিনয় করব তাদের?'

তিস্তার কাছেই শুনেছি, বন্যার জন্মের পর তিস্তার মা-বাবা নাতনি ও মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জামাইকে বাড়ি ঢুকতে দেওয়ার ব্যাঁপারে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, মইনুলের গভীর অভিমান ছিল এতে। তিস্তার বক্তব্য ছিল প্রথমে মেয়ে ও নাতনিকে দিয়ে শুরু হলেও সম্পর্ক তৈরি হলে আস্তে আস্তে শেষ পর্যন্ত জামাইকেও মেনে নেবেন ওঁরা। তাছাড়া, মইনুল প্রায়ই পেশার কারণেই সাত-দশদিন চলে যেত কলকাতা ছেড়ে দিল্লি, বম্বে, তখন আত্মীয় পরিজনহীন অবস্থায় ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে তিস্তা বাস্তবিক অসহায় বোধ করত। মইনুলের অজান্তেই তিস্তা বাপের বাড়ি যাতায়াত শুরু করে। যতদূর জেনেছি ওদের সম্পর্কে ফাটল প্রথম এই নিয়েই শুরু হয়েছিল।

তিস্তা আমায় বলেছিল, ওকে নিয়ে সংসার করা অসম্ভব, যা রোজগার করত পুরোটাই খরচ করে ফেলত, একপয়সার ব্যাঙ্কবালান্স ছিল না ওর, বাইরে এখানে ওখানে গরিব মানুষদের সব বিলিয়ে দিয়ে এসে ধার করে বেবিফুড কিনত! এসব মানুষকে বাইরে থেকে হাততালি দেওয়া যায় কিন্তু সঙ্গে নিয়ে ঘর করা যায় না।

আত্মকথনের আরেকটি অংশে মইনুল তার দোতলার বাড়ি, দাদি, আম্মা, ছোটবুবু, বন্ধু আরাবুল এদের সম্পর্কে দু-এক কথা লিখেছে। লিখেছে দাদির মুখে শোনা জেনপরির কথা, লিখেছে ইনসানকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া আজরাইলের ছায়া কীভাবে রাত হলেই তার

বিছানার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছেড়ে মইনুল তার অসমাপ্ত ছবিটি ঘিরেও লিখেছে কিছু কথা, "এইসব বীভৎস দৃশ্যের প্রচারে কি আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বেড়ে যাবে আরও, সংখ্যালঘু মুসলিম জনতা কি নিরাপত্তাবোধের অভাবে দলে দলে নাম লেখাবে মৌলবাদী সংগঠনে? মুসলিম যুবকেরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বনে যাবে সন্ত্রাসবাদী? ...আমি কেন শুধু গুজরাট গিয়ে বলব? বাংলাদেশের অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের কথাও তো বলা উচিত আমার, নয় কি? প্যালেস্তাইন থেকে পাকিস্তানের মুজাহিদিন সকল সংখ্যালঘুর কথাই তো বলা উচিত আমার? আচ্ছা, বাংলাদেশের শাহরিয়ার কবিরের একটা সাক্ষাৎকার জোগাড় করলে কেমন হয়? ...শিল্প-টিল্প নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে খুব সোজাসুজি আমজনতার কথা ভেবে ছবিটা বানানো উচিত নয় কী? কবিতার ছন্দে, ক্যামেরার ফ্রেম-কম্পোজিশনে, অনবদ্য সুরের মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে দর্শক পাশবিক হিংসা বীভৎসার কথা ভুলে যাবে না তো? শিল্পসুষমার তলায় চাপা পড়ে যাবে না তো দানবীয় অসভ্যতা? ...ইন্টারনেটে 'দি হিন্দু' পত্রিকার ৬ মার্চ, ১৩ সংখ্যায় রাধিকা দেশাইয়ের লেখাটা পড়লে অন্য একটা দিক চোখে পড়ে। তিনি লিখেছেন আজ গুজরাটে যা হচ্ছে ভবিষ্যতে গোটা দেশেই তা হতে পারে। পুঁজিবাদী বিকাশের বিচারে গুজরাটই দেশের মধ্যে সবথেকে এগিয়ে। এখানে উচ্চ ও মধ্যবর্ণের হিন্দুদের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে। ১৯১৩ সাল থেকে ধারাবাহিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যখন থেকে গুজরাটের রাজনীতিতে উচ্চবর্ণ ও ধনী শ্রেণী হিংসাত্মক উপায়ে তাদের রাতনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা শুরু করল তখন থেকেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু। তিনি আরও লিখেছেন, গুজরাট এতই শিল্পোন্নত যে গ্রামের ধনীরাও শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে। অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানে গ্রামের ধনী ও শহরের শিল্পপতির মধ্যে কার্যত কোনো ফারাক নেই। গুজরাটে যে নয় শতাংশ মুসলিম বাস করেন তাঁদের মধ্যেও কিছু বুর্জোয়া আছেন। হিন্দু বুর্জোয়াদের সঙ্গে এদের ব্যবসায়িক রেষারেষি আছে। দাঙ্গার সময়ে তার ফয়সালা হয়ে যায়।"

আত্মকথনের এইসব অংশ পড়লে মনে হয় না মইনুল আদৌ কোনো ডিপ্রেসনে ভুগছে। শুধু শেষ পাতাটিতে মইনুল লিখেছে 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবীটা ক্রমশই মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানের বোধহয় বাঁচার আর কোনো পথ নেই। হয় সন্ত্রাসবাদী হয়ে পুলিশ-সেনার গুলিতে মৃত্যু নয়তো গণনিধনের শিকার হওয়া। আর একটা পথ আছে, হাতেপায়ে ধরে ফ্যাসিস্টদের দলে নাম লিখিয়ে দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। তিস্তা, বন্যা ওরাও দূরে চলে গেছে, সে হয়তো একরকম ভালোই হয়েছে—না হলে আমার জন্যে হয়তো ওদের ভুগতে হবে সারাজীবন। এমনকি হিন্দু মা ও মুসলমান বাবা এরকম অনাসৃষ্টির সন্তান হওয়ায় ওর শাস্তি আরও বেশি নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষে।'

আত্মহত্যার একমাস আগে মইনুলের সঙ্গে যে ক'বার দেখা হয়েছে, সে প্রায় মৌন হয়েই থাকত। মাঝে মাঝে কবীরের দোঁহা শোনাত। কিংবা শোনাত উপনিষদের দু-একটি শ্লোক।

সুইসাইড নোটে সে শুধু তার দেহটি কবর না দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছে। তার শেষ ইচ্ছা অবশ্য নানা কারণে, পোস্টমর্টেমের ঝক্কি-ঝামেলা পেরিয়ে তার পরিবারের লোকজন আর পূরণ করে উঠতে পারেনি।

ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা মইনুলের সেই কবিতাটি এখন আমার প্রায়ই মনে পড়ে —

আমাদের শ্যামলিমা কতটা উষর হয়ে গেলে বল
স্বপ্নছাই দুপায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে
হেঁটে চলে যাওয়া যায় বহুদূর!
এখন রৌদ্র, খরতাপ
কেবলই বয়ে যায় খরালি বাতাস,
গনগনে দিনের বিচিত্র উল্লাসে
রৌদ্র ফণা মেলে আছে আজ—
চারিদিকে বুদ্ধি মেধা জ্ঞান
বোধহীন জ্ঞানের প্রতাপ,
বৃক্ষের অহংকারে মেতে আছে মেধাবী ঘাসের দল,
স্বর্গসুন্দরীদের দু'চোখ
শক্তহাতে ঢেকে রাখে শিশুঘাতী শেয়ার দালাল,
অলিগলি রাজপথ ধরে
প্লাস্টিকের ফুল ফেরি করে করে
অলৌকিক শাড়িগুলি নীলছবি হয়ে যায়
এসো মেঘরস
বৃষ্টি শবনম
সব পুরুষ বৃহন্নলা হয়ে গেলে
নারীকে কে দেবে বল জন্মবীজ!

জলবিম্ব

দুপুর হেলে পড়ছিল ধীরে।

তন্দ্রা ছিঁড়ে সবে জানলার ধারে এসে বসেছিল সুমন, তখনই দেখতে পেল তাকে আবার। পুকুর থেকে উঠে ছায়ার মতো ভাসতে ভাসতে সে যেন হারিয়ে গেল গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর।

সে কি আসবে, এখানে, এই জানলার পাশে? উত্তরের জানলা দিয়ে শিরশিরে বাতাস, চাদরটা খুলে গোটা শরীর ভালোভাবে মুড়ে নেয় সুমন। গুটিগুটি পায়ে শীত এসে গেল, টের পায়।

প্রায়-পঞ্চাশের সুমন, চশমা খুলে শার্টের ডগায় মুছে নিতে নিতে একটু কি কেঁপে ওঠে? শীত কি আজ বেশি নাকি শরীরের দুর্বলতায় জবুথবু হয়ে পা মুড়ে বিছানায় বসে পশ্চিমের জানলা দিয়ে অলস চোখ মেলে রাখে পুকুরপাড়ে, ঝোপঝাড়ে, গাছপালার ফাঁকে, বোসেদের ভাঙা-পাঁচিলের গায়ে।

কপালে নুয়ে পড়ছিল চুলের বোঝা, বেশিটাই সাদা, হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে সুমন বোধ করে কালকেই চুল কাটানো জরুরি। সাতদিন হল বাড়ির বাইরে পা পড়েনি তার, পাঁচদিনের জ্বর শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে গেছে।

পশ্চিমে ফোটা রোদ জানলার গ্রিল বেয়ে বিছানায় তার শরীরময় বেঁকেচুরে গড়িয়ে পড়তে চাইছিল। কেন জানে না, স্কুলে বেরুনোর আগে শম্পার ঝাঁঝমাখা কথাগুলো মনে পড়ে গেল হঠাৎ—চিরদিনই তুমি ক্যালাস টাইপের, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত যেন আরও... চেহারাটা করে রেখেছো সাত বুড়োর এক বুড়ো—আরও কী কী যেন বলতে বলতে বেরিয়ে পড়েছিল শম্পা। কত বছর কাটল একসঙ্গে দুজনের? সামনের মাসে কুড়ি পেরিয়ে একুশে পড়বে, নাকি তার সঙ্গে যোগ করে নেবে আরও আট বছর, বিয়ের আগের সেইসব ভালোবাসাবাসি!

সাহারা মরুভূমি বাড়ছে ক্রমশ, জান?

ফিসফিসে স্বরে কথাটা যেন জানলার ওপাশ থেকে ভেসে এল, অবাক হয় না সুমন, শুধু শরীরটা জানলার আরও কাছে হেলে যায়। অবাক হয়েছিল প্রথমদিন, সে তো তিন-চারদিন আগে, গায়ে জ্বর লেপটে ছিল তখন, এমনই দুপুর। ভেবেছিল জ্বরের ঘোরে ভুলভাল শুনেছে, তারপর রোজই দুপুরে, অবাক হয় না আর।

কথা শোনে, ইচ্ছে হলে উত্তর দেয়, কথার পিঠে বাড়িয়ে যায় কথা, কখনও চুপ করে শুনে যায় শুধু। কাল থেকে তার যাওয়া আসার একটা আভাস পাচ্ছে দূরে পুকুরপাড়ে, গাছপালার ছায়াছন্নতায়।

সে ছাড়া কেউ তো থাকে না এ সময় বাড়িতে, শম্পার স্কুল, শাওনের কম্পিউটার ক্লাস,

কে থাকবে আর?

সত্যিই আমি একটা ক্যালাস, অপদার্থ, কী করলাম সারাটা জীবন? ধীরে চলা নিঃশ্বাসের সঙ্গে এসব কথা উচ্চারণ করে ফেলতে পারে সুমন নিজের ভেতরে।

এ জমি কেনা, ছোট বাড়িটা করতে যা টাকা তার তিনভাগই তো দিল শম্পা। শুধু বাড়ি? কুড়ি-একুশ বছরের দাম্পত্যে সংসারের বেশি খরচটাই তো—ওর স্কুলের চাকরিটা না থাকলে যে কী হত! গাড়ির ব্যবসা, অর্ডার সাপ্লায়ার, কনট্রাকটারি থেকে এখন জলের বোতলের ডিস্ট্রিবিউটারশিপ— কোনকিছুতেই সুবিধা হল না, এতদিনে যখন হল না আর হবেও না কোনদিন—এইসব ভাবতে ভাবতেই ফিসফিসে স্বরে আবার শুনতে পেল সুমন, সাহারা মরুভূমি বেড়েই চলেছে, জান?

তাই?

জান কি?

হয়তো জানি।

মাত্র চার হাজার বছর আগে ওখানে জল ছিল।

কোথায়?

সাহারা মরুভূমিতে।

ও। চার হাজার? সে কি মাত্র হল?

মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে কত হাজার বছর ভেবেছ কি?

তা বটে, সে ভাবে ভাবলে অবশ্য—জল শুকিয়ে গেল কেন?

উত্তর আসে না, উত্তরের জানলা দিয়ে হালকা পায়ে বাতাস ঢোকে। জল কেন শুকিয়ে যায়? জান না তুমি সুমন? ভন্ডামি শিখেছ বেশ, না? ভাবতে ভাবতে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

পুকুর বোজানো জমি না হলে এ শহরের ভেতর কোথায় পেতাম জমি। হোক স্টেশন অনেকটা দূর, তবুও জন্মশহর ছেড়ে যেতে হয়নি তো। দামেও কিছুটা সস্তা হয়েছে। আর পুকুর বুজিয়ে কত জল শুকোবে, চার হাজার বছর আগেও কি প্রমোটার ছিল? কে বানালো সাহারা মরুভূমি?

ঠিক, ঠিক, ডেকে ওঠে টিকটিকি। দক্ষিণের দেওয়ালে টাঙানো মা-বাবার ফটোটার নিচ থেকে তরতরিয়ে ওপরে উঠে যায় নধর টিকটিকিটা। সাদা-কালো ফটো, ওদের যৌবনবেলার, সাদা সাদা ছোপ ধরে গেছে। মায়ের ঘোমটা দেওয়া গম্ভীর মুখ, বাবার মুখে চিলতে হাসি। মায়ের হাসিমুখ কল্পনায় আনতে পারে না সুমন। এই ছবিটাই স্মৃতি হয়ে ভেসে আছে, পাঁচবছর বয়েসে শেষ দেখা মায়ের অন্য কোন মুখ কীভাবে স্মরণে আনতে পারে সে? কিছুই তো মনে পড়ে না মাকে নিয়ে, সত্যিই কি মা ছিল? এই ফটোটাই তখন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মায়ের একটা কথা, খুব নিশ্চিত নয় সে যে এটা মায়েরই কথা, তবু মনে হয়।

ক্ষীণ স্বরে সে কথাটা যেন শুনতে পায় সুমন, এ ছেলেটাকে নিয়ে যে কী করব আমি? সদাই যেন অন্য কোথায় পড়ে রয়েছে, একডাকে সাড়া দেবে না কোন সময়, ক্যাবলা কার্তিক!

ক্যাবলা কার্তিক বলার সময় কি গলায় একটু উদ্বেগ ছিল, ছিল মায়া কিংবা স্নেহ? মমতার ছায়া?

মমতার ছায়া খুঁজতে খুঁজতেই সে কাটিয়ে দিল কি এতগুলো বছর? শম্পা কি তাকে দেয়নি ছায়া? এতটা ভেবে নেওয়া কি ঠিক হবে? সে যদি তার প্রায় না-পাওয়া মাকে খুঁজে ফিরতে চায় শম্পার ভেতর, তার মতো একটা অপদার্থকে কি সে ছায়া দেওয়া সম্ভব শম্পার পক্ষে? অর্থের জোগান দেওয়া থেকে সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা সব সামলাতে সামলাতে শম্পা কি সাহারা মরু—কথাটা গিলে ফেলতে গিয়ে বিষম খায় সুমন।

দাদার কথাই মেনে নেওয়াই উচিৎ ছিল তার। গাড়ির ব্যবসা লাটে গেল, ড্রাইভারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল অনেকটা, বিশ্বাসের দাম চুকোতে হল, আজ এ পার্টস গায়েব তো কাল আরেক, ঘন ঘন গ্যারেজে কাজ, অ্যাকসিডেন্ট, ব্যাঙ্কের তাগাদা, লোনশোধের—তখন বেচে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? দাদা বলেছিল, চলে আয় আমার এখানে, মোটামুটি মাইনের চাকরি করে দিচ্ছি, তোর দ্বারা আর যা-ই হোক ব্যবসা হবে না।

শুনল না সে, বড়দের সদুপদেশ শুনলে কি এই হাল হয় তার? বাংলা ছেড়ে, নিউবারাকপুর ছেড়ে কোথাও যাবে না, দাদার ওখানে মানে গাজিয়াবাদ, বাপরে! সে তো অনেকদূর। কী আছে এখানে? সুমন বলেছিল, শম্পার কী হবে? স্কুলের চাকরি ছেড়ে—

কথা শেষ করতে দেয়নি দাদা, বলেছিল, সে ভাবনার ভারটা না হয় আমাকেই দে, তিন-চার বছরের মধ্যেই তোকে এনে দেব কলকাতায়।

তিন-চার বছর মাত্র, অথচ তবু সে কিছুতেই বাইরে গেল না? কেন, কী আছে এখানে, এ শহরে, এ প্রদেশে? বলার মতো কিছু কারণ সে খাড়া করেছিল, তখন বিয়ে হয়েছে বছর চার-পাঁচ, শাওন ছোট—এ সবই তা বলেছিল সে, কিন্তু সেগুলো কি আসল কারণ? এখানে তখন বাবা বেঁচে, মেজদা মেজবৌদি, কোন অসুবিধাই হত না শম্পা-শাওনের।

জলের আরেক নাম মরণ, জানো?

ফিসফিসে স্বরটা কেমন যেন গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে গেল চারধারে। দুপুর হেলে গড়িয়ে পড়েছে প্রায় বিকেলের গায়ে। জলের আরেক নাম জীবন, চিরকাল তাই জেনে এসেছে সে, জল-মরণ, না না, এ কেমন কথা!

কী একটা ভাঙা ভাঙা সুর ভেসে আসছে, সুর না কি কান্না? তা কি উঠে আসছে ওই পুকুরের ঘোলা জলের গভীর থেকে?

যখন জল না পেয়ে মরে যাবে তুমি, কী বলবে তাকে, মরণ নয়?

তা কেন? জল না পাওয়া মানে—ঠিক ঠিক শব্দটা ভেবে পায় না সে, খরা বলবে কি? না কি বলবে শুখা, বলবে মরু?

জলহীন একটা দেশের কথা ভাবতে গিয়ে একটা জায়গার নাম মনে পড়ে যায়, রাজস্থান। এই তো; বছর দুই আগে, শম্পা আর শাওন, শম্পার স্কুলের কলিগদের সাথে ঘুরে এল। সুমন যায়নি। বলেছিল, মরুভূমি দেখতে ভালো লাগে না আমার!

শাওন ঠোঁট উল্টে বলেছিল, রাজস্থান মানেই মরুভূমি কে বলেছে তোমায়? আবু পাহাড়, উদয়পুর, এসবও তো আছে।

আসলে পকেটের মরুভূমির কথা বলতে চায়নি সুমন, এক-একজনের তা প্রায় সাত-আট হাজার টাকার ধাক্কা। শম্পা-শাওনের কথা না হয় ছেড়ে দিল, নিজের টাকাটা অন্তত দিতে হত তো তার, তাই মরুভূমির আড়াল নিয়েছিল।

সামনের এই পুকুরটাও হয়তো কোন একদিন ভরাট হয়ে যাবে। বাড়ি উঠবে। ঘোলা হোক, নোংরা হোক, তবু তো জল! তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়া আছে, ঘিরে কিছু গাছ আছে, ছায়া আছে, সব মিলিয়ে কেমন ওর মায়া মমতা স্নেহ। গন্ধ আছে কি জলের? জলের না থাক, জলে ভেজা মাটি, জলজ লতাপাতা থেকে কেমন এক গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, টের পায় সুমন।

অপদার্থকে অবজ্ঞা করে সবাই, স্বাভাবিক, যত বড় হয়ে উঠছে তত শাওনও কেমন যেন—বুকের ভেতর চিনচিন ব্যাথা বোধ করে সুমন। আমার যদি মেয়ে থাকত একটা?

ভাবতেই বুকের ভেতর জলহীন, শুকনো খটখটে একটা দেশ ক্রমশ হু হু করে বাড়তে থাকে। এই পৃথিবীর মতো মানুষের শরীরেরও কি বেশি অংশটাই জল দিয়ে তৈরি? জানেনা সুমন, শুধু জানে শরীরের সব জল শুকিয়ে গেলে পড়ে থাকবে একটা শক্ত কঙ্কাল!

আমার যদি মেয়ে থাকত—এ ভাবনা আজকাল প্রায়ই কুরে কুরে খায়। এ বংশে মেয়ে নেই কোন, মরুভূমি যে কতদিকে সরে আসে, বাড়তে থাকে। কোথাও কোন ছোট মেয়ে দেখলেই ভারি আদর করতে ইচ্ছে হয় সুমনের। বন্ধু অভয়, ওর মেয়েটিকে সবে কাছে টানতে শুরু করেছিল, কাকু কাকু করে মেয়েটিও ছুটে আসত। শম্পা পছন্দ করেনি ব্যাপারটা, বলেছিল, পরের মেয়েকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা কীসের?

মেঘলা মুখে সুমন বলেছিল, শিশুর কি আর আপন-পর জ্ঞান থাকে?

শিশুর থেকে তার পাতানো কাকারই সে জ্ঞান কম মনে হয়!

কে আপন, কেই বা পর?

তার মানে? নিজের ছেলেকে নিয়েও তো কোনদিন এত আদিখ্যেতা করতে দেখিনি!

চুপ করে গিয়েছিল সুমন। ইচ্ছে হলেও বলতে পারেনি, ছেলে কি আমার? আমার ঔরসে জন্ম হলেও আমার নয়। একটু বড় হতে না হতেই ও জেনেছে বাবা একটা ক্যাবলা কার্তিক, ফালতু লোক, রোজগারপাতি সামান্য। দেখেছে, সংসারে মা-ই সব, ক্রমশ অবজ্ঞা করতে শিখেছে আমায়।

ক্ষীণ সুর ভেসে আসছে, শুনতে পায় সুমন। যেন কতদিনের চেনা সুর, চিনতে পারে না।

আমার যদি মেয়ে থাকত একটা, সেও কি আমায় এমন করত, নাকি ছায়ায় ছায়ায় ভরে দিত, পরিষ্কার না হোক অন্তত ঘোলা জলে ভিজিয়ে দিত আমায়। আমি তার নাম রাখতাম,— কী নাম? ধর, রাখতাম, বর্ষা কিংবা টাপুর,—এইসব ভাবতে ভাবতেই সুমন দেখতে পেল জানলার সামনে দিয়ে কালো হলুদ ছোপ ছোপ দুটো প্রজাপতি উড়ে গেল জলের দিকে, পুকুরের দিকে।

আচ্ছা, আমার কি মেয়ে হতে পারে না? শম্পার সঙ্গে অবশ্য শরীরের সম্বন্ধটা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে বলা যায়, সুমনেরও যে শম্পার কাছে যেতে ইচ্ছে করে তা নয়। আসলে মনের মিল না থাকলে, তাছাড়া ওর শরীরও তো ভালো নয়, হাই ব্লাড প্রেসার, পিরিয়ডও বন্ধ হয়ে গেছে কয়েকমাস হল, এই সময়টায় মানে এই বয়েসে মেয়েদের নানা জটিলতা— হেসে ফেলে সুমন। আমি কী যে যা-তা ভাবছি, শম্পা কী করে মা হবে? আর হওয়ার মতো শরীর থাকলেও কি এই বয়েসে এমন উদ্ভট আবদারে রাজি হত সে?

রোদ্দুরের রং ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছিল, তার মধ্যে কি কোথাও ফিকে কমলা একটা আভা, আর সে আভা ছড়িয়ে পড়ে কি পুকুরময় বুদবুদ তৈরি হচ্ছিল? ছোট বড় নানা বুদবুদে ভরে উঠছিল সারা পুকুর, লাল নীল সবুজ হলুদ কত রঙের ফেনা!

চারহাজার বছর আগে সাহারা মরুভূমিতে কত জল, কত পাখি, কত গাছ আর সেখানে এখন শুধুই বালি, পাথর, কেন জান?

কথাগুলো যেন ওই পুকুরের ভেতর থেকে ভাসতে ভাসতে ভাঙা লোকগানের করুণ সুর হয়ে সুমনের কানের পাশে গুণগুণ করতে লাগল।

কেন জল শেষ হয়ে গিয়েছিল সাহারায় জানে না সুমন, কী করে জানবে? সে তো জ্ঞানী মানুষ নয়, সে তো কাজের মানুষ নয়, এই অকেজো পৃথিবীতে সে বড় বেমানান, অলস অপদার্থ কল্পনাবিলাসী! শহরের ভিড়ের মধ্যে ঠেলে গুঁতিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সে বরং নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যেতে চায়! তার দাদারা, বন্ধু-বান্ধব, প্রত্যেকেই কত সফল পুরুষ অথচ সে? নেহাৎ কোম্পানিটা নতুন, তাই বোতলবন্দী জলের ডিস্ট্রিবিউটারশিপটা রয়েছে তার, বিক্রির যা হাল, কদিন থাকবে বলা যাচ্ছে না! একেবারেই করিৎকর্মা নয় সে, নিজের জিনিসটাই যে সবসেরা সবচেয়ে খাঁটি বাকি সব ভুষিমাল— একথাটা কিছুতেই জোর দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারে না সে।

সে শুধু দেখে যায়—কীভাবে কত লোকে কাজ করে যায়, জমি মাঠ ক্ষেত বাগান সব বিক্রি হয়ে বড় বড় বাড়ি ওঠে, চওড়া রাস্তায় সাঁ সাঁ করে মোটর সাইকেল কিংবা মোটর গাড়ি চেপে কাজের মানুষেরা কাজে বেরিয়ে যায়, তার এই চেনা শহরের কত ঘরে ঘরে ইন্টারনেটের তরঙ্গে ভেসে আসে কত জ্ঞানের কাজের লম্বা-চওড়া ফর্দ আর পৃথিবীতে জল কমে যায়, শুকনো বালিতে ভরে যায় পৃথিবীর শরীর-মন—সব।

জলের রঙিন বুদবুদ, ফেনা—ওই জলবিম্ব থেকে ধীরে ধীরে একটা মূর্তি তৈরি হয়ে

উঠছে, কার মূর্তি? সে মূর্তি কি প্রাণ পাচ্ছে একটু একটু করে? পুকুর থেকে উঠে গাছপালার ভেতর দিয়ে লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে একটা হালকা ছায়ার মতো সে কি জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো? কে সে? সে কি এক বালিকা?

পৃথিবীতে কত লোক জল অভাবে মরে যায় প্রতিবছর, জান? বালিকার ক্ষীণ স্বরে কেমন এক হাহাকার ঝরে পড়ে।

কত শিশু প্রতিবছর দূষিত জল খেয়ে মারা যায়, জান?

শুনতে শুনতে তেষ্টা পায় সুমনের, অথচ সে উঠতে পারে না, মমতার অভাবে, স্নেহের অভাবে, ভালোবাসার অভাবে তার শরীরের সমস্ত জলীয় অংশ কি শুকিয়ে যাচ্ছে? সেও কি ভালোবাসতে পেরেছে কাউকে কোনদিন? চাওয়া-পাওয়াহীন, কামনাহীন ভালোবাসা কি হয়? স্বামী হিসেবে পিতা হিসেবে সেই বা কী দিয়েছে শাওন কে?

কী দিয়ে যাবে সে শাওন কে? ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, ক্ষমতাবান লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ, কিছুই নেই তার। প্রত্যেক ছেলেই তো আশা করে তার বাবার কাছে কিছু না কিছু সে ও কি তার বাবার কাছে কিছু আশা—কী চেয়েছিল সে?

মা যখন চলে গেল দাদা তখন পনেরো-ষোলো, মেজদা আরও তিন-চার বছর কম, দুজনেই ভালো ছাত্র, ওরা ওদের পড়াশোনা নিয়ে থাকত। বাড়ির কর্ত্রী হয়ে উঠল বাসনা পিসি, রাঁধাবাড়া সংসার সব দায়িত্ব তার, রাত আটটার পরে বাড়ি চলে যেত, ফের চলে আসত ভোরে। বাবা প্রায়দিনই বাড়ি ফিরত অনেক রাতে, তখন ভাবতাম কেন? পরে শুনেছি অফিসে ওভারটাইম কাজ করত, ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার ছিল, কোন কোন দিন ছবি দেখে ফিরতেও রাত হত। রবিবার সকাল থেকেই বাজার-দোকান, বিকেলে তাসের আড্ডা। দিনগুলো, রাতগুলো বছরের পর বছর কীভাবে যে কাটত আমার? সংসার বলে কিছু ছিল কি? যে যার নিজের জগত নিয়ে ব্যস্ত, বাসনা পিসি, বাবা, দাদা সবাই যে যার কাজে ফাঁকি দিত না এতটুকু, অথচ তাদের মাঝে থাকতে থাকতে আমি কেমন অকেজো হয়ে গেলাম। একটু কথা, একটু ভাব-বিনিময় যা কিছু তা মেজদার সঙ্গে, মেজদা বলত, যার মা নেই তার কেউ নেই, মনখারাপ করিস না, পড়াশোনার মধ্যে ডুবে যা, দেখবি ভালো লাগবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। মেজদা তার মতো করে ভাবত, কিন্তু আমার যে পড়াশোনায় মন লাগত না। আমি কি বাবার সঙ্গ চাইতাম? বাবা আমায় বুকের ভেতর টেনে দিয়ে আদর করুক, তাই চাইতাম? আমি যখন বাবা হলাম, ছোট্ট শাওনকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে—কিন্তু একটু বড় হতে না হতেই সে যে কোন দূরে অনেক দূরের একটা দ্বীপ হয়ে গেল—এইসব ভেবে নিতে নিতে সুমন দেখছিল পড়ন্তবেলার শেষ আলো-বাতাস পুকুর জুড়ে জলবিম্ব তৈরি করছে।

হালকা ছায়ার মতো সেই বালিকা জানলার ওধারে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল তিরতির, ক্রমশ যেন একটা ছোট্ট পাখি হয়ে আসছিল।

ছোড়দার কথা মনে পড়ে সুমনের। জড়বুদ্ধি, মনের বয়েস বাড়েনি তার, নিজের দাদা নয়, কাকার ছেলে। প্রথম কুড়ি বছর কাকাদের বাড়িতে থাকলেও, শেষ দশবছর একটা মিশনারিস হোমে রাখা হয়েছিল। মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে দেখা করতে গিয়েছিল সুমন, শীর্ণ হাত দুটো বাড়িয়ে ছোড়দা বলেছিল, আমায় একটা ছোট্ট পাখি এনে দিবি?

কী করবি পাখি দিয়ে?

একটু আদর, তারপর উড়িয়ে দেব।

আচ্ছা, দেব।

কথাটা যেন বিশ্বাস করেনি ছোড়দা, বলেছিল, কোথায় পাবি পাখি?

দেখি, কিনে এনে দেব না হয়।

ধ্যাৎ, পাখি কি কিনতে পাওয়া যায়! তারা তো গাছে থাকে, আকাশে ওড়ে। তুই কি ধরতে পারবি?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, কোথায় পাবি পাখি? মরুভূমিতে কি পাখি থাকে?

তাহলে, ছোড়দাই কি বলেছিল তারপর, পালা, পালা ছুটু পালা, সব মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে! জানিস সাহারা মরুভূমি বাড়ছে ক্রমশ!

কে বলল তোকে?

আমি জানি, আমি এখন রোজ স্নান করি, জানিস। আমাদের ফাদার বলেছে, পৃথিবীতে জল কমে আসছে, সব মরুভূমি হয়ে যাবে, মানুষ আর একটুও জল পাবে না।

সুমনের মনে হল জানলার ওপাশে পাখি হয়ে আসা বালিকাও যেন বলে চলেছে পৃথিবী জুড়ে জলের হাহাকারের কথা, জলহীন দেশের কথা।

সে কথায় কী এক সুর ছিল, বিন্দু বিন্দু কান্না যেন একটা সুরেলা সূক্ষ্ম তারের ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে।

সুমন ওই পাখি হয়ে আসা বালিকাকে বলতে চাইল, তুমি আমার মেয়ে হবে?

অথচ শুকিয়ে কাঠ তার গলা দিয়ে একটুও শব্দ বেরুল না।

রোদ্দুরের নিভন্ত পথ ধরে ভেসে ভেসে বালিকা আবার ওই পুকুরের জলবিম্বের মধ্যেই মিশে যাচ্ছিল।

সুমন বিছানা ছেড়ে উঠে দৌড়ে দরজা খুলে নেমে পড়তে চাইছিল পুকুরের জলে, সারা গায়ে মেখে নিতে চাইছিল জলকণা, জলবিম্ব দিয়ে গড়ে ওঠা বালিকার শরীরটুকু মমতায় জড়িয়ে নিতে চাইছিল।

পারে না, শুকনো বালি হয়ে তার শরীর ক্রমশ মিশে যেতে থাকে বিছানায়।

বিকেল

সাঁতরে পদ্মার এপার ওপার হওয়া—মনে পড়ে? সেই রাজশাহীতে—মনে পড়ে, পরেশ?

কে? কে বলল? বোজা চোখ দুটো আস্তে আস্তে মেলে ঘোলা দৃষ্টিতে চারপাশ দেখতে চেষ্টা করে পরেশ।

পদ্মা...রাজশাহী...সে সব কি এ জন্মের কথা! আমি কি জাতিস্মর? পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে আমার? বিড় বিড় করে পরেশ।

জৈষ্ঠ্যের বিকেল। রোদের দাপট ফুরিয়েছে সবে। ছায়াছন্ন ঘরে, ফ্যানের আগুনে-বাতাসের নীচে হাঁসফাঁস করতে করতে পদ্মায় গা ডুবিয়ে দেয় পরেশ। আঃ শান্তি!

রাজশাহী টাউনের ভুবনমোহন পার্ক, তার দক্ষিণে আমার লন্ড্রি, স্টুডেন্ট লন্ড্রি অ্যান্ড ফ্যান্সি স্টোর্স, মোক্তার আলির কাছে লন্ড্রির কাজ শিখেছিলাম, মোক্তারদা কী চমৎকার বাঁশি বাজাতো! সরোজ, হ্যাঁ, সরোজ আসত বাঁশি শিখতে —পদ্মায় গা ডুবিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে এসব ভেবে নিতে পারে পরেশ।

খাটের ওপর উঠে বসে, পেচ্ছাপের বেগ—এই এক জ্বালা! সারাদিনে রাতে কতবার যে ছুটতে হয়, অথচ বেশিরভাগ সময়েই কয়েক ফোঁটার বেশি হয় না, খাট থেকে নেমে এক পা এগোতেই লুঙ্গিটা খসে পড়ে, নিচু হয়ে তুলতে গিয়ে লাগে কোমরে, হাত দিয়ে লুঙ্গিটা ধরে নিয়ে ভেতরের বাথরুমের সামনে দাঁড়াতেই ভারী অস্বস্তি হয় পরেশের। দরজা বন্ধ দেখে মনে হয় কেউ বোধহয় গেছে, গায়ের জোরে দু-হাতে ধাক্কা মারতে ভেজানো দরজা খোলে আর লুঙ্গিটা পড়ে যায় আবার।

পরেশ সেনগুপ্ত। ভীমরতি পেরিয়েছে তাও বছর দশ হল, বিরাশি চলছে। চোখ, কান, কিডনি, প্রস্টেট—একে একে অনেকগুলি অঙ্গ ক্রমশ অক্ষম হয়ে পড়লেও আশিস ডাক্তার বলছে হৃদপিণ্ডটা নাকি ভারী সবল, ফলে জীবন দেবতাকে শেষ নমস্কার জানানো হয়ে উঠছে না।

অথচ চেনা-জানা যে জীবন সংসার, যাকে ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে নেওয়া যায় তা তো এখন পরেশের কাছে জৈষ্ঠ্যের দহনের মতোই দুর্বিসহ! শুধু চেতন-অচেতনের মাঝখানে, ঘুম ও জেগে থাকার মধ্যবর্তী অবস্থানটুকুতেই পরেশের কাছে জীবন খানিকটা মায়াময় অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই মায়াবী ঘোরের ভেতরই বারবার ঢুকে পড়তে চায় পরেশ, অথচ কারা যেন বারবার সেই নেশাঘোর ভেঙে দিয়ে যায়।

ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে এক-পা দু-পা করে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতে অনেকক্ষণ লাগে, দু-ধাপ ভেঙে একটু জিরিয়ে নেওয়া, আবার ওঠা তারপর।

অল্প অল্প হাওয়া ছাদে। শেতলপাটিতে বসে পেছনে দু'হাতের ভরে পিঠ কোমর এলিয়ে সামনে দু'পা টানটান মেলে দেয়।

স্টুডেন্ট লন্ড্রি অ্যান্ড ফ্যান্সি স্টোর্স, পঁচিশ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিলাম, সে তো উনিশশো চল্লিশ নাকি একচল্লিশ সাল, ঘর ভাড়া বারো টাকা, বারো টাকায় লন্ড্রি সাজানোর কাঠের র‍্যাক, আর বাকি এক টাকায় কাপড়ে দাগ দেওয়ার কালি।

তোর প্রথম খদ্দের ছিলাম আমি।

কে? ও, সরোজ, আমি তাহলে এখন সরোজের বাড়ির ছাদে নাকি সরোজ এসেছে আমার—যাকগে, হ্যাঁ আর্জেন্ট ডেলিভারির রেট ছিল দু-আনা, তোকে আমি এক আনা ছেড়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে সরোজ? সেমি আর্জেন্ট ডেলিভারি ছ পয়সা, অর্ডিনারি তিন পয়সা। মোক্তারদা খুব সাহায্য করেছিল, ওর কাছেই গরম কাপড় ধোওয়া, রিপু করা সব শিখেছিলাম। তখন তো কাঠের ইস্ত্রি, গোল, মাঝখানে ফাঁক। সারাদিন বাবা দেখাশোনা করতেন। সন্ধে থেকে আমি। তোর সব মনে পড়ে সরোজ?

সব কি আর মনে পড়ে? মোক্তারদার নাম মনে আছে, বাঁশির ধুন মনে আছে অথচ ওর মুখখানা কিছুতেই মনে করতে পারি না।

ভালো আছেন, দাদা?

কে? কে এল চায়ের ট্রে হাতে, লতা? ঘোলা দৃষ্টি প্রাণপণ স্বচ্ছ করার চেষ্টা করে পরেশ। লতা, লতাই হবে। পায়ে কি আলতা? গা ধুয়ে গলায় পাউডার, সিঁদুরের গোল বড় টিপ, সাদা শাড়ি, থান নাকি, লতা কি বিধবা—ধুর, কী করে? ওই তো সামনে বসে আছে সরোজ। না, লাল পাড় সাদা শাড়ি, সাদা খোলে কি ছোট ছোট ফুল—কেমন যেন আবছা হয়ে আসে।

নিন, চা নিন, চিনি দিইনি কিন্তু—সুগার কত এখন?

হ্যাঁ, লতা, লতাই। আপন মনে নিশ্চয়সূচক মাথা নাড়ে পরেশ।

নিমকি খেতে অসুবিধা নেই তো? বাড়িতে করা।

হাঁটু মুড়ে বসে পরেশ। লুঙ্গিতে চশমার কাচ মুছে নেয়।

তুই বিজন সেনকে তো চিনতিস?

বিজন—রেলে কাজ—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেদিন শুনলাম রেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, ওর পঙ্গু বউটার এখন বড় কষ্ট। বলতে বলতে সরোজ খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ির ওপর আলতো হাত বুলিয়ে নিচ্ছে, দেখতে পায় পরেশ।

বিকেলটা কেমন কালো হয়ে আসছে, অন্ধকার, কালো ম্যাক্সি পরে নাচছে ধেইধেই। সেই নাচ দেখতে দেখতে পরেশ বলে, রাণু চলে যাওয়ার পর আমিও তো একরকম পঙ্গু হয়েই আছি!

রাণু গান গাইতো বড় চমৎকার। কী সুরেলা গলা! আহা! 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়/আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যেজন ভাসায়...' এ গানটা কতবার যে শুনেছি ওর গলায়—সরোজের চোখেমুখে আশ্চর্য এক নরম রোদের রূপকথা।

লতা কি এক পলক ঘুরে দ্যাখে সরোজকে? নাকি চোখের ভুল পরেশের?

বিড় বিড় করে পরেশ, রাণু চলে গিয়ে আমিও একরকম পঙ্গু—হ্যাঁ, পঙ্গুই ভাবতে পারিস! সারাজীবন অফিস আর অফিসের পর সন্ধেয় রুগি দেখতে চেম্বারে। বাকি সবটাই তো রাণুর ওপর। রাণুর এগিয়ে দেওয়া লাঠিতে ভর দিয়েই বাকি জগৎটাকে চিনে নেওয়া। শেষের আগের দিন, মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজি ওয়ার্ডে কোমায় ডুবে যাওয়ার আগে শেষ কথা রাণুর—আমি বোধহয় চলে যাচ্ছি, ছেলের বিয়ে দিয়ে দিও তাড়াতাড়ি, বৌমা এসে তোমায়— শেষ শব্দগুলো মুখের ভেতরেই থেকে যায়।

তোর হাতে পড়ে রাণুর কিছু হল না, এত ভালো গাইতো—সরোজের স্বরে কি একরাশ বিষণ্নতা?

ছাড়ো না, এসব কথা কেন? দাদার মনটা আরও খারাপ হয়ে থাকবে—বলতে বলতে লতা কি রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়?

চশমাটা আবার মুছে নেয় পরেশ। সরোজ হাসে, প্রথমে মৃদু, তারপর উচ্চস্বরে। একটু দূরেই জড়ো করে রাখা প্রবীণ ইটের কালচে গন্ধ কিছু বুঝি ঝরে যেতে চায়।

অনেকের থেকেই অনেক ভালো গাইতো রাণু, এটা এখনও মেনে নিতে পারো না লতা? বলেই সরোজ আবার হেসে ওঠে।

যাঃ, আমি কি তাই বললাম? তুমি না—বলেই লতা মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ায়! আঙুলে কি খেলা করে ইমিটেশান হার?

বাবা, এই নাও তোমার রেডিও।

ছেলের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পরেশ, কোথায় সরোজ? কোথায় লতা? বিকেলে কোথায় বসে আছি আমি? হ্যাঁ, রে শ্যাম, তোর সরোজ কাকাকে দেখেছিস?

সরোজ কাকা? কী সব বলছ? সরোজ কাকা কি আছে, মাস দুই হল—

শ্যাম তথা শ্যামল হেসে মাথা নাড়ায়, বেড প্যানটা রেলিঙের ধারে জড়ো হওয়া ইটের ধারে রেখে বলে, আমি একটু পরে এসে নিচে নিয়ে যাব, একা একা নামার চেষ্টা করো না, আর পেচ্ছাপ পেলে—এই যে—এইখানে—বুঝেছ?

মাস দুই হল—'সরোজ, হ্যাঁ, সরোজ চলে গেছে, অথচ যেন মনে হচ্ছে, কালকে নাকি পরশু, বিকেলেই সরোজের ছাদে বসে আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ আড্ডা—নাকি সেসব আরও কয়েকমাস, নাকি দু-তিন বছর আগের কথা—সব কেমন আবছা লাগে পরেশের।

সরোজের ছাদে বসে সেদিনের বিকেলটাকে বড় কর্কশ লাগছিল পরেশের। কালো, মেদবহুল, ঠিক যেন বৌমার মতো, মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।

খেয়ে উঠে সবে বালিশে মাথা রেখেছিল। তখনও শরীরটা এত জবুথবু হয়ে পড়েনি। মন মেজাজে তেজ যথেষ্ট।

লম্বা জিভ বার করে হাঁপাচ্ছিল দুপুরটা। এঁটো ভাত কুকুরকে খাওয়াতে আ-আ-আ ডাক। মাঝে-সাঝে দু-একটা কা-কা রব। গলিতে পরিচিত হাঁক—কাচভাঙা, লোহাভাঙা,

শিশিবোতল বি-ক্রি-আ-ছে। বালিশে মাথা রেখে রাণুর ছবিতে। কাগজের মালা উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। পাশের ঘরে টিভিতে সিরিয়ালের রস জ্বালে জ্বালে ঘন থকথকে হয়ে আসছে—টের পাচ্ছিল পরেশ।

ঠিক তখন দু'বছরের নাতিটা বৌমার হাতে চড়-চাপড় খেয়ে কেঁদে ককিয়ে উঠল। বালিশ থেকে ঘাড় তুলে ডানদিকে ফিরেছিল সে—দুমদাম গায়ে হাত দিও না বৌমা, বাচ্চা মানুষ করতে গেলে ধৈর্য লাগে!

বোমা ফাটল তখনই, বৌমার চিল-চিৎকার।

চুপ করুন, একদম চুপ!

সত্যি কথা বললে গায়ে লাগে খুব, না!

কীসের সত্যি কথা? বসে বসে ল্যাজ না নাড়িয়ে বাচ্চাটাকে একটু ধরলে তো পারেন। তা না খালি জ্ঞান দেওয়া!

ল্যাজ নাড়া! জ্ঞান দেওয়া! শ্বশুরকে একটুও ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। মেজাজের পারদটা চড়চড় করে ওপরে উঠে গিয়েছিল পরেশের। গায়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ঠা-ঠা রোদে কোথায় আর যাবে? ঘুরতে ঘুরতে সেই সরোজের বাড়ি।

দরজা খুলে অবাক হয়েছিল সরোজ। ভর দুপুরে, এইভাবে হঠাৎ—কিরে কোনো খারাপ খবর নাকি?

কিছু না বলে, বাড়ির ভেতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল পরেশ। এবার এক নজর তাকিয়ে সরোজ বুঝেছিল বন্ধুটি কোনো কারণে রেগে আছে। এরকম হঠাৎ-রাগ অবশ্য সরোজের কাছে নতুন কিছু নয়, সেই বালক বয়েস থেকেই পরেশকে এরকমই দেখে আসছে।

এই কয়েকদিন আগেই একটু কথার পিঠে কথা। ভোরবেলায় হাঁটতে বেরিয়ে দুই বন্ধুর এটা-সেটা মামুলি কথার মধ্যেই পরেশ বলেছিল, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো সব স্বার্থপর, জানোয়ার!

মানেনি সরোজ, সে বলেছিল—কেন? ভালো-মন্দ সব যুগেই ছিল, আছে।

এরা নিজেদের বউ ছেলেমেয়ে ছাড়া কাউকে চেনে না, এরপরে দেখব তাদের ছেড়ে সব একা একা খোপের ভেতর বাস করবে!

তা যদি বলিস তাহলে তো—যৌথ সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসা তো আমাদের সময়েই তাই না? আমরা, যাদের বয়েস ধর সত্তর-আশির মধ্যে।

এইভাবে কথার পিঠে আরও কথা দুই বন্ধুর গলা চড়ছিল। শেষ পর্যন্ত 'তোর সাথে আর কোনো কথা নেই' বলে হনহনিয়ে এগিয়ে গেছিল পরেশ।

পরেশের মনে হল সরোজের ছাদে সেই বিকেলেই ফিরে গেছে সে, ওই তো দিব্যি সামনে বসে গুনগুন করে সুর ভাঁজছে সরোজ ব্যাটা! বেশ উদাস ভঙ্গিতে বলছে, বিকেলের একটা আলাদা সুর আছে, তাই না রে?

জানি না।

তুই কিছুই জানলি না রে! বলেই আবার গুনগুন করে—মধুর আমার মায়ের হাসি...

লতার এগিয়ে দেওয়া প্লেট থেকে কুচো নিমকি মুখে পুরে পরেশ বলে, ছেলেটা একবার খবর নিল না, সেই দুপুর আড়াইটেয় বেরিয়েছি, এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা।

সরোজ আকাশ দেখছিল। বেলা পড়ে আসার গন্ধ বয়ে আনা আকাশ। আকাশে চোখ রেখেই আস্তে বলে, সে জানবে কী করে যে তুই এখানে আছিস?

আন্দাজ করতে পারে না? ভরদুপুরে আমি আর কোথায় যেতে পারি? কে আছে আমার? —আপনার বড় মেয়ে কেমন আছে? —প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে লতা পরেশের মুখোমুখি চেয়ারে। মাটিতে বসতে পারে না, আর্থারাইটিসের ব্যথা।

আছে একরকম, মাস খানেক আগে একটা চিঠি পেয়েছিলাম, জামাইয়ের শরীর ভালো নয়, হার্টে নাকি দোষ পাওয়া গেছে!

দাদুভাই—আধো আধো স্বরে ডেকে পিঠে হাত দেয়, ঝিমলি, পরেশের নাতনি। বেশ কিছুটা সময় লাগে পরেশের অনেক দূরের কোন্ বিকেল থেকে আজকের বিকেলে ফিরে আসতে।

কোলে নিতে গেলে ছিটকে বেরিয়ে যায় ঝিমলি, ছাদময় দৌড়ে বেড়ায়। ঝিমলিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয় এ যেন তার ছোটমেয়ে মুন্না, ছোটবেলায় মুন্নাকেও দেখতে ঠিক এইরকম—মা-মেয়ের চেহারায় এত মিল। ঝিমলি কেন এখানে? হাঁরে তোর মাও এসেছে নাকি? তোরা কখন এলি?

আপন মনে খেলে বেড়ায় ঝিমলি, উত্তর দেয় না। মুন্না যেন সেদিন কী বলছিল? রাগারাগি করল, সেদিন নাকি অনেকদিন আগে—সব কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে।

রাগারাগি কী নিয়ে? কী নিয়ে যেন—ও, হ্যাঁ, ওর দিদিকে কিছু টাকা পাঠাতে বলল, জামাইয়ের চিকিৎসায় অনেক খরচ! আরে বাবা, আমার টাকা কোথায়? পেনসনের ক'টাই বা টাকা? তাছাড়া, কিছু টাকা তো রাখতে হবে, নাকি? এই বয়েসে অসুখ-বিসুখ করলে তখন—দাদার নামে বাড়ির উইল করে দিতে চাইছ, ভালো কথা—মুন্না বেণি দুলিয়ে রাগ দেখাচ্ছিল, আমার কিছু চাই না, কিন্তু দিদির টাকাকড়ির অবস্থা তো খুব ভালো নয়, দূরে থাকে, ওর জন্যে তোমার কিছু টাকা রেখে যাওয়া উচিত।

টাকা! কোথায় টাকা পাব? আগে চেম্বার থেকে কিছু আয় হত, এখন কত নতুন ভালো ছেলে এ লাইনে এসেছে, আমি ডি এম এস, এখন বি এইচ এম এস পাস করে নতুন ছেলেরা প্র্যাকটিশে নেমেছে। আগের মতো মাথাটাও খেলে না, নামেই চেম্বার, আসলে রুগি নেই। সকাল-সন্ধেয় দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব আসে, আড্ডা হয়।

হোমিওপ্যাথি পড়েছি কত কষ্ট করে। সেটা বোধ হয় ফিফটি ফোর। বিয়ে হয়নি তখনও। ডি এন দে-তে চার বছরের কোর্স। ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়তাম। সাতটা থেকে ন'টা ক্লাস। তারপর অফিস। আবার সন্ধে ছ'টা থেকে সাড়ে ন'টা ক্লাস। লাইব্রেরিতে বসে

নোট নেওয়া। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে এগারোটা। রাত দুটো পর্যন্ত পড়াশোনা। পরদিন আবার ভোর পাঁচটায় ওঠা। প্রথম কয়েকদিন অফিসে ক্যান্টিনে ভাত খেতাম, একদিন দেখি অন্যের থালার না-খাওয়া ফেলা ভাত মেশাচ্ছে, ব্যাস! তারপর থেকে সারাদিনের খাবার বলতে পাঁউরুটি আর কলা।

ছেলেমেয়েরা এই কষ্টের কোনো মূল্য দেয়? আমার ওষুধ ওরা খায় না, দৈবাৎ কখনও খেয়ে অসুখ-বিসুখ সারলে বলে, 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে'—এইসব বিড়বিড় করতে করতেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের হলুদ পাতারা ঘিরে ফেলে পরেশকে।

ফুরিয়ে আসা এই বিকেল থেকে পরেশ আবার দূরে আরেক বিকেলে চলে যায়। ওই তো সরোজ আর লতা বসে,

হ্যাঁরে সরোজ, এত রাণু রাণু করছিস, রাণু তোর বউ, না আমার?

ফিকফিক করে হাসে সরোজ, বাঁধানো দাঁত ঝলকায়। তারপর এক মায়াবী ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায় সরোজ, লতা—শুধু সরোজের স্বরটুকু ভেসে আসে—সে ছিল এক ফাল্গুনের বিকেল। রাণু গাইছিল, যদি তারে নাই চিনি গো/সে কি আমায় নেবে চিনে...সরু ফ্রেমের চশমা। সামনের দাঁত একটা একটু উঁচু। বাসন্তী নাকি আকাশি জমির ছাপা শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। হারমোনিয়ামের ওপর খোলা গীতবিতান। গান শেষ হলে আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম—বাঃ রাণু, বাঃ।

রাণু কী বলল? বলল, আমার আর কিছু হল না সরোজদা, কত কষ্ট করে গান শিখেছিলাম, তিনটে ছেলেমেয়ে; শুধু সংসার আর সংসার! সুবিনয়দা আমার গান নিয়ে কত আশা করতেন একসময়।

ধোঁয়ার ভেতর একবার সরোজের মুখ আবার রাণুর মুখ, ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। বিষাদ-ছায়ায় ছেয়ে আসছিল বিকেলটা। আচ্ছা সরোজ, সেটা কি ফাল্গুনের বিকেল ছিল নাকি শ্রাবণের?

হতে পারে, শ্রাবণেরও হতে পারে, জীবনে কত সকাল-দুপুর-বিকেল এসেছে গেছে, কে জানে হয়তো রাণু গেয়েছিল—কোথা যে উধাও...চশমা খুলে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে যেন বলেছিল—আপনার বন্ধুর গান বাজনায় কোনো আগ্রহ নেই, কোনো ফাংশনে যেতে দিতে চায় না, রেডিওতে অডিসন দিতে চাইলাম, তাতেও রাজি হল না, শুধু বাড়িতে বসে গাইতে বলে, একাই তো গাই সরোজদা, তবু একজনও শ্রোতা না থাকলে গান গাইতে ভালো লাগে বলুন?

কথাগুলো কি সরোজ বলছিল নাকি রাণু নিজেই—কে দাঁড়িয়ে সামনে? রাণু না?

গা ধোবে না? না, ও তো রাণু নয় লতা, সরোজকে বলছে।

পরেশের মনে হল আকাশে এখন সিঁদুর গোলা রঙ। অল্প কিছু মেঘ।

সরোজ বলে, শুনতে পাচ্ছিস?

কী?

ঢেউ উঠছে, পাড় ভাঙছে, ছ-লা-ৎ ছ-লা-ৎ,

কাব্য-টাব্য আসে না আমার।

না, আসুক, জীবন কাব্য না হয়ে গদ্যও হতে পারে, কিন্তু সেই গদ্যের মধ্যে একটা ছন্দ একটা সুর—দ্যাখ, সেই সুরটা কী রকম কলমিলতা ছুঁয়ে দোপাটির সারি ছুঁয়ে ছাদের কার্নিসে দোল খেয়ে দূরে খালধারের নারকেল পাতা ছুঁয়ে আকাশের সিঁদুরে মিশে যাচ্ছে।

বুঝি না এসব! কেমন করে কেটে গেল এতগুলো বছর, অফিস-বাড়ি-চেম্বার-খাওয়া-ঘুম, রাণুকে বুঝলাম না, তোকেও কি বুঝতে পারলাম? ছেলে, মেয়ে, বৌমা—কাউকেই বুঝতে পারলাম না রে! একটা সত্যি কথা বলবি আমায়?

বল।

রাণুর সঙ্গে তোর সম্পর্ক —মানে, তুই কি রাণুকে—

কিছুই বলে না সরোজ, শুধু হাসে, আকাশের সিঁদুর গোলা রঙের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আচ্ছা পরেশ, রাণু কি চমৎকার দোপেঁয়াজি রাঁধতো, মনে আছে—মুসুর ডালে খণ্ড খণ্ড আলু, পেঁয়াজ, জিরে, তেজপাতা, সম্বরা, টক দই...আরও কী সব দিতো!

সারেগা, রেগামা, গামাপা—গলা সাধছে কে যেন! ঝিমলি বুঝি? না, এ তো বাচ্চার গলা নয়, তা হলে কে? কোথায় আমি? সরোজ, লতা, কোথায় গেল সব?

বাড়ি যাবি না? ছেলে-বৌমা চিন্তা করছে—পিঠে হাত রেখে কে বসল এসে, হ্যাঁ, সরোজ, সরোজই তো।

কীসের চিন্তা! সব আনন্দেই আছে!

দু'দিন বাদে বাদে তুই এরকম ঝামেলা পাকাস কেন? একটু মানিয়ে চলতে পারিস না?

তুই সারাজীবন সব ব্যাপারে কেবল আমারই দোষ ধরে গেলি!

বাবা?

কে?

চল, নীচে চল, আমি একটু বেরুব।

শ্যাম?

হ্যাঁ বাবা।

তোর সরোজ কাকা কোথায় গেল বলতো?

সরোজ কাকা! যেখানেই থাকুন ওর মতো মানুষ ভালোই আছেন।

পরেশ দেখতে পেল, সামনেই মাদুরে শ্যামল আর সরোজ বসে আছে। শ্যামল মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে কী যেন বলে চলেছে—কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করে পরেশ।

আমরা চেষ্টা করি মানিয়ে নিতে। বাবাকে একা রেখে যেতে হবে বলে দু'জনে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই না। বাবার সবকিছু ঠিকঠিক সময় মতো চাই, দুপুরে দেড়টা, রাতে

ন'টার মধ্যে খাবার দিতে হবে। চন্দনা দুটো বাচ্চা নিয়ে সব সময় পেরে ওঠে না, এক আধ দিন একটু দেরি হলেই বাবার রাগ, কোনো সময়ে বাচ্চাটাকে একটু দেখতে বললে দেখে না বাবা!

বাবার নামে আর কত নিন্দা করবি? পরেশ বললেও শ্যামল শুনতে পায় না। সরোজও তাকায় না।

দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটতে কাটতে বলেই চলে শ্যামল, আসলে মা না থাকায়, বুঝি, বাবার হয়তো কিছু অসুবিধা হয়। এতদিনের অভ্যেস। কিন্তু চন্দনার পক্ষে কি মায়ের জায়গা নেওয়া সম্ভব! চন্দনার বাপের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করে বাবা, এই সেদিন, বাড়ির গাছের কয়েকটা নারকেল চন্দনা ওর বাবাকে দিচ্ছিল, তাই নিয়ে বাবা চন্দনার বাবার সামনে এমন সিনক্রিয়েট করল—

শ্যামল!

কী হল?

তুই কী সব বলছিস সরোজকে?

সরোজকে! শোন বাবা, তোমাকে কতবার বলেছি সরোজ কাকা মারা গেছেন। তুমি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছ, চল নীচে চল।

অ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব আরেকটুক্ষণ—সারা দিনরাত ঘরের ভেতরেই—

আচ্ছা, আমি মিনিট দশ পরে আসছি।

শ্যামল চলে যেতেই আবার সরোজ এসে বসে।

অ্যাই ব্যাটা, আবার এসেছিস, তুই না মরে গেছিস?

গেছিই তো! এবার তোকে নিতে এসেছি।

তাই ভালো, নিয়ে চল আমায়।

সরোজ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় বাঁদিকে, তিনটে বাড়ি ছাড়িয়ে খালধারে নারকেল-সুপুরির পাতা দুলছে। তারপর কাঁধে রাখা গামছা দিয়ে কপাল গলার ঘাম মুছে নেয় সরোজ?

আমরাও কি সব ব্যাপারে আমাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছি, তাদের মতানুযায়ী চলেছি? আমাদেরও ফ্যাশন ছিল, প্রথমে প্রমথেশ বড়ুয়া, পরের দিকে কেউ কেউ উত্তমকুমারকে নকল করতাম। বুড়ো হয়ে গিয়ে এমন ভাব দেখাই আমরা যেন যৌবনে সব মহাপুরুষ ছিলাম! বিয়াল্লিশে আমার বয়েস ছিল কত? আঠারো। দেশ ভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতার লড়াই, চীন-ভারত যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা—সবই তো দেখলাম। সব যুগেই ভালো-মন্দ আছে, ওল্ড ইজ গোল্ড একথা আমি মানি না রে পরেশ।

যাই বলিস, তখন রাজনীতিতে এত নোংরামি ছিল না।

নোংরামি ছিল না? বেশ বললি তো—দাঙ্গা আর দেশভাগ কোন্ সময়ে হল? কলকাতা থেকে নোয়াখালি—কী বীভৎস! বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডটাই ভেঙে গেল—নেতাজীর কী হল জানা গেল না, গান্ধীজী খুন হয়ে গেলেন—তোর চশমায় ধুলো জমেছে রে পরেশ!

এসব বলতে বলতেই সরোজ আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। ভেসে আসে কচি গলার ভজন—চল মন গঙ্গা যমুনা তীর...। বিকেল ফুরিয়ে আসে। রেলিঙের ওপর একলা কাক, মুহূর্ত কয়েক পরেই উড়ে যায়।

কাকটার উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে পরেশও উড়ে যেতে চায় অনেক দূরে—রাজশাহী শহর। চমৎকার রাস্তা। ঘোড়ায় টানা রিকশা।·ওই তো রাজশাহী গভর্মেন্ট কলেজ, কী বিশাল কলেজ! নিউ হস্টেলে পনেরো হাজার ছাত্র। ওয়েস্ট মিনিস্টার হস্টেল একটু দূরে। ছাত্ররা অনেকেই আমার লন্ড্রিতে আসত। লন্ড্রিতে কিছু কিছু জিনিস বেচাকেনাও হত, যেমন পাবনা থেকে গেঞ্জি নিয়ে এসে বেচতাম। বাবার মোটে একান্ন টাকা পেনশন। কিন্তু আমার চাকরি-ব্যবসা মিলিয়ে আয় মন্দ নয়, বাড়ছে ক্রমশ, বাড়ির অবস্থা একটু ভালো হচ্ছে। চুয়াল্লিশ সাল—তাই তো? হ্যাঁ, তখন আমার বাইশ, রাজ্য সরকারের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছিলাম। কিন্তু দেশভাগ—সব ভেঙেচুরে গেল! সাতচল্লিশে অপসন্ দিয়ে ইন্ডিয়ায় এলাম। দুবোন, ভাই পড়ছে। সবাইকে নিয়ে প্রথমে বারাসাত, তারপর নিউ বারাকপুর। বাবার পেনসন বন্ধ করে দিল পাকিস্তান গভর্মেন্ট। বলল ছেলে ইন্ডিয়ায় গেছে, তুমি পেনসন পাবে না। সেই শোকে বাবা বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেন। রাজশাহী থেকে নিয়ে এলাম বাবাকে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পেনসনের ব্যবস্থা হল এখানে কিন্তু বাবা আর সেরে উঠলেন না—এপারে এখানে এসে কি অসম্ভব লড়াই, বোনের বিয়ে, বাঁশবন কেটে বসত, দুটো মেয়ে বিয়ে দেওয়া, বাড়ি করা, ছেলের এডুকেশন...।

মোক্তারদা কী সুন্দর বাঁশি বাজাতো. আমি বেশ শিখে উঠেছিলাম, তারপর এপারে এসে কেমন যেন সব—

কে? আবার কখন সরোজ এসে মোক্তারদা আর বাঁশির কথা শুরু করেছে—চোখ বোজে সরোজ, কিছুটা বাতাস কেমন যেন জলজ গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

কী কষ্ট করেছি এপারে এসে—আমাদের ছেলেমেয়েরা সে সব কষ্টের কথা ভাবতেই পারবে না! আমি সিনেমা দেখেও কোনোদিন একপয়সা বাজে খরচ করিনি।

তোর কাছে সবই বাজে খরচ! সিনেমা দেখলি না, ভালো থিয়েটার, বেড়ানো—সবই তোর কাছে বাজে খরচ! বাড়িতে একটা রেডিও পর্যন্ত কিনিসনি—রাণুর কত অভিমান ছিল!

শুনে রাগ হয় পরেশের, রাগ নাকি অভিমান, কার পরে অভিমান? রাণু? সরোজ? শ্যাম? বৌমা? নাকি নিজের ওপর? ঠিক বুঝে উঠতে পারে না পরেশ। সব কেমন আবছা, এখন বিকেল নাকি সন্ধে? কোথায় আমি? নিজের বাড়ির ছাদে নাকি সরোজের বাড়ি? কে বসে সামনে রাণু নাকি লতা নাকি মুন্না? পরেশের মনে হয় এই বিকেল কিংবা সন্ধে অভিমানী কিশোরের মতো নাক ফোলাচ্ছে, শরীর দোলাচ্ছে।

ওই তো উঠে দাঁড়ালো সরোজ, লুঙ্গির ভাঁজ থেকে নস্যির ডিবে গড়িয়ে পড়ে। অগোছালো বাতাসে সব কেমন যেন ভেঙে চুরে যায়!

এমন মানব জমিন রইল পতিত/আবাদ করলে ফলত সোনা/মনরে কৃষিকাজ জানো না...পরেশরে, একটাই জীবন, বৃথা কাটিয়ে দিলাম আমরা, খাওয়া-পরার লড়াই করতে করতেই কুয়োর মধ্যে কেটে গেল এতগুলো বছর!

পরেশ দ্যাখে শুকিয়ে যাওয়া পদ্মা গঙ্গা পেরিয়ে আসা হা হা বাতাসে চারপাশের শেষ আলোটুকুও নিভে গিয়ে এই জৈষ্ঠ্যেও যেন শীত, বড় শীতলতা, কুয়াশা, পাতা খসার টুপটাপ, প্রাচীন অশ্বত্থের ঘ্রাণ, জীর্ণ দেউলের ধুলো—এইসব ও আরও কিছু।

বাবা—শ্যামল পিঠে হাত রাখে।

দূরে কোথায় যেন শাঁখে ফুঁ —একবার, দুবার, তিনবার। তারারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আকাশের গায়ে।

শোকাতপ

গভীর রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে এত শান্তি ছড়িয়ে থাকে এর আগে কখনও এমনভাবে অনুভব করেনি শিখা।

এর আগে বলতে, প্রায় চার-পাঁচ মাস, তুতুল চলে যাওয়ার পর এরকম সময়ই তো কাটল। মফস্বল শহরটা গভীর ঘুমে বরফ। তিনতলার ছাদ থেকে তাকালে কোন ঘরবাড়ি থেকেই আলো দেখা যায় না। শুধু রাস্তায়, গলির মোড়ে আলোগুলো একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘনতমস নির্জন রাতে তারা যেন এক প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের অতি ক্ষুদ্র দুর্বল অস্তিত্ব নিয়েও কোনওক্রমে টিকে আছে। আকাশ কালো চাদরে মোড়া। বাতাসে অল্প অল্প হিম।

শিখা—ডাকের আগেই কাঁধে হাতের আলতো স্পর্শ ছিল, শিখা একটু শিহরিত হতে হতেও পঁয়ত্রিশ বছরের চেনা স্পর্শে আবার সহজ হয়ে যায়।

শিখা জানে প্রসাদ এখন কিছুটা সময় দেবে, তার পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ রাতের নৈঃশব্দ্য প্রশান্তি অনুভব করার চেষ্টা করবে। তারপর আবার ডাক দেবে, ঘরে গিয়ে শুতে বলবে। গতরাতে ঘুমের ওষুধ খাওয়া বন্ধ রেখেছে শিখা, ঘুমও অবাধ্য। তাতে অবশ্য কোনও বিরক্তি বা আপশোশ নেই শিখার। তার কাছে বরং এখন দিনই ঘুমের উপযুক্ত সময়। রাত এভাবে একলা ছাদে দাঁড়িয়ে, বসে, তারাভরা বা তারাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে তবু কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সকাল-দুপুর-বিকেল—বড় অসহ্য!

ছুটির দিন হলে তো কথাই নেই,সকাল নটা থেকে একে একে আসবে, আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী—কেউ না কেউ, তাদের কত ভাবনা, উদ্বেগ আছে এই শোকজর্জর দম্পতির জন্যে সেটা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে অনেক কথায়—রাশি রাশি কথার তোড়ে ঘরের সবটুকু আলো-হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে। কেউ ঘুরেফিরে তুতুলের প্রসঙ্গ তুলবে, কেউ বা এদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মরণপণ ব্রত নিয়ে এমন সব কথা বলবে যে হয় সমস্ত শিষ্টাচার ভেঙেচুরে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে ইচ্ছে হবে, নয়তো সোজা ছাদে উঠে নীচে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ার কথা ভাবতে হবে।

প্রসাদের হাতে আলতো চাপ দিয়ে বলে শিখা—শুনছ, শুনতে পাচ্ছ?

কী?

শুনতে পাচ্ছ না?

না শিখা, পাচ্ছি না, শুনতে চাইও না।

তুতুল কাঁদছে, মা-মা বলে কাঁদছে, আমি স্পষ্ট শুনছি।

নীরব থাকে প্রসাদ। অন্ধকারেও সে শিখার দু'গাল বেয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়া জলের দাগ দেখতে পায়। শরীর শিরশির করে ওঠে, মৃদু বাতাস, এত মৃদু বাতাস যেন রোমের

ডগাগুলো আলতো ছুঁয়েই চলে যায়, যাওয়ার আগে ফোঁটা ফোঁটা হিম ছড়িয়ে দিয়ে।

প্রসাদ গায়ের চাদর খুলে তার মধ্যে শিখাকেও জড়িয়ে নিতে চায়। শিখা কেঁপে ওঠে—না, গরম লাগছে!

শিখার গরম লাগে, দিনে রাতে সব সময়। মাঝে মাঝে বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল থাবড়ায়, বিড়বিড় করে, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—মেয়েটা চলে গেল, আগুনে ফেলে দিয়ে গেল, পুড়ে গেলাম আমি, ও তুতুল এত নিষ্ঠুর তুই! আমার বড় জ্বালা, আমি যে পুড়ছি...

প্রসাদ চাদর সরিয়ে নেয়। তখন কোনওভাবেই শিখাকে জোর করে না সে। আগেও শিখাকে জোর করলে তা যে স্বামীত্বের জোর ছিল এমন নয়, ছিল ভালোবাসার জোর। তাদের পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবন বলার মতো তিক্ত হয়নি কখনও, তুতুলকে নিয়ে বেশ মধুর রসেই টইটম্বুর থাকত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঠোকাঠুকি ছিল না তাদের, ছিল বোঝাপড়া, সহযোগিতা। ছোটখাটো মান-অভিমান-ঝগড়া-দ্বন্দ্বে তুতুল ছিল বিচারক—তার সেই তেরো-চোদ্দো বছর বয়েস থেকেই, যদিও মেয়ের বেশির ভাগ রায় বাপঘেঁষা, এমন অনুযোগ উঠত, তবে তা তেমন জোরালো কিছু নয়।

কিন্তু এখন সেই ভালোবাসার জোর যেন অর্থহীন হয়ে গেছে, যেন ভালোবাসাটা তাদের নয়, যেন তুতুল ঘিরেই তাদের সম্পর্ক, তাদের সম্পর্কের কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই আর —যেন তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে পারে মাঝে তুতুল থাকলেই, ওর অনুপস্থিতিতে কেউ যেন কারও জায়গা থেকে পরস্পরের দিকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসতে পারে না। না কি প্রসাদ এতই ভালোবাসে শিখাকে যে তুতুলকে হারানোর সমস্ত ব্যক্তিগত শোককে দূরে সরিয়েও শিখাকে শুশ্রূষা করতে চায়, যেমন মা তার খিদে চেপে রেখে সন্তানের খিদে-তেষ্টা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতে পারে—সেরকম? না কি নিজের তীব্র শোক ভুলে থাকার একটা পদ্ধতি এটা? সমস্ত মনোযোগ শিখার প্রতি কেন্দ্রীভূত করে—শিখার শরীর-খাওয়া-ঘুম-ভালো-মন্দ-কান্না সবকিছুতে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রেখে তুতুলের স্মৃতি থেকে যতটা সম্ভব দূরে চলে যাওয়া?

কান পাতলে এখন ঝিঁঝির ডাক, বহুদূরে একপাল কুকুরের সরু সুতোর মতো ভাসা ভাসা কোলাহল। চার কিলোমিটার দূরে মেইন রাস্তায় হু হু ছুটে যাওয়া কোনও বাসের কাঁপা কাঁপা হর্নের ছিটকে আসা ক্ষীণ টুকরো—না, আর কোনও শব্দ শুনতে পায় না প্রসাদ, অথচ শিখা শুনতে পায় একটানা কান্না!

শিখা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ঘন্টার পর ঘন্টা—ইটের রেলিং ঘেঁষে উল্টোদিকের বাড়ির ওই নারকেল সুপুরি গাছের দিকে বা ঘাড় তুলে আকাশের দিকে বা কোনওদিকে না তাকিয়েই হয়তো বা চোখ বুজেই এভাবে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পারে না প্রসাদ, অথচ শিখাকে একা ফেলে যেতেও ভয় হয়! কখন কী হয়! কী করে বসে!

শিখা বলে—মানুষের পরমায়ু আরেকটু কম হলে ভালো হত তাই না?

প্রসাদ চুপ। সে জানে তার উত্তরের প্রত্যাশায় বা তার সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনার জন্য শিখা কথা বলছে এমন নয়। উত্তর পাক না পাক, যা মনে হবে বলে যাবে শিখা। কিন্তু প্রসাদের ভাবনা ভুল প্রমাণ করে বলে ওঠে শিখা—কী হল, কিছু বলছ না যে?

ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে তড়িঘড়ি এইমাত্র জেগে উঠল—এরকম এক ব্যস্ততাতেই যেন প্রসাদ বলে—কী বলব?

ওই যে বললাম, মানুষের পরমায়ু যদি কম হত একটু—ধর, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন?

কী হত তাতে?

তুতুলের মৃত্যু দেখতে হত না আমাদের!

প্রসাদ বলব না বলব না করেও বলে ফেলে, তুতুল আরও কম বয়সে চলে যেতে পারত!

শিখা চুপ করে যায়। তার দীর্ঘশ্বাস অনেক সময় নিয়ে শূন্যতার অন্ধকার আরেকটু ঘন করে দিতে দিতে গড়িয়ে যায়—বাতাস ভিজে ওঠে।

এলোচুল, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম তেল পাওয়ায় রুক্ষ, চোখে-মুখে কালো কালো ছোপ—শিখা হঠাৎ প্রসাদের গায়ে আলতো ঠেলা মেরে বলে, তুমি বড় নিষ্ঠুর!

কেন?

তুমি কোনও কান্না শুনতে পাও না! মেয়েটা কাঁদে!

রেলিঙের ধার থেকে সরে আসে প্রসাদ। মেঝেয় মাদুরে তোশক চাদর দিয়ে বিছানা, সেখানেই পা মুড়ে বসে। প্রায়-চুলহীন মাথায় হাত বুলায়, হাত নেমে আসে গালে, কয়েকদিনের দাড়ি, আজকাল সপ্তাহে একদিনের বেশি কামানো হয় না। ঢোলা পাজামা, সুতির হাতাকাটা ফতুয়া।

সাফসুতরো ছাদের একদিকে টবের সারি, গাছগুলো বেশ কিছুদিন যত্ন পায়নি, তবে দিন দুই হল কাজের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ তদারকি শুরু করেছে। যদিও এইসব গাছপালা শিখার সাম্রাজ্য।

মাস দুই আগে রাত এগারোটা নাগাদ দিল্লি থেকে এস টি ডি করল উদয়, প্রসাদই ধরেছিল ফোনটা, ওপার উদয়—সুরঙ্গমাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি, পারলে কালকেই চলে আসুন!

ছেলেটার গলা কি কাঁপছিল? এতদিন পরে ঠিক মনে পড়ে না প্রসাদের। তার তিনদিন আগেই সুরঙ্গমা মানে তুতুলের সঙ্গে কথা হয়েছিল, বলেছিল—জ্বর হয়েছে, কাল ডাক্তার দেখাব।

এ থেকে মর্মান্তিক কিছু ঘটতে চলেছে এমন ভেবে নেওয়া তো অসম্ভব ছিল! শরীর থাকলে জ্বরজারি তো হয়েই থাকে, এতে এত ভাবনার কী-ই বা আছে! শিখা অবশ্য ফোনে কী জ্বর, কেমন জ্বর, এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নেওয়ার চেষ্টায় ছিল—তুতুল মায়ের ওসব

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার থেকে মা-বাবার শরীর কেমন, বাবা সিগারেট খাওয়া বন্ধ রেখেছে কি না, মা আজ কী রাঁধল, মাসতুতো বোন সুমির সদ্য হওয়া ছেলেটা রাতে ঘুমোয় কি না—এসব জানতেই আগ্রহী ছিল।

উদয়ের ফোন পেয়ে সেই রাতেই প্রসাদ এখানে-ওখানে—ভাই, বোন, শালা, ভায়রা—সবাইকে ফোন-টোন করে সকালের ফ্লাইটের টিকিটের বন্দোবস্ত করে ফেলে। দুজনের সঙ্গী হয় শিখার ডাক্তার ভাই আর প্রসাদের ভগ্নীপতি।

তারপর সবটাই কেমন এক হাতপাওয়ালা কদাকার এক দুঃস্বপ্নের মতো—তিনদিন ছোটাছুটি, হাসপাতাল বদল, দিল্লির সেরা সেরা ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে আসা, ডায়ালিসিস—তবুও সব শেষ!

জন্ম থেকেই ভুগত তুতুল, জ্বরজারি, পেটের গণ্ডগোল, এটা সেটা, বড় রোগা। শিখা বলত, খেতে চায় না একদম, মেঘে মেঘে বেলা কম হল? বারো পেরোল, তুমি বক একটুও? আদর দিয়ে দিয়ে—এত রোগা মেয়েকে বিয়ে করবে কেউ?

তুতুল হাসত, বিয়ে করব না।

মেয়ে হয়েছ, বিয়ে তো করতেই হবে।

শিখার এই কথায় ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলত, বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারব না আমি!

বাপসোহাগির আদিখ্যেতা দেখ! শিখার কপট রাগের ঝাঁঝ মেশানো কথায় ঝিরঝির হেসে বলত, আমি চলে গেলে কে দেখবে বাবাকে? তুমি তখন বুড়ি হয়ে যাবে!

বড় রোগা, হাইটও টেনেটুনে পাঁচ, ধীর স্থির, ভারী নম্র, কিন্তু মেধায় সবার আগে। ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট, মাধ্যমিক থেকে সবকটা পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন, ফার্স্ট ক্লাস, ইকোনমিক্সে এম-এস-সি। স্কুলে পড়াতে পড়াতেই নেটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন ধাক্কা! গাইনো-সার্জেন বললেন, অপারেশন করতে হবে, রিস্ক আছে, ভবিষ্যতে মা না-হতে পারার সম্ভাবনার রিস্ক! আবার সুস্থ দেহে বাঁচতে অপারেশন না করেও উপায় নেই! অপারেশন হল, সাকসেসফুল, ডাক্তার বললেন, কোনও ভয় নেই, সবদিক বাঁচানো গেছে, ভবিষ্যতে মা হতে না-পারার কোনও কারণ নেই।

উদয়কে কোনওকিছুই গোপন করেনি প্রসাদ আর শিখা—যদিও ওরা নিজের দেখেশুনে বিয়ে করেছে, তবুও তুতুল বলুক না বলুক ওদের অন্তত সব কথা খুলে বলা কর্তব্য মনে হয়েছিল।

উদয় সব জানত, ভারী সহজ সাদাসিধে স্বভাবের ছেলেটি; বলেছিল, আমি জানি, জেনেশুনেই তো আমরা বিয়ে করছি।

বিয়ের পর তিন বছর, বাচ্চা আসছিল না, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা! এখন সব শেষ! শিখার কাছে শুনেছিল প্রসাদ, মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে নাকি পিরিয়ড বন্ধ হয়েছিল তুতুলের।

আরও কিছু লক্ষণ দেখে শিখা-তুতুল দুজনের আশা জেগেছিল।

উদয়ের জন্যে বড় কষ্ট হয় প্রসাদের। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেছে ছেলেটা। দিল্লির ময়ূরবিহারে বড় ফ্ল্যাট দিয়েছিল কোম্পানি। সব ছেড়ে ছুড়ে এখন আবার চলে এসেছে। ব্যাচেলর মেসে। হাতে তুতুলের দেওয়া আংটি খোলেনি তখনও, তুতুলের বইপত্র, ডায়েরি— সব নিয়ে রেখেছে ব্যাচেলর মেসের ওই ছোট্ট কামরায়। কতই বা বয়েস, তুতুলের থেকে বছর দুই বড় হবে, মানে এখন পঁয়ত্রিশ।

বাতাসে হিমের ছোঁয়া বাড়ছে, টের পায় প্রসাদ। শিখা দাঁড়িয়ে আছে একভাবে—একটা স্থবির পুতুল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যদি কেউ হার্টফেল করে হঠাৎ, সে কি তাহলে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে? এমন অবান্তর ভাবনাতেও বুকের ভেতর কেমন যেন একটা পাথরের চাঁই চেপে বসে। প্রসাদ ডাকে,—শিখা!

পুতুলটা কেঁপে ওঠে একটু, বলে না কিছু। রাত কত এখন? তিনটে সাড়ে-তিনটে হবে বোধহয়।

প্রসাদের মনে পড়ে, উদয়ের মা বলছিল সেদিন—এক বছর যাক, তারপর উদয়ের বিয়ে—আপনারা মত না দিলে ও হয়তো আর বিয়েই করবে না—

শিখা দমকা বাতাসে তিরতির কাঁপতে থাকা ঘাসের ডগার মতো বলেছিল, ও ফোন করলে আমি প্রায়ই ওকে বিয়ে করতে—নতুন সংসার পাততে বলি।

একটা সম্বন্ধ এসেছে, মেয়েটি দেখতে শুনতে—কথা শেষ করতে দেয়নি প্রসাদ, হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছিল, থাক না এখন এসব, একটা বছর কাটুক!

আসলে উদয় ঠিক যেন জামাই নয়, ছেলে, একমাত্র মেয়ে হলে অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয় আর কি। তা ছাড়া দুজনের ভাব-ভালোবাসাও ছিল নিবিড়।

সে রাতে শিখা অঝোরে কেঁদেছিল, আপন বলে কেউ থাকল না আমার, আমি অভাগা, আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াব, উদয়ের বিয়ে হয়ে গেলে যেটুকু সুতো আছে তাও ছিঁড়ে যাবে—

উদয়ের অবস্থা ভাব একবার, বাচ্চা ছেলে, গোটা জীবন পড়ে রয়েছে!

সব বুঝি আমি, উদয়কে আমিও বলি বিয়ের কথা কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারি না, কেউ থাকবে না আমার। কেউ না!

একটু নড়ে ওঠে শিখা, রেলিঙের ধার দিয়ে কয়েক পা হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, কী পাপে এমন হল? কী পাপ করেছিলাম আমরা?

প্রসাদ জানে উত্তর দিয়ে লাভ নেই। এ উত্তর অনেকবার দিয়েছে সে। পাপ-পুণ্যের ফলে যে কোন রোগও কাউকে আক্রমণ করে না, একথা শিখা নিজেও জানে, তবু এ উত্তর খোঁজা বা একটা পাপ খুঁজে এনে অকালমৃত্যুর একটা কারণ দাঁড় করিয়েও হয়তো বা একধরনের সান্ত্বনা পেতে চাইছে!

পাপের কথা প্রথম কে যেন তুলেছিল—শিখার স্কুলের কোনও কলিগ না কি প্রসাদের দূর-সম্পর্কের এক কাকিমা—মৃত্যুর তিনদিনের মাথায় শোকাকুল শিখার সামনেই বলেছিল ওই কথাগুলো—সেই থেকে শিখাও মাঝে মাঝে জানতে চায়—কী পাপ? কার পাপ?

আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষজন বড় পুণ্য বা মহৎ কাজও যেমন করে উঠতে পারে না, বড় পাপ বা অপরাধ করাও বুকের পাটা নেই—কী পাপ করব আমরা? এসব বলার ইচ্ছা হয় প্রসাদের কিন্তু বলে না।

আচ্ছা, মৃত্যুর পরে কি কিছুই নেই? সত্যিই নেই? তা হলে তুতুল এখন কোথায়?

আছে, বাতাসে মাটিতে—এই অন্ধকারে হিমে মিশে আছে।

বড় বড় মনীষীরা যে বলে গেছেন—আত্মা, পরলোক সব মিথ্যে?

পাশের বাড়িতে টিউবওয়েল পাম্প করার শব্দ। খুব ভোরে হাঁটতে বেরোয় ও বাড়ির বুড়োবুড়ি। প্রসাদের আর ঘুম পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে বাকি রাতটুকু এভাবেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

কোন অবলম্বন নেই আমার, আত্মা, ঈশ্বর—ঠাকুরঘরে পড়ে থাকব—ভগবানকে ডেকে ডেকে বাকি জীবনটা যে কাটিয়ে দেব সে উপায়ও—

কে বারণ করেছে তোমায়? ভগবানকে ডাকতে ইচ্ছে হলে ডাক, পরলোকে বিশ্বাস করতে চাও কর!

হয় না, হয় না, তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমিও অবিশ্বাসী হয়ে গেছি—অবিশ্বাস চারিয়ে গেছে ভেতরে, অনেক ভেতরে—জানো, এখন মনে হয়, মানুষের জীবনে এইসব বিশ্বাসের—সত্যি হোক বা না হোক—খুব দরকার! না হলে বেঁচে থাকা বড় কষ্টের! দুঃখে-কষ্টে জড়িয়ে ধরার মতো জাপটে ধরার মতো খুঁটি একটা—গলা ধরে আসে শিখার।

মেয়েটার মনে কত খুশি, ভাবছিল মা হবে, উদয় আর বাচ্চা নিয়ে বুকভরে সংসার করবে—মেয়েটা আমার কোথায় চলে গেল! একটা জ্বর—কেউ কিছু ধরতে পারল না। এত বড় বড় সব ডাক্তার, কীসের জ্বর, কেন জ্বর—কেউ ধরতে পারল না—হয়তো কাছে থাকলে গোড়া থেকে সাবধান করতাম, আরও আগে পাঠাতাম ভালো ডাক্তারের কাছে, হয়তো—

অবিরাম বলে যায় শিখা, বিড়বিড় করে। উত্তর দেয় না প্রসাদ। বহুবার শোনা কথাগুলো হয়তো কান পর্যন্ত যাচ্ছিল মগজ পর্যন্ত নয়। অন্ধকারে সে একটা মুখ ভেসে উঠতে দেখছিল। সেই রোগা ভাঙা মুখে উজ্জ্বল চোখ জোড়া, যে চোখে স্নিগ্ধ জ্যোতি, নরম রোদ্দুর—শেষ যেবার এখানে এসেছিল, দিল্লি যাওয়ার আগের রাতে শিখা আর প্রসাদের মাঝখানে শুয়ে প্রসাদকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি বাবাকে জড়িয়ে শোব না!

কপট রেগে শিখা বলেছিল, দিনরাত খালি বাবা আর বাবা!

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প—জানো বাবা, উদয়ও তোমার মতো, অনেক মিল তোমার

সঙ্গে, স্পষ্ট কথা বলে, যুক্তিবাদী অথচ ভেতরে ভেতরে ভীষণ আবেগ—উদয় ঘুমিয়ে থাকলে ঠিক তোমার মতো দেখায়, ওর ঘুমন্ত মুখে চুমো খেতে গিয়ে অনেকদিন মনে হয়েছে ঠিক যেন তুমি...

শিখা হেসে ওঠে, শোনো, বাবাকে মেয়ে কী বলছে—লোকে শুনলে বলবে কী? তোর বাবা না বন্ধু?

প্রাণের বন্ধু!

উদয়ের থেকেও বেশি?

উদয় সেদিনের আর বাবা কতদিনের—কী যে বল!

মেয়ের চুলে বিলি কেটে দিয়েছিল প্রসাদ, বিয়ের আগে যেমন দিত, ঘুমিয়ে পড়েছিল তুতুল। প্রসাদ ঘুমোয়নি, মায়ের কথা মনে পড়ছিল, তুতুলের পাঁচবছর বয়েসে মা চলে গেল—মা বলত, তোর মেয়ে খুব ভালো হবে, শান্ত বুদ্ধিমতী—দেখে নিস তুই!

কয়েক পা এগিয়ে এসে ধপ করে মাদুরে বসে পড়ে শিখা।

ঘুম পাচ্ছে?

একটুও না, গরম লাগছে।

বাতাসে হিমের গুঁড়ো মিশছে আরও, অথচ গরম লাগছে শিখার। এভাবে হিম লাগিয়ে রাত জাগলে অসুস্থ হয়ে পড়বে, শরীর তো খুব শক্তপোক্ত নয়।

প্রসাদ বলে, ঘরে চল।

ঘাড় উঁচু করে আকাশে তাকায় শিখা, বলে, আমাদের যদি আরেকটা সন্তান থাকত—আমাদের চার ভাইবোনের মধ্যে কেবল আমারই এক সন্তান, আমার কপালেই—

দুই সন্তানে কী ঘটতে পারে না এরকম?

হয়তো পারে, হয়তো ঘটে, তবে তার সম্ভাবনা অনেক কম।

শিখাকে যাই বলুক প্রসাদ ভাবে জীবনে এক সন্তানে আটকে থাকার সিদ্ধান্তটা খুব ভুল নেওয়া হয়েছিল—দু দুবার অপারেশন করেছিল শিখা। আবার নিজেই নিজেকে উত্তর দেয়—দুই সন্তান থাকলেও কি তুতুলের মৃত্যুর শোক কিছু কম হত! তুতুলকে হারানোর শোক তুতুলের জন্যেই, আরেকটা সন্তান আছে কি নেই সেটা গৌণ—তবে হ্যাঁ, এখন যেমন এই বয়েসে বেঁচে থাকা নিরর্থক মনে হচ্ছে সেটা হয়তো হত না।

বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয় শিখা। আঁচল খসে গেছে, বাঁ হাত আড়াআড়ি এলিয়ে যায় প্রসাদের কোলে। আঁচল তুলে মাথা ঢেকে দেয় প্রসাদ, শিখা সরিয়ে নেয়।

শেষ রাতের হিম—কাল থেকে কাশি শুরু হবে—

হোক, বেঁচে কী লাভ? চলে যেতে পারলেই—

চলে গেলে সে একরকম, কিন্তু যদি বিছানায় পড়ে পচে গলে দিনের পর দিন—

নার্স রেখে দিও—টাকা-পয়সা আর কার জন্যে রাখবে? বলতে বলতে গলা ভিজে

আসে শিখার।

কয়েকটি নীরব মুহূর্তে বাতাসে আরেকটু হিম বাড়ে, প্রসাদের গলা খাদে নেমে আসে, আমার কী হবে? আমাকে রেখে চলে যেতে কষ্ট হবে না তোমার?

আবার নীরবতা। তবু শিখার না-বলা কথার ঝিরঝির স্রোত অনুভব করতে পারে প্রসাদ! সারারাত সারাদিন এমনই হয়—উচ্চারিত কথার থেকে অনুচ্চারিত কথার পরিমাণ ঢের বেশি!

ছাদের লাগোয়া বেলগাছে হঠাৎ ডানার ঝটপটানি, পাখির তীব্র ডাক।

প্রসাদ টানটান শুয়ে পড়ে। দুটো হাতের তালু পাশাপাশি মেলে দেয় মাথার তলায়, ওর পেটের ওপর এলিয়ে থাকে শিখার বাঁ হাত। চাদর মুড়ে নেয় গায়ে, পাশ ফিরে শিখাকে জড়িয়ে নেয়।

ছাড়।

ঘরে চল।

সরে এসে চিত হয়ে শোয় প্রসাদ। সত্যিই কীভাবে কাটবে সামনের দিন রাত? আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর আসা-যাওয়া কমে যাবে আস্তে আস্তে, যে যার জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ক্রমশ ভুলে যাবে আমাদের কথা—তারপর কী নিয়ে, কীভাবে—অথচ বছর দুই আগে প্রায় একসঙ্গেই দুজনের রিটায়ারমেন্টের পর মনে হয়েছিল এ সময়টাই জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়। বই পড়ো, গান শোনো, টিভি দেখো, আত্মীয়-স্বজনের ভালো মন্দে পাশে গিয়ে দাঁড়াও—আর তুতুল ছিল, তুতুলের শ্বশুর-শাশুড়ি বাড়ির কাছেই, প্রায়ই বিকেলে গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, তারাও বুড়োবুড়ি একা একা, এক মেয়ে এক ছেলে, একজন ধানবাদ একজন দিল্লি।

প্রতি রবিবার নটার পর ফোন করত তুতুল আর উদয়। জরুরি প্রয়োজন থাকলে বা হঠাৎ কথা বলতে ইচ্ছে হলে ওরাও ফোন করত। তুতুল ফোন করলে আর ছাড়তে চাইত না, বকা দিলে বলত, তোমাদের জামাই অনেক রোজগার করে বাবা, সে টাকায় এদেশে ভদ্রভাবে তিন-চারটে পরিবার বেঁচে থাকতে পারে।

রিটায়ারমেন্টের একবছর আগে বিয়ে হল তুতুলের, তার একবছর বাদেই বাড়ি মেরামত, দোতলায় একটা ঘর, সিঁড়ি। ভাবা ছিল, দুজনের একজন চলে গেলে নীচতলাটা ভাড়া দেওয়া হবে!

ঠিক এভাবে পরপর ভেবে যেতে পারে না প্রসাদ, এক কথার মধ্যে আরেক কথা, এক প্রসঙ্গের মধ্যে আরেক প্রসঙ্গ ঢুকে পড়ে। প্রসাদের মনে হয়, শিখা ঠিকই বলে—ঈশ্বর অবিশ্বাসী মানুষ শোক-ঝড়ে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে বাঁচবে কী নিয়ে—মানুষ ক্ষুদ্র অসহায়—অকারণ মিথ্যে অহং মানুষের!

শিখা ছটফট করে, হাতটা সরিয়ে নেয়, আবার রাখে প্রসাদের বুকে পেটে। গা যেন

গরম বেশ—জ্বরজারি হবে না তো! ভাবতেই উঠে বসে গলায় কপালে হাত ছুঁয়ে বুঝতে চেষ্টা করে প্রসাদ।

ঘরে চল—হিম লাগা ভালো নয়।

হিম কোথায়? আমার গরম লাগছে!

শিখার গরম লাগে, সারাদিন সারারাত গরম লাগে শিখার, প্রসাদ অনুভব করে হঠাৎ যেন বাতাস থেকে হিম ঝরে যাচ্ছে, কে যেন সমস্ত হিম শুয়ে নিয়ে কেমন এক তাপ ঢেলে দিচ্ছে—প্রসাদেরও গরম লাগে!

কাকের ডাক। শেষ হয়ে এল রাত। কেটে গেল, এ রাতটাও কেটে গেল।

আচমকা উঠে বসে শিখা—অলৌকিক কিছু ঘটে না পৃথিবীতে?

নতুন কথা এটা শিখার মুখে, না কি বলেছিল—তুতুলকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে, ডুকরে কেঁদে ওঠার ঠিক আগে বলেছিল, তারপর এই। প্রসাদ শান্ত, ওঠে না, শুয়ে শুয়েই বলে,—অলৌকিক? কী রকম? ফিরে আসবে তুতুল?

না, তা বলছি না। ধর, আমি কয়েকদিন আগে ঘুম-ঘুম একটা ঘোরের মধ্যে দেখলাম তুতুল মা হয়েছে—ফুটফুটে একটা বাচ্চা, ফরসা, মাথাভর্তি চুল, ছেলে না মেয়ে বোঝার আগেই কেটে গেল ঘোরটা।

অলৌকিকের কী হল তাতে?

আমি একটু আগে দেখলাম তুতুল বলছে—আমি মা হতে পারলাম না, বড় সাধ ছিল, পারলাম না আমি, আমার বাচ্চাটকে তুমি নাও—আচ্ছা, হয় না? বল? আমি আবার মা হতে পারি না, তুমি আবার বাবা হতে—হয় না? বল? আমরা কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি? চেষ্টা করলে, সমস্ত মনপ্রাণ ভালোবাসা ঢেলে চেষ্টা করলে শরীরের বাধা—

শিখা।

হয় হয়! অলৌকিক অনেক কিছু ঘটে, এসো, এসো চেষ্টা করি, এসো!

শিখা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, শরীরের সমস্ত বসন খুলে ফেলে একে একে—প্রসাদের কোনও বাধাই সে আজ মানতে চায় না—কী এক অসীম শক্তিতে প্রসাদের পোশাক একটানে খুলে ফেলতে পারে। তারপর যৌবনের প্রথম দিনগুলোর সেই নিবিষ্ট প্রণয়ীর মতো নিরাবরণ শরীর দিয়ে ঢেকে দিতে চায় প্রসাদকে—বাধা দেয় না প্রসাদ, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয় প্রসাদকে।

কাক ডাকে, জাগে অন্য পাখিরাও, আকাশ ক্রমশ ফরসা হয়ে আসছে। একটু পরেই আলো ফুটবে।

এক গাঁজাখোরের সঙ্গে কথোপকথন

দেশলাই হবে, দাদা?

রাত এগারোটা, স্টেশন থেকে হেঁটে বাড়ির দিকে আসার পথে কংক্রিটের নতুন ব্রিজটার মুখে হাওয়া ফুঁড়ে সে যেন বেরিয়ে এসেছিল। আনমনা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চমক খেয়েছিলাম।

বুকপকেট থেকে দেশলাই বার করে তার হাতে দিতেই, সে বলল, জ্বলবে? ভিজে নেতিয়ে যায়নি তো?

সারি সারি উঁচু লম্বা সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পপোস্ট, কোনটা জ্বলছে, কোনটা ঘুমন্ত। ব্রিজের মুখে খালধারে ঝোপজঙ্গল, নারকেল-সুপুরি গাছ। আলো-ছায়া-অন্ধকারে মাখামাখি।

হাওয়া ছিল, একটা কাঠি নষ্ট করে দ্বিতীয়বার বিড়ি ধরিয়ে ফেলল। লম্বা, লিকলিকে, মুখময় এবড়ো-খেবড়ো দাড়িগোঁফ, ঢোলা জামায় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। দেশলাই ফেরত দিয়ে হেসে উঠল সে। বলল, আজকাল সব দেশলাই ভিজে ভিজে অথচ দেখুন চারপাশ কত শুকনো খটখটে!

মনে হল, লোকটার সঙ্গে কথা বলা দরকার, গল্পের গন্ধ পাচ্ছিলাম। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, কী নাম?

নাম? আপনার যা ইচ্ছে ডাকতে পারেন।

হুঁ! কী নেশা—গাঁজা, না চরস, নাকি ব্রাউন সুগার?

বেশ সমঝদার অভিজ্ঞ লোক দেখছি!

ঝিরঝির বাতাসের মত আলতো দু-এক পা ফেলে সে ব্রিজের ডানদিকের উঁচু ফুটপাতে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। পেছন পেছন হেঁটে ফুটপাতের নিচে ব্রিজের রাস্তায় তার মুখোমুখি আমি।

ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলে, ওখানে নয়, ওখানে দাঁড়ালে কিস্যু দেখতে পাবেন না।

কী দেখব?

পাশে এসে দাঁড়ান—হ্যাঁ, এইবার, দেখুন, আকাশ দেখুন, কী দেখছেন?

হাওয়া বয় শনশন, তারা'রা কাঁপে!

পদ্য? আকাশ কেমন ঘন নীল—দেখতে পাচ্ছেন না?

চুপ করে থাকি, ফাঁকা রাস্তায় টানা হর্ন দিতে দিতে ডানে-বাঁয়ে হেলে-দুলে একটা মাতাল রিকশা চলে যায়।

নিভে যাওয়া বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে লোকটা এবার চিৎকার করে ওঠে, আজ আসবে, নিশ্চয় আসবে।

কে?

উড়ন্ত হাতি।

ও—তা, হাতি না হয়ে ঘোড়া হলে ভাল হত না।

ইয়ার্কি হচ্ছে?

না, না।

চোপ!

না, মানে, উড়ন্ত ঘোড়ার কথা শুনেছি ছেলেবেলায়, রূপকথার সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া, মানে আমি—

চোপ! আর একটা কথা বললে—

ব্রিজ কাঁপিয়ে দুটো মোটর-সাইকেল পাশাপাশি ছুটে যায়। খালের পচা জল থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ উঠে আসছে। একবার মনে হল, লোকটার গায়ে যেন বোঁটকা গন্ধ।

সে ডানহাতের মুঠো পাকিয়ে শূন্যে দু-দুটো ঘুষি ছুঁড়ে বলল, দেখুন, আমি আপনাদের মত ভদ্দরলোক নই।

তা তো বুঝতেই পারছি।

ভদ্দরলোকরা সব বাইরে একরকম ভেতরে আরেকরকম!

তরমুজ, না?

হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে সে। খাসা বলেছেন মাইরি!

ভদ্দরলোকদের মুখে 'বাবুরাম সাপুড়ে' পদ্যটা বেশ মানায়।

ও সব পদ্য-ফদ্য জানি না, আমি ভদ্দরলোক নই, সোজাসাপটা কথা বলতে পছন্দ করি। কুড়ি টাকার গাঁজায় আমার একমাস চলে—গুণে গুণে পাঁচ টান দিই সপ্তাহে এই একদিন।

থাকা হয় কোথায়?

চুপ! চুপ! শুনতে পাচ্ছেন?

কি?

ওরা আসছে।

কারা?

ও, আপনি কিছুই জানেন না?

বললেই জেনে যাব।

আকাশে একটা দেশ আছে, জানেন? ওই যে আকাশ, ওই নীল আকাশ, দেশ মানে বোঝেন? কান্ট্রি! কান্ট্রি!

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলতেই হয়। সে এবার অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে, যেন শেয়াল দাঁত খিঁচোচ্ছে!

ভদ্দরলোকদের এই এক দোষ—সবজান্তা! বাল জানেন আপনি! ভাবছেন আমি স্বর্গের কথা বলছি, মোটেই না। সগ্গে যায় মরা মানুষেরা আর এদেশে জ্যান্ত মানুষদের!

ও!

তবে অনেকটা সগ্গের মতই, কেউ মরে না ওখানে, গাছে গাছে ইয়ে কি বলে—টক-ঝাল-মিষ্টি অমৃত ফল, সারাদিন শুধু খানা-পিনা-গানা-বাজনা! গিলি গিলি আল্লা! বুঝলেন কিছু?

হুঁ।

ওদেশ থেকে ওরা নেমে আসে, উড়ন্ত সাদা হাতির পিঠে তুলে নিয়ে যায় ওদের পছন্দসই মানুষদের।

লোকটা এবার হঠাৎ মাথা নিচু করে হাত দুটো সামনে সটান মেলে দিয়ে মুখে হো হো আওয়াজ করে রেলিংয়ের ধার দিয়ে সামনে-পেছনে-ডাইনে-বাঁয়ে চলতে থাকে। তারপর চলা থামিয়ে—বলে, এই হল উড়ন্ত হাতি, বুঝলেন কিছু?

অল্প অল্প।

ভদ্দরলোকরা সব বোঝে, আবার কিছুই বোঝে না—হাজার বছরের বুড়ো ভাম সব।

আমি চুপ। শহরটা ক্রমশ গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছে, রাত কত হল? বাড়িতে ওরা চিন্তা করছে নিশ্চয়, কিন্তু লোকটাকে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না।

সে আবার শুরু করে, আমার বাপের কাছে আমি ওই দেশটার কথা প্রথম শুনেছিলাম। বাপ শুনেছিল আমার ঠাকুদ্দার কাছে, ঠাকুদ্দা শুনেছিল তার বাপের কাছে—আমার ঠাকুদ্দা ছিল চাষা, শুনেছি গায়ে নাকি তার একশ' হাতির বল! তবে অকালে টেঁসে গেছিল।

আহা, কেন?

গ্যাস! গ্যাস!

গ্যাসট্রিক আলসার?

আরে, না, গ্যাস খেয়ে আইন-অমান্য মারাতে গেছিল, ব্রিটিশ তাড়িয়ে দেশে নাকি চাঁদ উঠবে ফুল ফুটবে!

ও।

ঠাকুদ্দা মানে বোঝেন? আপনারা আবার আজকাল ইংরাজি ছাড়া কিছুই বুঝতে চান না! ঠাকুদ্দা মানে গ্র্যান্ডসন!

গ্র্যান্ডসন?

কেন, ভুল হল নাকি?

না, ভুল নয়—মানে ঠাকুদ্দা বা গ্র্যান্ডফাদার কারোর না কারোর গ্র্যান্ডসন তো বটেই!

বেশি জ্ঞান মারবেন না—ফুটুন, ফুটে যান এখানে থেকে!

আরে, কী করলাম আমি? এত রাগের কী হল?

কথা না বলে লোকটি একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিও চুপ।

ওরা আসবে, ঠিক আসবে, ওরা এসেছিল। সুযোগ বুঝে আমি হাতির লেজ ধরে ঝুলে পড়েছিলাম, কিন্তু হল না, মাটি থেকে একটু উড়তে না উড়তেই ঝাঁকুনির চোটে আর ধরে রাখতে পারলাম না, পড়ে গেলাম, হাতে-পায়ে চোট লাগল, ব্যথা হল—আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মত একটানা বলে যাচ্ছিল সে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আচমকা হাউহাউ কাঁদতে শুরু করল। আমার কেউ নেই, অনেক কাল আগে একটা মেয়েমানুষ ছিল, পালিয়ে গেল, চারপাশ এত শুকনো

খটখটে, যে মিলে কাজ করতাম বন্ধ হয়ে গেল সেটা, আর সে মাগি সোজা সোনাগাছি গিয়ে—খুব খিদে আমার, একটা জ্যান্ত মেয়েছেলেকে দেবেন আমায়? জ্যান্ত ডাগর-ডোগর?

আস্তে আস্তে কান্না থামিয়ে জামার হাতায় চোখের জল, নাকের জল মুছে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকল, আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, খুব মজা দেখা হচ্ছে, না?

না, না, মজার কী আছে?

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল, বলল, শহরটা কেমন দুলছে, দেখছেন?

হ্যাঁ।

রাস্তাগুলো কেমন লাফ দিয়ে সোজা আকাশে উঠে যেতে চাইছে, তাই না?

হ্যাঁ।

রাতেও কেমন ফর্সা নীল আকাশ!

হ্যাঁ।

আকাশ রাস্তায় নেমে আসতে চাইছে!

হ্যাঁ।

মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খুব তেড়েফুঁড়ে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করলাম, তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম ক'দিন।

ও।

ট্রেনে-স্টেশনে বাদাম বেচলাম ক'দিন। ডেইলি পঞ্চাশ টাকা রোজে এক বিল্ডিং কনটাকটারের কাছে কাজ করলাম।

আচ্ছা।

কাশতে কাশতে ওয়াক তুলে একদলা কফ বার করে রেলিং দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খালের ভেতর ছুঁড়ে দিল সে।

তারপর?

কাজ পেলাম একটা মোটর গ্যারেজে। বেশ কয়েক মাস, চলে যাচ্ছিল একরকম, কিন্তু—

একদিন—খুব দরকার ছিল বুঝলেন, শখ-আহ্লাদ কার নেই বলুন, পাঁচশো মাত্র পাঁচশো টাকা মালিকের কাছে চেয়ে পাইনি তাই ঝাড়তে গিয়ে ধরা পড়ে—

কাজটা গেল?

কাজ গেল, বেদম ধোলাই হল!

ইস!

কেড়ে কুড়ে খেতে হবে, অন্য উপায় নেই, জোর চাই জোর!

গায়ের জোর?

গায়ের জোর, মাথার জোর, মুরুব্বির জোর, টাকার জোর—যেখানে যেমন যার যেমন—জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে সব, সবার পকেটে দেশলাই অথচ সব ভিজে ন্যাতানো!

ও। তা, এখন চলে কি করে?

কী চলে? কে চলে? চলছে কই, সবই তো দাঁড়িয়ে।

মানে, খাওয়া-পরার জন্যে কী করা হয়? পেশা কী?

পেশা? দাঁত গিজড়ে হাসতে থাকে লোকটা, তারপর যেন খুব গোপন কথা বলছে এভাবেই নিচু স্বরে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলে, নানারকম ফেরেববাজি, ছিনতাই, রাহাজানি—ভালো কথা, পকেটে মালকড়ি যা আছে ছাড়ুন দেখি!

বেশি কিছু নেই, বড় জোর সাত-আট টাকা।

তাই দিন।

দিচ্ছি—কিন্তু উড়ন্ত হাতির ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল।

আগে মাল ছাড়ুন।

পকেট ঝেড়েঝুড়ে মোট আট টাকা পঁচিশ পয়সা বেরল, দিয়ে দিলাম। খপ করে ঢোলা জামার পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে লোকটা বলল, কিছু মনে করলেন না তো?

না।

অবিশ্যি মনে করার কি আছে, এ তো বড়জোর আপনার বিকেলের চা-সিগারেটের দাম।

উড়ন্ত হাতির ব্যাপারটা?

উড়ন্ত হাতি? আমার মতো অনেকেই হাতির পিঠে চড়ে ওই দেশটায় যাওয়ার ধান্দা করে গেছে, কেউ পারেনি—সব ব্যাটা আছাড় খেয়েছে, কিন্তু তবু ওই আশায় আশায় টিকে আছি!

আমাদের কাছে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর ব্রেক কষে দাঁড়ায়। ঘষা কাচ নামিয়ে একটা দাড়িওলা মুখ, যশোর রোড এই দিকে?

আমি কিছু বলার আগেই গাড়ির জানলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা, মাগনা বলব কেন? কিছু মাল ছাড়ুন, বলছি।

দুরন্ত স্পিড তুলে সাঁই সাঁই বেরিয়ে গেল গাড়িটা। হো হো হেসে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে সে বলল, ল্যাজ তুলে পালিয়েছে, ধান্দাবাজি, মাগনা হাতিয়ে নেওয়ার ধান্দা! শালা সব চোর! সব ধান্দাবাজ!

তা হলে আশা—

আশা একটাই—উড়ন্ত হাতির পিঠে চেপেই হোক আর লেজ ধরেই হোক ঠিক একদিন পৌঁছে যাব ওই দেশে।

সত্যি?

আলবৎ সত্যি। আর—

আর?

আর শালা হাতি-টাতি নিয়ে কাউকে আসতে দেব না এ দেশে!

কেন?

আমি ছাড়া কোন শালা যেন যেতে না পারে ও দেশে—লোকটার বিকট অট্টহাসিতে কাঁপতে থাকে আকাশ, রাস্তা, ব্রিজ, গাছপালা, কচুরিপানা, পচা খাল—সব।

কালচিহ্ন

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে চেনা পথ ছেড়ে অচেনা গলির ভেতর ঢুকে পড়েছিল, জানে না অধীর।

আঁকাবাঁকা, বিবর্ণ সুতোর মতো গলি, দুপাশে দোতলা-তেতলা-চারতলা বাড়ি একে অপরকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে—প্লাস্টার খসা, হাড়-পাঁজরা সার, বিষণ্ণ, ঝুলকালি মাখা। ছাদের উপর ঝুলবারান্দায়, নৃত্যরতা অসংখ্য ডাকিনী-যোগিনী চিৎকার করে ডাকছিল তাকে? শরীরের ভাষা পড়ে তাই মনে হয়, কিন্তু কোন আওয়াজ আসে না কানে।

স্বেচ্ছায় হাঁটছিল এমন বলা যায় না। এক ছায়ামূর্তির পিছু পিছু কী এক রহস্যময় অনিবার্য টানে মাতালের মতো হেঁটে চলছিল। চোখ তুলে তাকাতেই, রক্তহীন ফ্যাকাশে আকাশের গায়ে ক্ষয়াটে কালো চাঁদ—আচমকা ভীষণ অবসন্ন বোধ করে, তৃষ্ণার্ত, অথচ জল কোথায়, . কে দেবে তাকে জল!

টলতে টলতে গলিপথ শেষে, সে চলে আসে এক শুনশান আপাত অন্তহীন মাঠের সামনে। ন্যাড়া, রুক্ষ, ধূসর, ধূলিময় এক মাঠ। ছায়ামূর্তিটির পিছু পিছু ধূলিঝড়ে চাপা পড়তে পড়তেও ছুটে চলে। মাঠ পেরিয়ে বন। ঝাঁকড়া গাছেরা ভয়ংকর দস্যু হয়ে খোলা তরবারি বল্লম বর্শা হাতে মৌন নিঝুম। বিচিত্র শব্দ সব, গর্জন চাপা হিসহিস। সোঁদা ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে বাতাসের গায়ে লেপটে আছে হিম, যে হিম কাঁপুনি ধরায় না শুধু, আপাদমস্তক পাথর করে দিতে চায়। আলো-আঁধারিতে ছায়ামূর্তিটি কখনও স্পষ্ট কখনও বা অস্পষ্ট, তবু ছুটছিল সে, বিছুটি ফণীমনসা পায়ে দলে ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়।

টের পায় কী যেন জমে জমে পচে আছে বহু যুগ ধরে। আর নিজেকে আবিষ্কার করে গাছপালা ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা বল্লভ রায়বাবুর পোড়ো বাড়ির সামনে, যেখানে ধু ধু মাঠ-ইঁটভাঁটা-চোলাই মদের কারখানার বিচিত্র কোরাস। হাঁটতে হাঁটতে এতদূর—এতদূর চলে এসেছে!

শহরে আজ বন্‌ধ। দ্রুত বাড়তে থাকা এই শহরে জমি কেনাবেচায় ও বর্ডার কাছে হওয়ায় চোরাচালানের কারবারে বহুলোকের অন্নসংস্থান এবং তা ঘিরে নানা মস্তান-মাফিয়া-উপদল। মাঝে মধ্যেই গোলাগুলি, বোমাবৃষ্টি, খুনখারাপি।

গতকাল বিকেলে বিবেকানন্দ পাঠভবনের সামনে দুই দলের বীররসের মহড়ায় মারা গেছে ক্লাস এইটের এক ছাত্র। বেচারা আরও অনেকের সঙ্গে দোতলার ক্লাসঘরের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছিল! শেষ পিরিয়ড শুরু হয়েছে, স্যারেরা কেউ যাননি ক্লাসে। বারান্দা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে ছেলেদের ক্লাসে ঢুকিয়ে নিজেরা টিচার্সরুমে বন্দি।

যুদ্ধ থামল একসময়, বোমাগুলির শব্দ নেই, ক্লাস এইটের সুতীর্থ পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। হঠাৎ আবার শুরু যুদ্ধ এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট একটি বুলেট সুতীর্থর কপালে। তারপর থানা ঘেরাও, পথ অবরোধ ও আজ বন্‌ধ।

শীতের সন্ধ্যা নয়, গতরাত ও আজ সকালের ভারী বর্ষার পর তাপমাত্রা অনেকটা কম, তবু এই নির্জন পথঘাট, বন্ধ দোকান-পাট, থমথমে নিস্তব্ধতায় একটু যেন শীতবোধ করে অধীর। অন্যান্য চব্বিশঘণ্টার বন্ধের দিনে এত জনশূন্য থাকে না পথঘাট, বরং বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুপুর বিকেল সন্ধ্যে জুড়ে বসে ম্যারাথন তাসের আসর, চায়ের দোকানগুলো অর্ধেক ঝাঁপ খোলা রেখে দিব্যি চালিয়ে যায় ব্যবসা। সে সব অবশ্য সারা বাংলা বন্‌ধ, আজ বন্‌ধ শুধু এই শহরে—একটি নিষ্পাপ বালকের মৃত্যুতে সমবেত শোকপালন নাকি প্রতিবাদ নাকি ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া, জানে না অধীর।

সকাল থেকে হঠাৎ-পাওয়া কর্মহীন অবকাশে অধীর সাইকেল চেপে বেরিয়ে পড়েছিল কয়েকজন দেনাদারের বাড়ি টাকার তাগাদায়, শেষ দুপুরে বাড়ি এসে নেয়েখেয়ে টিভিতে সিনেমা দেখে একটু তন্দ্রা, সন্ধ্যায় বাজারের মোড়ে।

মোড়ের মাথায় নিঝুম পড়ে থাকা বিজয় মুদির ভাঙা তক্তপোশের ওপর পা ঝুলিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায় অধীর। নীল জিন্সের প্যাণ্ট, হালকা হলুদ টিশার্ট, পায়ে কেড্‌স। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি, ডানহাতের কবজিতে একুশ বছরের পুরোনো হাতঘড়ি।

পরপর দোকান বন্ধ, দূরে রায় মেডিক্যাল স্টোর্সটা শুধু খোলা। রাস্তাজুড়ে কুকুরের রাজত্ব। কেমন যেন অস্থির লাগে অধীরের। চাকরি ছেড়ে সাত-আট বছর আগে ব্যবসায় নেমেছিল, তা যেন কয়েকদিন মাত্র আগেকার কথা, সাত-আট বছর নয় সাত-আট দিন, এমনই মনে হল। চাকরিটা অবশ্য যাচ্ছেতাই, সারাদিন গাধার খাটনি, অথচ পয়সা দিত সামান্য। একরকম বেপরোয়া হয়েই দুই জামাইবাবুর সাহায্যে নিজের সামান্য কিছু জমা টাকা নিয়ে নেমে পড়েছিল ব্যবসায়। প্রথমে চিংড়ি মাছের কারবার, পরে তার সঙ্গে ইঁট-বালি-সিমেণ্ট। বছর তিন যেতে না যেতেই বাজারের পাঁচ-বাই-সাতের দোকান নিল। ঠিক দোকান নয়, অফিস ঘর বলা চলে। স্টিলের টেবিল, কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার, ফোন।

বন্ধু বাবলু লিজে নেওয়া লরিতে ধুলিয়ান থেকে বালি নিয়ে আসত, ভাঁটা থেকে ইঁট আনত আর অধীর অর্ডার ধরে বাড়ি বাড়ি সাপ্লাই করত। দুইয়ে মিলে মন্দ চলছিল না। সাহস করে প্রতিবছর ক্রমশ বাড়াচ্ছিল লগ্নির পরিমাণ।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সে এসে প্রথম অধীর সামান্য স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু অভাগা যেদিকে যায়...।

আচমকা মোটর-বাইক দুর্ঘটনায় মারা গেল বাবলু। পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনা ছিল বাবলুর কাছে, পুরোটাই মার। এসব দেনা-পাওনার লিখিত কোন কাগজ নেই, আর থাকলেও বাবলুর বউয়ের পক্ষে তা মেটানো অসম্ভব, দুটো বাচ্চা নিয়ে বেচারির যা অবস্থা এখন!

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। বৃষ্টি আসবে কি? আকাশে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে।

পাওনা পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে এ-বছরে গোড়ার দিকে প্রায় বিশ হাজার টাকা অন্যের কাছ থেকে মাসিক ছয় পার্সেন্ট সুদে ধার নিয়ে বাবুলকে দিয়েছিল—ব্যবসার জগতে এরকম সাহায্য দেয়া-নেয়া করতেই হয়, বাবুলও কত সময় কত সাহায্য করেছে তাকে, কিন্তু এভাবে হঠাৎ বাবুল—বেঁচে গেছে শালা।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় অধীর। ভালো লাগছে না। কী করব? বাড়ি ফিরে যাব? কী করব বাড়ি গিয়ে? রনি পড়াশোনা করছে, গল্পগাছা আড্ডার সময় নেই রনির মায়ের—রান্নাঘর, মেয়ের পড়াশোনা। তাছাড়া কী-ই বা আছে সুনীতার গল্পগাছায়, শাশুড়ি কত খারাপ কিংবা জা কত হিংসুটে—এই তো? ও সব শুনে শুনে বড় এক ঘেয়ে হয়ে গেছে, ভালো লাগে না আর।

মশারা জ্বালাচ্ছে বড়, কানের কাছে ঝাঁক বেঁধে বিনবিন করছে। হাঁটতে শুরু করে অধীর, কোথায় যাবে, কোন বাড়ি, কোন বন্ধু, কোন নাম মনে পড়ে না তার। কোথাও যাওয়ার নেই তার। সারাদিন ব্যবসা নিয়ে হাবুডুবু। আড্ডা, ক্লাব এসব কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন পরপর হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে, দু-এক কথার পর আড্ডা আর এগোতে চায় না, সবাই ব্যস্ত, সবাই যে যার বৃত্তে বন্দী হয়ে আছে। অথচ কলেজের সেই দিনগুলো—তুমুল আড্ডা, রাজনীতি, ইউনিয়ন, রাজুর ক্যান্টিন—অধীরের মনে হল ঝলমলে একটা জাহাজ তলিয়ে গেছে সমুদ্রে, সে যেন কবেকার কথা, কোনদিন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেউ জানবে না তার কথা।

একসময় কত বইপড়ার অভ্যাস ছিল, রাতজেগে এক এক রাতেই মোটা উপন্যাস শেষ করেছে, হাঁসুলি বাকের উপকথা কিংবা জাগরী, পুতুল নাচের ইতিকথা কিংবা ধীরে বহে ডন। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রগতি প্রকাশনের কত বই, ঝকঝকে ছাপা, দারুণ কাগজ, তাত্ত্বিক প্রবন্ধ-টবন্ধও পড়ত একটু-আধটু—আর আজ খবরের কাগজ ছাড়া পড়া হয় না কিছুই। সেটাও যে সবসময় খুব খুঁটিয়ে পড়া হয় তাও নয়।

কলেজের সেই দিনগুলোতে কি আজকের জীবন-যাপনের কথা ভাবতে পারত? সারাজীবন রাজনীতি করে, মানুষের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে বাঁচবে—এমন ভাবনাই জুড়ে থাকত সারা মন। কোথা থেকে যে কীভাবে কোন পথে বেয়ে যান জীবন মহাশয়—রাজনীতির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কীভাবে যে সে ছিটকে গেল, ছিটকে গেল কোথা থেকে? না, বিপ্লবের কোন মহামন্ত্র বা রাতারাতি সমাজ-বদলের কোন স্বপ্ন থেকে নয়। তিরাশি থেকে সাতাশি-অষ্টআশি, কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত রাজনীতিজীবন তার, সে সময়ের পশ্চিমবাংলার অনেক রাজনীতিমনস্ক ছাত্র-যুবকের মতো তার কাছে রাজনীতি মানে ছিল সংসদীয় পথেই মানুষের জন্যে কিছু কাজ করে যাওয়া আর একসঙ্গে অনেকে মিলে একটা তুমুল জীবনযাপন। চাকরি ব্যবসা আর সংসারে বাঁধা গড় জীবনযাপনের বদলে হয়তো একটু অন্যরকমের

যাপনচিত্র গড়তে চেয়েছিল সে।

এক একসময় মনে হয়, ছিটকে গিয়ে ভালই হয়েছে, সততা মূল্যবোধ বজায় রেখে সত্যিই কি সে আজকের রাজনীতির জগতে টিকে থাকতে পারত? রাজনীতি ব্যাপারটাকেই এখন ঘৃণা করে অধিকাংশ মানুষ। রাজনীতিক মানেই তাদের চোখে ধান্দাবাজ ধড়িবাজ! অথচ সত্যিই কি তাই? অন্তত এই বাংলায় চারপাশে রাজনীতি করা সব মানুষ কি এমন?

বদলে যায়, বদলে গেল কতকিছু! আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে দাঁড়িয়েও কি ভাবা গিয়েছিল ভেঙে যাবে সোভিয়েত? সে কি ভেবেছিল তার দিনযাপনও ব্যবসা-সংসারের একঘেয়ে ছকের ভেতরে আটকে পড়ে হাঁসফাঁস করবে? সমাজতন্ত্রই সর্বরোগের দাওয়াই, সব সমস্যার নিখুঁত সমাধানভূমি এমন নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ঘিরে আজকের মতো এত প্রশ্ন এত সন্দেহ এত প্রত্যাখান এও কি ভাবা সম্ভব ছিল তখন—অন্তত তার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ তো ছিলই বিশ্বজুড়ে!

একসময় কত বলেছে সে, কতজনকে বুঝিয়েছে, রাজনীতি বিমুখতাও একধরনের রাজনীতি! অথচ আজ সেও তো সেই রাজনীতিবিমুখ এক জীবনচর্চাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। নাকি তার রাজনৈতিক শিক্ষা তাকে মধ্যবিত্ত চরিত্রটি অতিক্রম করতে দেয়নি, বরং তাকে আরও নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরতে শিখিয়েছে?

ভাবনার ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়, পাগলের মতো কোনদিকে হেঁটে চলবে সে? চারধার নিঝুম, কে যেন থেঁতলে দিয়ে গেছে শহরটাকে। সাঁ সাঁ বেরিয়ে যায় পুলিশের জিপ। ফিরে এসে আবার ওই তক্তাপোশের ওপরেই বসে পড়ে অধীর।

সুনীতা আজ বলছিল রনিকে আঁকার স্কুলে ভর্তি করতে হবে, মেয়ের আঁকার হাত নাকি বেশ ভালো। রনি অবশ্য এটা সেটা এঁকে নিয়ে এসে মাঝে মাঝে দেখায় তাকে —সেভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি কোনদিন, দেখে কিংবা না-দেখেই ঘাড় নেড়ে বলে দিয়েছে, বাঃ, বেশ ভালো।

ভাবতেই ঝিরঝির হেসে ফেলে অধীর। কেমন বাবা সে? মেয়ের দিকে একটুও নজর নেই। আপনমনে মাথা নাড়ায়, না, এতটা ভেবে নেওয়া বোধহয় ঠিক হল না, পুরোপুরি অমনোযোগী মেয়ের প্রতি এমন বলা যায় না। এই তো, আজ দুপুরে মেয়ের সঙ্গে কত কথা হল, আদর হল। অধীর টিভি দেখছিল, রনিও পাশে বসল, ঘুমোয়নি, বকবক করছিল, বলল, এসো বাবা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলি।

যুদ্ধ!

হ্যাঁ, স্কুলে খেলি আমরা, তুমি কোন দল, আমেরিকা না ইরাক? বলেই ছুটে গিয়ে একটা বড় চিরুনি আর এক ফুট কাঠের স্কেল তুলে নেয় টেবিল থেকে। স্কেলটা অধীরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, ওটা তোমার বন্দুক, এটা আমার, তুমি কোন দল?

অ্যাঁ!

কোন দল?

হাসে অধীর।

হাসলে হবে না, তাহলে যুদ্ধ হবে কী করে? তুমি গুলি কর, আমিও গুলি করব।

তারপর?

একজন মরে যাবে।

রনিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেয়ে বলেছিল অধীর, না মা, কেউ মরব না আমরা, এ খেলা খেলব না।

না, না বাবা, খেলব—রনির গলায় তুমুল আবদার।

আচ্ছা, সিনেমাটা শেষ হোক, তারপর লুডো খেলব। অধীরের মনে পড়ে একবছর আগে এরকমই এক দুপুরে রনি যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার আবদার করেছিল। তখন আমেরিকা বনাম তালিবানদের যুদ্ধ চলছে। সেদিন যখন জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কোন দলে বাবা? উত্তর দিতে দেরি হয়নি অধীরের, খুব সহজেই বলেছিল, কোন দলেই নেই আমি। কিন্তু আজ? হেসে এড়িয়ে গেছে সে। কারণ তার পক্ষপাত আছে। তবু, মেয়েকে স্পষ্ট করে পক্ষপাত জানাল না কেন সে? সে কি নেহাৎ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি বলে নাকি ছোট্ট মেয়ে সে পক্ষপাতের তাৎপর্য বুঝবে না বলে? অথবা সে কি যুদ্ধটাকে খেলার বিষয় হতে দিতে রাজি নয়? নাকি তার অবচেতনে বাসা বেঁধে আছে একধরনের মধ্যবিত্ত সংযমবোধ—আমি কোন পক্ষের জানাতে দিতে রাজি নই, কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমি।

আবার ঝিরঝির হাসতে হাসতেই ভাবতে থাকে অধীর, এ কি এক মধ্যবিত্ত সংযমবোধ শুধু? তা হলে তো বলতে হয় সারা পৃথিবীই এ বোধেই চলছে এখন। সবাই বুঝি একা বাঁচতে চাইছে—সে ব্যক্তিই হোক আর একটি দেশই হোক—কেউ আর অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে রাজি নয়।

মশাগুলো ঘিরে ধরেছে অধীরকে, আজ হয়তো ওদের খাদ্যসংকট।

লুডো খেলতে হয়নি, মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আঁকার স্কুল—তার মানে সামনের মাস থেকে খরচ বাড়ল আরও পঞ্চাশ টাকা। জেরবার হয়ে যাচ্ছে সে। দাদার কারখানা কি খুলবে আদৌ? দু-একবার জিজ্ঞেস করেছিল, দাদা বলে, শুনছি খুব শিগ্‌গির খুলবে, মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করছে দুপক্ষই। তাও তো সাত-আট মাস হয়ে গেল। বাবার জিজ্ঞেস করতে কষ্ট হয়, দাদার নিভে থাকা মুখখানা এ প্রশ্নে আরও যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বসে নেই দাদা, রোজগারের চেষ্টা করছে না, তা তো নয়, কাপড়ের দোকানে কাজ করছে, মুখে রক্ত তুলে উদয়াস্ত খাটছে বেচারা, কিন্তু তাতে কতই বা হয়? কত টাকা? গরম চাটুতে একফোঁটা জল!

এদিকে বাজার দাউদাউ জ্বলতে জ্বলতে ছুটে বেড়াচ্ছে! সাধ্যি কার তাকে ছোঁয়! ছুটতে ছুটতে ক্রমেই নাগালের বাইরে—অধীর যে কী করে।

কয়েকমাস পরেই পুজো, গত পুজোয় বলতে গেলে কিছুই কেনাকাটা করেনি সে, বাড়ির দুটো বাচ্চার জন্যে দুটো জামা-প্যান্ট, আর কিছু নয়। সুনীতাকে চুপিচুপি একটা শাড়ি কিনে দিতে কি পারত না? মা, বৌদিকে বাদ দিয়ে সেটা করতে মন চায়নি। এবারের পুজোতে যে কী...

কী দিয়ে কী সামলায়? মা একটা কথা বলে, কথা নাকি গানের কলি—ধুতিচাদর ত্যাজ্য করি ডোরকৌপীন সম্বল! তা কৌপীনেও সামলানো যাচ্ছে না এখন। চিংড়ি মাছের ব্যবসা? সে গুড়েও কেরোসিন! যুদ্ধের আগুনে কপাল পুড়েছে অধীরেরও।

চিংড়ির ভেড়ি ঘিরে যে যোগানদার থাকে তাদের মোটা টাকা দাদন দেয় তার মতো ছোট ছোট এজেন্টরা—পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ, যে যেমন পারে। কোম্পানির এজেন্ট এরা। মুণ্ডুহীন চিংড়ি, কোম্পানি কেজিতে দাম দিত চারশো থেকে আটশো। পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পায় এজেন্ট। দাদনের বিনিময়ে ভেড়ির যোগানদাররা চিংড়ি দেয় এজেন্টদের, এজেন্ট দেয় কোম্পানিকে আর কোম্পনি সে চিংড়ি রপ্তানি করে জাপান, আমেরিকা, ইউরোপের দেশে দেশে। বিভিন্ন ওজনের চিংড়ি। ইউ-এইটটিন, ইউ-টোয়েন্টিওয়ান, ইউ-ফরটিওয়ান মানে কেজিতে আঠারো, একুশ কি একচল্লিশটা চিংড়ি। ইউ-এইটও আছে।

তা, আফগানিস্তানে যুদ্ধ লাগতেই রপ্তানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার চালু হলেও, মন্দা কাটেনি, কবে কাটবে হদিশ দিতে পারছে না কোম্পানি। মানুষের মুণ্ডু নিয়ে টানাটানি, এখন মুণ্ডুহীন চিংড়ি নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

হায় যুদ্ধ! আফগানিস্তান, ইরাক—মানুষ মারার কী সযত্ন আয়োজন!

সকালে অধীর তাগাদায় গিয়েছিল অনিলকাকার বাড়ি, অনেক মাস ধরে বেশ কিছু টাকা বাকি ফেলে রেখেছেন, তা তিনিও বললেন, মন্দা চলছে, খুব খারাপ অবস্থা, ছেলেটাকে বসিয়ে দিয়েছে, ভি-আর-এস, রিটায়ার্ড মানুষ আমি, বোঝ তো, দেব, সামনের মাসে এসো, যতটা পারি—।

কী আর বলে অধীর, পাড়ার লোক, বাবার বন্ধু, দীর্ঘদিনের পরিচয়।

তা ভাইপো, বুঝছ কিছু? বিশ্বযুদ্ধ লাগবে না কি?

কে জানে?

তেল! তেল! আফগানিস্তান, ইরাক, এরপর কি ইরান? পৃথিবীর সব তেলের দখল চাই ওদের।

চুপ করে ছিল অধীর। কাগজ টিভিতে এসব খবর পড়তে ভালো লাগে না আর। সন্ত্রাস, পাল্টাসন্ত্রাস, যুদ্ধ —একদম ভালো লাগে না। কিছু নিরীহ মানুষ মরল আমেরিকার, তার সাতগুণ মরল কাবুল কান্দাহারে, তারপর ইরাক—মানুষ আর পিঁপড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ফুলে ফেঁপে উঠছে অস্ত্রব্যবসা—কারও সর্বনাশ আর কারও পৌষমাস!

বছর ষোলো-সতেরো আগে, কলকাতায় সেপ্টেম্বরের এক তারিখে বিশাল শান্তিমিছিল

দু-তিনবার হেঁটেছিল সে, এবারও বিশ্বজুড়ে শান্তিমিছিল কম হয়নি, খোদ আমেরিকায়, ইউরোপের নানা দেশে কত বিশাল সব মিছিল—এত শান্তি মিছিলেও কি যুদ্ধ বন্ধ করা গেল? তা হলে কী? তা হলে কি শক্তিমানের বিরুদ্ধে পাল্টা শক্তির প্রদর্শন? তাতেও বা কী? ক্ষতি-ধ্বংস কি কম হবে তাতে? নাকি পাল্টা শক্তির ভয়ে যুদ্ধ হবে না? এক ঠাণ্ডা যুদ্ধ? তা-ও ভালো গরম যুদ্ধের থেকে, সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধও মন্দের ভালো।

আচ্ছা, যুদ্ধে কি নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব? তালিবান বনাম বুশের যুদ্ধ—হ্যাঁ, বুশ, আমেরিকা নয়, আমেরিকার যুদ্ধবাজ শক্তির প্রতিভূ হিসাবে বুশই বলবে সে—তা, সে যুদ্ধে যখন ভাবতে পেরেছিল কোন পক্ষেই নেই সে, তা বোধহয় এই ভাবনা থেকেই যে আমেরিকা-আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ একই দলে—যে দল বুশ-তালিবান কারও নয়। কিন্তু ইরাক যুদ্ধে সে কি আর ভাবতে পারছে সে ভাবে? যুদ্ধও তো নয়, একতরফা আগ্রাসন, সে লড়াই বুশ বনাম সাদ্দামের নয়, তা তো বুশ বনাম ইরাকের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

অনিলকাকা মাথা নাড়িয়ে বলেই চলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ বলে চেঁচালে হবে? কে মদত দিয়েছিল? মন্দা! মন্দা! দিনকাল খুব খারাপ ভাইপো! খোদ আমেরিকাতেই কত ছাঁটাই হয়েছে জান, ধস্ নেমে গেছে ওদের ব্যবসা বাণিজ্যে। এদেশে যে কী হবে! তোমার দাদার...

আচমকা কুকুরের ঘেউ ঘেউ, চমকে ওঠে অধীর। চারপাশে তিন-চারটে কুকুরের ঘোরাঘুরি, অন্ধকারে একা বসে থাকা অধীরকে হয়তো সন্দেহজনক মনে হচ্ছে ওদের।

হেই. হেই, যা, কুকুর তাড়াতে উঠে দাঁড়ায় অধীর। পাশ দিয়ে খুব দ্রুত সাইকেল চালিয়ে চলে যায় কেউ। থমকে আছে বাতাস।

হাঁটতে শুরু করে আবার। কোথায় যাবে, কোনদিকে? জানে না সে। হাঁটতে হাঁটতেই বিড়বিড় করে, যুদ্ধ! শালা যুদ্ধই যদি করবি, দে শালা একসঙ্গে সব পরমাণু বোমা-টোমা যা আছে সব ফাটিয়ে দে, চুকেবুকে যাক সব!

বলেই শিউরে ওঠে, স্কুলের পাশ দিয়ে মেইনরোড ধরে হাঁটতে থাকে। কোথায় যাব? কোথাও যাওয়ার নেই আমার, কেউ নেই, যাকে এসব কথা বলে একটু হালকা হাওয়া যায়, বাবলু ঝপ করে সরে গেল, বেঁচে গেল শালা! হাঁটতে থাকে অধীর, এক প্রবল ঘোরের মধ্যে হাঁটতেই থাকে।

আসলে এটা নাকি কোন জমিদারবাবুর বাগানবাড়ি ছিল। জমিদারের নাম কি বল্লভ রায়? এ বাড়িতেই নাকি এককালে আমোদ-ফূর্তির ফোয়ারা ছুটত, মোটর হাঁকিয়ে জমিদারবাবু আসতেন, সঙ্গে ইয়ার দোস্ত চাকর খানসামা আর একজন নর্তকী।

বিরাট জায়গা জুড়ে বাড়ি। সামনে পেছনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা সেখানে ঝোপঝাড়, অল্প কয়েকটা আম, পেয়ারা, নারকেল, সুপুরি গাছ। সীমানায় কাঁটাতার এখনও, গেট নেই

তবে ভাঙাচোরা দুটো পাথরের থাম্বা দাঁড়িয়ে আছে, যে থাম্বা দেখলেই ঢাল-সড়কি হাতে ইয়া চওড়া গোঁফওয়ালা কোন প্রহরীর দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য যেন ভেসে ওঠে অধীরের মনে। সে তার ছোটবেলা থেকেই এ বাড়িটাকে একই রকম ঝোপ-জঙ্গল-গাছপালা ঘেরা পোড়োবাড়ি হিসাবে দেখে আসছে। একটা বয়েস পেরিয়ে যাওয়ার পর মানুষের বার্দ্ধক্য যেমন আলাদা করে বোঝা যায় না, সত্তরও হতে পারে, আবার পঁচাত্তর বা আশি—সে রকম এ বাড়িটাও গত বিশ-তিরিশ বছর যেন একই রকম আছে।

সেই কবে থেকেই শুনে আসছে এ বাড়িতে নাকি ভূত আছে। ভয়-ডর চিরকালই কম তার, দুপুরে স্কুল পালিয়ে বন্ধুবান্ধবসহ এখানে চলে এসেছে বেশ কয়েকবার। পরেও এসেছে। বাড়ির ভেতরটা দিনের বেলাতেও কেমন যেন অন্ধকারময়, ছায়াছন্ন। ভূত দেখেনি, তবে সাপ দেখেছে, অসংখ্য সিগারেটের টুকরো, মদের বোতল—এ দেখে সে সিদ্ধান্তে এসেছিল, আধুনিক ভূতেরা সিগারেট-মদে অভ্যস্ত, বঞ্চিত নয়।

একটা বড় হলঘর, তা ঘিরে আরও কয়েকটা ঘর, চুন সুড়কির দেওয়াল, কাঠের বিমের ওপর উঁচু ছাদ, হলঘরে নাকি নাচঘরে ভাঙাচোরা আসবাব, ভাঙা আয়না।

ভর সন্ধেয় ভাঙাচোরা সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এসব চোখ বুজেও দেখতে পাচ্ছিল অধীর। শহর যেভাবে বাড়ছে একদিন এখানেও প্রোমোটাররা ফণা তুলবে, পোড়োবাড়ি গাছ-গাছালি সাফ হয়ে জেগে উঠবে বহুতল অট্টালিকা।

কটা বাজে? ভাবতেই অনুভব করল, ঘড়ি নেই, ভুলে গেছে পরতে? নাকি খুলে পড়ে গেছে? না, এই তো আছে, কিন্তু থেমে আছে।

ভালো লাগে না, কিস্যু ভালো লাগে না, সুনীতার গজর গজর ভালো লাগে না, দাদার চোরের মতো মুখ করে থাকা, আর বৌদির একটু বেশি আদর যা সুনীতার ভাষায় আদিখ্যেতা ভালো লাগে না, এতগুলো দেনা, মায়ের অসুখে একগাদা টাকা খরচ, চিংড়ির কারবার—কিছুই ভালো লাগে না। সব সময় যেন এক যুদ্ধের ভেতর থাকা, সর্বদা কানের কাছে বাজছে সাইরেন। অন্যদিন তবু দোকানে বসে টুকটাক ব্যবসা-ধান্দার মধ্যে থাকতে থাকতে সে একরকম—কিন্তু আজ এই আচমকা অবকাশ একদম ভালো লাগে না অধীরের।

আর এই ভালো না লাগা ভাবের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে সিগারেট ধরাবে বলে পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে জ্বালতেই কাঠিটা মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠে জ্বলন্ত মশাল হয়ে শূন্যে ঝুলতে থাকল।

মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখল—এক প্রাসাদ। প্রাসাদের প্রহরীবিহীন খোলা ফটকের মুখে সেই ছায়ামূর্তি, ইশারায় ডাকছে তাকে। নিশ্চল থাকতে পারে না অধীর, কী এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ছায়ামূর্তিটার পিছু পিছু দৌড়ে যেতে চায়।

মশালের গনগনে আলোয় শ্বেত পাথরের প্রাসাদটাকে অদ্ভুত লাগছিল। ফটক পেরিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে সেই প্রাসাদের দিকেই এগিয়ে চলল সে। লম্বা পথের দুধারে ভারী

চমৎকার বাগান। রঙবেরঙের গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, স্থলপদ্ম, গাঁদা, রজনীগন্ধা, বিচিত্র সব পাতাবাহার। কয়েকহাত অন্তর এক একটি পেয়ারা, ফোয়ারার পাশে শ্বেতপাথরে গড়া নানা ভঙ্গিমার নৃত্যমুদ্রায় শঙ্খিনী নারীমূর্তি।

কোথাও কোন মানুষজন চোখে পড়ে না, বাতাসের গায়ে লেপটে আছে হিম-নিস্তব্ধতা। আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ কিন্তু মরচে ধরা আকাশ।

প্রাসাদের একেবারে সামনে এসে থমকে গেল ছায়ামূর্তিটি, অধীরও দাঁড়ালো, বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখতে থাকল প্রাসাদের অপূর্ব কারুকার্যময় স্থাপত্যশৈলী। কয়েকধাপ উঠেই প্রশস্ত বারান্দা, এত মসৃণ এত ধুলোময়লাহীন যেন পায়েস ঢেলে দিলে চেটে চেটে খেয়ে নেওয়া যায় অনায়াসে।

বারান্দা ঘিরে কোমর সমান রেলিং, একটু এগিয়েই চৌকো, পাল্লাবিহীন প্রবেশপথ, সারা দেওয়াল জুড়ে বিচিত্র সব নকশা। ঢুকে পড়ল প্রাসাদের ভেতর।

বাইরে মশালের গনগনে আলো অথচ ভেতরে কী অন্ধকার! সে কি অন্ধ হয়ে গেছে! চোখ বুজে ফেলে, অন্ধকার তাকে জাপটে ধরে আছে। আস্তে আস্তে চোখ খোলে আবার, পেছনে তাকায়, বেরোবার কোনো পথ নেই, নিরেট কালো দেওয়াল কে যেন গেঁথে দিয়ে গেছে।

এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় সামনে, ঠোক্কর খেয়ে দাঁড়ায়, বুঝতে পারে সামনে সিঁড়ি! সিঁড়ি ভাঙে, ভাঙতে থাকে। দমকা হাওয়া, ভ্যাপসা পচা গন্ধ, হঠাৎ শব্দ আলোয় ঝলসে যায় চারপাশ—বোমা, বোমারু বিমান, গুলি—কারা যেন উল্লাসে মাতে, কাদের যেন অসহায় আর্তচীৎকার, কারা যেন কাঁদে—পচা গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে, ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়—কী যেন জমে পচে আছে বহুদিন বহুযুগ ধরে! জমে থাকা সে-আবর্জনা থেকে উঠে আসে কদাকার দৈত্যের দল! তাদের অট্টহাসিতে পৃথিবী পুড়ছে, মানুষ পুড়ছে, পুড়ছে নদী-নালা ঘর-বাড়ি, চারদিকে কালচিহ্ন।

ছুটে বেড়ায় সে, এ ঘর সে ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, আবার বারান্দা, আবার ঘর, অনন্ত এক গোলকধাঁধা, ক্লান্তি! বড় ক্লান্তি!

আমি কোথায়—আমি কে—! অধীর দেখতে পায় তার ছোট একতলা বাড়ি, তিনটে ছোট ছোট ঘর, মায়ের ঘরটাকে ঘর না বলে খুপরি বলাই ভালো! স্পষ্ট ভেসে এল মুসুরির ডালে পাঁচফোড়ন সম্বরার গন্ধ, স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করতে করতে গুণগুণ করে হিন্দিগানের কলি ভাঁজতে থাকা সুনীতার নীল আঁচল—দেখতে দেখতেই আবার হারিয়ে ফেলল সব।

খাট-আলমারি-আলনা-চেয়ার-টেবিলে ঠাসাঠাসি ছোট এক ঘর। একটা মথ উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়। রাত অনেক, পাড়াটা সাড়হীন। পাশের ঘর থেকে কী একটা সুর ভেসে আসে, এফ. এম. চলছে, সুরটা চেনা লাগে, কথা স্পষ্ট হয় না।

নোংরা চিরুনিটা পরিষ্কার করতে করতে সুনীতা বলে, মায়ের আবার মাথা ঘুরছে ক'দিন, ব্লাডপেশারের ওষুধটা বোধহয়—কাল বিনোদ ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে আনব, কী গো?

এমনভাবে মাথা নাড়ে অধীর, তাতে হ্যাঁ বা না কিছুই বোঝা যায় না।

কী হয়েছে তোমার? দিন দিন কেমন যেন বুড়োটে মেরে যাচ্ছ!

একটু হাসে অধীর, সে হাসির মধ্যে কোথায় যেন চিনচিনে এক কষ্টের ছায়া মিশে থাকে, বলে, বুড়োটে? না, বরং বলতে পার, আমরা সব মরে ভূত হয়ে গেছি, পৃথিবীতে এক একটা যুগে—

আবার শুরু করলে? হঠাৎ হঠাৎ এমন মাস্টারমশাই বনে যাও!

তারপর নিঝুম নীরবতা অনেকক্ষণ।

শুতে যাওয়ার আগে সুনীতা বলে, খেলে না কিছুই। টেবিলে বিস্কুটের কৌটো রেখেছি, মাঝরাতে খিদে পেলে খেও।

রনি পাশবালিশ জড়িয়ে বিছানার ঠিক মাঝখানে শুয়ে। মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছিল অধীর।

সুনীতা বলে, এই, শুনছ?

হুঁ।

মেয়েটা বড় রোগা, না?

উত্তর দেয় না অধীর। সে দেখতে পায় আলো কমে আসছে ঘরে, জানলা দিয়ে ঢুকছে মুণ্ডুহীন চিংড়ি, অসংখ্য অজস্র, মশারি ছেয়ে ফেলে জমতে থাকে মেঝেয়। সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে অধীরকে, সুনীতাকে।

অধীর বলে, সুনীতা! সুনীতা!

হল কী?

জল—

বলতে বলতেই পায়ের তলায় পৃথিবীটা দুলে ওঠে, হাত বাড়িয়ে কাকে যেন ছুঁতে চায় অধীর।

বৃষ্টিকুয়াশায়

হিমমাখা অন্ধকার চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

জানুয়ারির শেষ, শীত যাই যাই করেও শহর ছেড়ে যায়নি এবার। চিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অল্প কাঁপুনি, শিরশির ভাব টের পাচ্ছিল দীপন। দূরে ইস্টার্ন বাইপাসে আলোকবিন্দুর ছোটাছুটি, কখনও বা তীব্র হর্ন।

বাবা দিন-সাতের জন্যে এসেছেন। বিদিশাকে পইপই করে বলেছিলাম, একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, সাত দিনের ব্যাপার। এখন রকম-সকম যা দাঁড়িয়েছে তাতে আর কদিন যে থাকেন—এইসব ভাবতে ভাবতেই জ্বলন্ত সিগারেটের শেষাংশটা বাঁহাতে ধরা অ্যাস্ট্রের ভেতর গুঁজে দিতে পারে দীপন।

ঘরের ভেতর থেকে নিচু গলায় বিদিশা কী যেন বলছিল, বোধহয় শুয়ে পড়তে বলছে, সাড়া দেয় না। চিলতে বারান্দা ঘিরে, হিমমাখা অন্ধকার ঘিরে ধোঁয়ার মতো কুয়াশা, নাকি কুয়াশার মতো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তে চাইছিল।

তোমার বাবার কি সব ব্যাপারে নাক না গলালেই নয়?

আস্তে, সোফায় এলানো শরীর টানটান হয়ে উঠেছিল দীপনের, তর্জনী উঠে এসেছিল ঠোঁটের উপর, বাবা ঘুমোননি এখনও।

হালকা গোলাপি রঙের স্বচ্ছ রাত্রিবাসের বোতাম লাগাতে লাগাতে বিদিশা তখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে। কপালে ভাঁজের রেখা। ছোট বাটিতে রাখা ঈষদুষ্ণ জলে তুলো ভিজিয়ে মুখে ঘষতেই ভাঁজের রেখা হারিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু ছুঁড়ে দেওয়া কথাটা হারায়নি।

দীপন বলেছিল, বাবা পুরোনো দিনের পুরোনো মানুষ। তার কাছ থেকে আধুনিক চিন্তাভাবনা আশা করা—

কে আশা করেছে? সত্তর পেরনো মানুষের সব ব্যাপারে কথা বলার দরকার কী?

একমাত্র নাতনির লেখাপড়া, ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলায় দোষের কী আছে?

রাখো! সারাবছর কোন কিছুর মধ্যে নেই হঠাৎ—

এটুকুতেই এই। সারাবছর সব ব্যাপারে থাকলে কি খুশি হতে?

কথার পিঠে কথা। কথায় কথায় জড়াজড়ি কাটাকাটি, ঘরে তাপ বাড়ছিল, তখনই বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল দীপন।

ওর বাবা, কৃষ্ণপ্রসাদ, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ছেলের ফ্ল্যাটে এলেন। দীপন বহুবার বললেও গ্রামের বাড়ি ছেড়ে বেরোতে চান না কোথাও। বারাসাতের বাদু অঞ্চল অবশ্য পুরোপুরি গ্রাম বলা চলে না। বাদুর বামুনমুড়োয় কৃষ্ণপ্রসাদের চারপুরুষের ভিটে। অঞ্চলটা বারাসাত পৌরসভার আওতাভুক্ত। ঘাড়ের ওপর নগরায়ণের নিঃশ্বাস পড়লেও গ্রামের চরিত্র এখনও হারায়নি পুরোপুরি।

বেশ কয়েকবছর হল শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন চলছে বিনি পয়সায় ছাত্র পড়ানো, টুকটাক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, পাঁচরকমের সংগঠনে সভাপতির দায়িত্ব ইত্যাদি নানাবিধ কাজ। স্ত্রী গত হওয়ার পর রেঁধেবেড়ে দেওয়ার জন্যে এক বামুন ঠাকুর থাকলেও, মাঝে মাঝে নিজেও হাত লাগান। দুই ছেলের বড়টি দীপনের দাদা, সে এখন স্টেটসে, সম্ভবত ওখানে সেট্‌ল করতে চলেছে।

দীপনের মনে পড়ে, মিমির জন্মের পর বাবা এই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন—সেই প্রথম। মিমি বোধহয় তখন মাস-তিন, নাতনির মুখ দেখে বললেন, শ্রাবণে জন্ম, যেদিন এল সেদিন বামুনমুড়োয় কী বৃষ্টি! ওর নাম রাখিস বৃষ্টি, বিষ্টিও রাখতে পারিস।

যদিও তা হয়নি, দীপনের নামটা বেশ পছন্দ হলেও বিদিশার হয়নি। কৃষ্ণপ্রসাদ অবশ্য বিষ্টি বলেই ডাকেন।

মৌমিতা বা মিমি বা বিষ্টির এখন আড়াই বছর। মাসখানেক আগে কৃষ্ণপ্রসাদ ফোনে জানিয়েছিলেন, স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে সরস্বতীপুজোয় তার নাতনি গ্রামে এসে হাতে খড়ি নিক, গ্রাম, পূর্বপুরুষের বাড়ি দেখুক একটু। তখনই দীপন বলেছিল, তুমি এসো একবার, থাকো এখানে কয়েকদিন, মিমি ঠাকুমাকে দেখল না, অন্তত ঠাকুর্দাকে ...। কৃষ্ণপ্রসাদ রাজি হয়েছিলেন।

যে ঘটনায় বিদিশার বিরক্তি, তার সূত্রপাত আজ সকালে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল দীপন, স্নান-টান সেরে ততক্ষণে বসার ঘরে নাতনির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। ভোরে উঠে স্নান করা তার বহুদিনের অভ্যাস। তারপর আধঘণ্টা ঠাকুর ঘরে। অবশ্য ভোরে উঠে প্রথম কাজ গোটা পাড়ায় বার দুই-তিন চক্কর দিয়ে আসা।

তা, সুকুমার রায়ের কবিতার একটা-দুটো লাইন শোনাতে শোনাতেই বেশ ভাব জমে উঠেছিল দাদুভাই আর বিষ্টির। খাওয়া নিয়ে আজ আর কোন বায়না নেই, দাদুর হাতে ধরা গ্লাস থেকে দিব্যি ঢকঢক করে কমপ্লান খেয়ে নিল বিষ্টি। বিষ্টির আধো আধো বুলি, দাদু নাতনির হাসির টুকরো-টাকরায় বহুদিন পর যেন দীপন কী সব হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পাচ্ছিল। যেন বৃষ্টি ভেজা মেঠো পথের সোঁদা গন্ধ, কত রকমের পাখ-পাখালি, গাছপালায় হঠাৎ ভরে উঠেছে ওই ছোট ফ্ল্যাট বাড়িটা। এইমাত্র যেন কেউ ছুটে এসে বলবে, দীপু। এই দী—পু, ফুল তুলতে যাবি?

আপনি পাঁউরুটি টোস্ট খান তো? রান্নাঘর থেকে এসে গ্লাসটা শ্বশুরের হাত থেকে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে বিদিশা।

অ্যাঁ? হ্যাঁ মা, সব খাই, সর্বভুক আমি, শুধু ঝালমশলাটা কম হলেই হল।

বিষ্টিও চেঁচিয়ে ওঠে মম্, আমি খাব তোস্ত।

কৃষ্ণপ্রসাদ এবার নাতনিকে একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নেন। বলেন, আচ্ছা বিষ্টিদিদি

তুমি অ-আ-ই-ঈ বলতে পার?

দাদুভাই-এর বিষ্টিদিদি এবার চুপ। উত্তর দেয় বিদিশা, মিমি, দাদুভাইকে এ-বি-সি-ডি শুনিয়ে দাওতো।

বিষ্টি এবার এ-বি-সি-ডি, ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর থেকে ব্যা ব্যা ব্লাকশিপ পর্যন্ত গড়গড় বলে যায়। বিদিশা তারপর প্রশ্ন করে, হোয়াটস ইয়োর নেম? হোয়াটস ইয়োর ফাদারস নেম? ইত্যাদি। আধো আধো বুলির নিখুঁত উত্তর শুনে বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ ছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। তারপর ধীর কণ্ঠে বলেন, ওকে অ-আ শেখাওনি বৌমা?

কনভেন্টে ভর্তি করব। বাংলা শিখিয়ে লাভ কী? বিদিশার চটপট উত্তর। দ্রুতপায়ে রান্নাঘরে চলে যায়।

দীপন বুঝতে পারছিল সকালের নির্মল আকাশের কোণে যেন একটু একটু করে মেঘ জমেছে। অফিস যাওয়ার ব্যস্ততা সত্ত্বেও আলোচনায় যোগ দেয় সে, বলে, ইংলিশ মিডিয়ামে না পড়িয়ে তো উপায় নেই, যা দিনকাল এখন!

তা হলেও, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে তো বাংলা শিখবে নাকি?

দীপন কিছু বলার আগেই রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বিদিশা বলে, না না, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি হবে। আর কোন কথা বলেন না কৃষ্ণপ্রসাদ। নাতনিকে আরেকবার জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই তড়িঘড়ি বাথরুমে ছোটে দীপন।

সাইরেন— কেঁপে ওঠে দীপন। অ্যাম্বুলেন্স বা পুলিশের গাড়ি। কিন্তু এত রাতে সাইরেন কেন? ফাঁকা বাইপাসে কী ঘটল এমন?

অন্ধকার যেন ঘন হয়ে আসছে। আকাশে কি মেঘ? মশার গুনগুন। তবু ঘরে যেতে ইচ্ছে হয় না। কোণায় রাখা চেয়ারটা টেনে নিয়ে একটু পিছিয়ে দেওয়ালে লাগিয়ে এমনভাবে বসে যাতে পা দুটো তুলে দেওয়া যায় গ্রিলের ওপর। হালকা চাদরটা ভালোভাবে জড়িয়ে নেয় গায়ে।

বাবার শরীর কি একটু খারাপ হয়ে গেছে? অবশ্য হাঁটাচলা কথাবার্তা কাজেকর্মে কোথাও কোন ছাপ নেই। শুধু যেন একটু রোগা হয়ে গেছেন।

দীপনের মনে পড়ে, স্নান সেরে এসে একঝলক ড্রয়িং রুমে উঁকি মারতেই দেখল কৃষ্ণপ্রসাদ জানলার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। আরেকটু নজর দিতেই বুঝল টবে রাখা প্লাস্টিকের গাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে। ঘরময় নানা খেলনা ছড়িয়ে খেলছিল মিমি। ঘরের মধ্যে এক পা ঢুকিয়ে দীপন বলেছিল, ওটা মেড ইন জাপান, আমার এক বন্ধু আপাতত ওখানে থাকে। ওই প্রেজেন্ট করেছিল। কৃষ্ণপ্রসাদ ঠোঁটের কোণায় এক ভারি অদ্ভুত হাসি ঝুলিয়ে বলেছিলেন, এত নিখুঁত, দেখলে মনে হয় সত্যি!

মিমি বা বিষ্টি চেঁচাতে থাকে, বাপি ডল্ ডল...

দীপন হেসে বলে, আচ্ছা দেখাব, পরে রাতে। বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, আমার বন্ধু

ওর জন্যে একটা জাপানি পুতুলও নিয়ে এসেছিল। সেটা দেখাতে বলছে, সে পুতুলটাও—সত্যি ওরা পারে। দেখলে তাক লেগে যায়। তবে দামও তেমনি।

কৃষ্ণপ্রসাদ শোকেসের ওপরে রাখা পোড়ামাটির ঘোড়াটাকে তুলে বললেন, ছেঁড়া কাপড়-টাপড় পাওয়া যাবে। বড় ধুলো পড়েছে রে!

সিগারেট পিপাসায় বারান্দা থেকে ঘরে আসে দীপন। টেবিলের ওপর থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। মা মেয়ে ঘুমোচ্ছে। জেগে গেলে সিগারেট খাওয়া নিয়ে আবার বকবক শুরু করবে বিদিশা। বাড়িতে বিদিশার জন্যেই তাকে অনেকটাই রেসস্ট্রিকশন করতে হয়েছে। অবশ্য বাইরে সেটা পুষিয়ে নেয়।

আসলে বিদিশার ধাতটাই অন্যরকম, ভীষণ ডিসিপ্লিনড্, পরিশ্রমী, সংসারের কোন ব্যাপার নিয়ে দীপনকে মাথাই ঘামাতে দেয় না। দশভুজার মতো একাই সব সামলায়। ডিসিপ্লিন জিনিসটার সঙ্গে শৈশব থেকেই নিবিড় পরিচয় দীপনের। কৃষ্ণপ্রসাদের সংসারে প্রাত্যহিক রুটিনের কোন নড়চড় হবার জো ছিল না।

তবে আমার বউ বড় ঠোঁট কাটা। সংসারও যে একটা রণক্ষেত্র, সেখানে ডিপ্লোম্যাসির যে একটা ভূমিকা আছে এসব কিছুই বুঝতে চায় না—এসব ভাবতে ভাবতেই সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ফেলতে পারে দীপন।

রাতে খাবার টেবিলে কথা বলতে গিয়ে দীপন বুঝেছিল বাবার মেজাজ আজ ভিজে হাওয়া বইতে থাকা মেঘলা দিন। রাতে রুটি খান বাবা, কড়াইশুঁটি, টমাটো দিয়ে ভারী চমৎকার বাঁধাকপির তরকারি করেছিল বিদিশা, সঙ্গে দুধ-কলা। গতকালও চারটে রুটি খেয়েছিলেন, বৌমার রান্নার কত প্রশংসা। আজ গোড়াতেই বললেন, দুটো রুটির বেশি খাব না, তরকারি ছুঁলেন না।

কেন, শরীর খারাপ?

না, বয়েস হয়েছে, কম খাওয়াই তো ভাল।

তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ। ওই ছোট ছোট চারটে রুটি কোন ব্যাপার নাকি তোমার কাছে?

অন্য সময় হলে হয়তো হা হা হেসে উঠতেন। বলতেন, বটে! রোগা হয়ে গেছি। জোর কমে গেছে বলছিস। আয় দেখি পাঞ্জা লড়ি, কার গায়ে কত জোর দেখা যাক! আজ কিছুই বললেন না। মাথা নিচু করে সামান্য হাসি। মুখের রঙে রেখায় বিপন্নতার আবছা মলিন পর্দা। বিদিশা একবার বলল, আপনার জন্যেই তরকারিটা খুব যত্ন করে করেছিলাম বাবা।

কৃষ্ণপ্রসাদ একঝলক তার বৌমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা একটু তুলে দাও, টেস্ট করি।

তারপর নীরবতা। গতরাতেও খাবার টেবিলে কত কথা, কত প্রাণ! আজ যেন তাল কেটে গেছে কোথায়।

একটা কথা বলব? যদি না কিছু মনে করিস!

মনে করাকরির কী আছে? বল।

না, বলছিলাম যে তোদের এখানে এই কলকাতা শহরে কি ভালো বাংলা মিডিয়াম স্কুল নেই?

দীপন খাবার মুখে নিয়ে একটু আমতা আমতা করতে থাকে। না, মানে, আসলে...

কিন্তু উত্তরদাতার ভূমিকায় বিদিশা সপ্রতিভ, বলে, কেন থাকবে না! আমরা যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেই বাংলা মিডিয়ামে না পড়ানোর ডিসিশনে এসেছি। এতো বাংলা বাংলা করে কী লাভ বলুনতো আজকের দিনে? চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য জীবনের কোন কাজে বাংলা ভাষাটার প্রয়োজন বলতে পারেন? আজকাল বাংলা না জানলে কী এসে যায়? আসলে, সময়টা একদম পাল্টে গেছে বাবা; আপনি বোধহয় একটু পুরোনো চিন্তা-ভাবনা...

কথা না বলে মৃদু হাসি দিয়ে বিদিশা বাক্য সম্পূর্ণ করতে চায়। কৃষ্ণপ্রসাদের ফাঁকা গ্লাসে জগ থেকে জল ঢেলে দেয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন, দেখো মা, বয়েস দিয়ে চিন্তার আধুনিকতার বিচার হয় কি না, সে কথা অন্য, আমার তপু দীপু দুজনেই তো ওই বাদু গুস্তিয়া স্কুল থেকে ...

আপনার ছেলেদের কথা আলাদা, ওদের মতো ইন্টেলিজেন্ট মেরিটোরিয়াস কজন হয়? সবাই তো আর জয়েন্টে অত ভালো র‍্যাঙ্ক করতে পারে না। ইংলিশ জানলে তবু কিছু করে খেতে পারবে!

কৃষ্ণপ্রসাদের ঠোঁটে চিলতে হাসির বিদ্যুৎঝলক, তোমার কি ধারণা আমি ইংরাজি শেখার বিরোধী? দীপু কি ইংরাজি শেখে নি? আর ইংরাজি জানতে গেলে বাংলা শেখা যাবে না এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কে করল!

দেখুন বাবা, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে মিমি স্মার্ট হবে, ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলবে। আফটার অল মেয়ে তো, আজ আমাকে যে অসুবিধা ফেস করতে হয়েছে, মানে, বিয়ের পর বরের সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে বোর হবে না, তা ছাড়া...

কৃষ্ণপ্রসাদ খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, বলেন, যাকগে, যা ভালো বোঝ কোরো তোমরা। শুধু একটা কথা বলি, শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচে না বৌমা!

নীরব শ্রোতার ভূমিকায় থাকতে থাকতে ক্রমাগত অস্বস্তি বাড়ছিল দীপনের, বিদিশার কথাগুলোর অনেকটাই তো তারও কথা। কিন্তু বিদিশা এত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছিল যে তা তাদের পিতাপুরুষের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের অভ্যস্ততাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। অথবা বিদিশা কি ভাবছিল যে কৃষ্ণপ্রসাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে দীপন। তা কি দীপনের ব্যক্তিত্বের প্রতি অনাস্থার প্রকাশ নয়? দীপন চাইছিল যে বাবা যা বলেন বলুন, চুপচাপ শুনে গিয়ে হুঁ হ্যাঁ করে যাওয়াই তো ভালো। কী লাভ বিপ্রতীপ ধারণার সংঘর্ষ

বাড়িয়ে? বরং সে এক মিথ্যাকে আশ্রয় করার কথা ভাবল। সে মিথ্যা হয়তো বেশ কিছু দিন-মাস-বছর হয়তো বা সারাজীবনের জন্যেই বিপরীতমুখী ধারণার তিক্ত সংঘাত থেকে রেহাই দিতে পারে।

গলা খাঁকারি দিয়ে দীপন বলেছিল, না বাবা তুমি যা বলেছ, সবই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আমাদের কোম্পানি সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে আই মিন নাগপুরে একটা নতুন প্রজেক্ট ওপেন করতে চলেছে। আমাকে সম্ভবত ওখানে বদলি হতে হবে। এই ধর বছর খানেকের মধ্যেই।

নিখাদ মিথ্যা কথাটা সুদক্ষ অভিনেতার মতো নিখুঁতভাবে পরিবেশন করে এক-দু ঢোঁক জল খেয়ে নেয়। কৃষ্ণপ্রসাদ পেছন ফিরে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিচ্ছিলেন। সেই ফাঁকে বিদিশার অবাক দৃষ্টিকে চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করে দীপন আবার বলেছিল, এখানে মিমিকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করলে বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা করলে পরে নাগপুরে গিয়ে প্রবলেমে পড়ে যাব। বিদিশা তোমায় কথাটা না বলে, হাবিজাবি কথা বলে ভুল বোঝাবুঝিটা বাড়াচ্ছে।

মশার উৎপাত বাড়ছে ক্রমশ, গরমকাল হলে ধূপ না জ্বালিয়ে বসাই যেত না এতক্ষণ। তবু ঘরে যেতে ইচ্ছে হয় না। ঘুমও আসে না। অথচ আজ সারাদিন অফিসে ধকল কম যায়নি। পরিশ্রমের ক্লান্তি মুছে গিয়ে অন্য এক ক্লান্তি যেন ঘিরে ধরতে চাইছে তাকে।

সে ক্লান্তি তাকে এক খননে নিয়ে যেতে চায়। স্মৃতির কোন গভীর অতল থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া ছবি এসে দোল খায়— সেই ছুটির দিনে দুপুরবেলা, বারান্দায় মাদুর পেতে দুই ভাই, বাবার কাছে অংক কিংবা ট্রানস্লেশন লেখা, বিকেলবেলা শুঁটি নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাবার গলায় শোনা রবীন্দ্রনাথের, দু-এক কলি কিংবা কয়েক পংক্তি এলিয়ট, জন্মদিনে বাবার দেওয়া অলিভার টুইস্ট কিংবা চাঁদের পাহাড়—ধোঁয়ার ভেতর আবছায়া কত ছবি আসে যায়। তারপর কি বৃষ্টি নামে? প্রবল বৃষ্টি কি কুয়াশা তৈরী করে? কুয়াশার ভেতরে কি বাবার মুখ? মুখ নয় যেন কয়েকটা রেখা মাত্র। আর কী অদ্ভুত। শিকড়হীন শুকনো ফ্যাকাসে একটা গাছ কেমন উল্টো হয়ে ঝুলছে শূন্যে! এ কি সেই প্লাস্টিকের গাছ!

আর কুয়াশার ভেতর দৌড়য় দীপন, নদীর পাড় ধরে ছোটে, বাবাকে ছুঁতে চায়, পারে না, ভিজে যায়, ভিজে যেতে থাকে।

চোখ মেলতে কষ্ট হয় দীপনের। এখন কি ভোর হয়েছে? ঘরের ভেতরের অন্ধকারে আলোর মায়া নেই। দরজায় ঠকঠক। কে? বাবার কথা মনে পড়তেই লাফ মেরে ওঠে। বাবা অনেক ভোরে ওঠেন। নিশ্চয় জরুরি কোন প্রয়োজন, না হলে এত ভোরে ডাকবেন? বিদিশা জাগেনি এখনও।

পা জামার দড়ি ভালোভাবে বেঁধে নিতে নিতে দরজা খোলে দীপন। সামনে দাঁড়ানো খুব চেনা সেই মানুষটা। কালো প্যান্টের ওপর হাওয়াই শার্ট, উলের হাফ জ্যাকেট, গলায়

ছাইরঙের মাফলার। দীপন বলতে যাচ্ছিল, মর্নিংওয়াকে যাচ্ছ?

কিন্তু কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর হাতে ছোট্ট সুটকেশটা দেখে সে কথা মুখের ভেতরেই থেকে যায়।

আসি রে দীপু, সরস্বতী পুজোয় যাস ইচ্ছে হলে।

আসি মানে? তুমি কি —

হ্যাঁ, বাড়ি ফিরছি, তুই তো জানিস বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও ঠিক—

তা কী করে হয়? বিদিশা, মিমি ওরা তো ঘুম থেকে—

না, না, ওদের ডাকতে হবে না।

এত ভোরে হঠাৎ করে—বাবা, তুমি— মানে—

শোন দীপু, তুই তো চিনিস আমাকে, বউমা তুই—তোরা যথেষ্ট যত্নআত্তি করেছিস, আসলে নিজের জায়গা ছেড়ে এই ফ্ল্যাটবাড়িতে—এই বয়সে—বুঝলি কিনা—

তুমি যাবে কী করে? অটো বাস কিছু চালু হয়েছে নাকি এত ভোরে?

দূর বোকা! বালিগঞ্জ স্টেশন কতদূর এখান থেকে! আমি হেঁটে মেরে দেব—বলতে বলতেই পেছন ঘোরেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

দীপন হাত বাড়িয়ে ধরতে চেয়েও পারে না, বলবার চেষ্টা করে, তুমি যেতে পারবে না, যেতে দেব না তোমায়, কিন্তু পারে না। পেছনে হেঁটে আসে। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, অন্তত চা খেয়ে যাও।

না রে, দেরি হয়ে যাবে, এতটা পথ।

দীপন বোঝে বাবাকে আর কোনভাবেই এখানে কিছুক্ষণের জন্যেও আটকে রাখা যাবে না। র‍্যাকে রাখা কাবলি জুতা পরে নেন কৃষ্ণপ্রসাদ। সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে দীপনের দিকে ফিরে বলেন, ও, তোর অনুমতি না নিয়েই একটা জিনিস নিয়ে যাচ্ছি।

কী?

ফ্রেমে বাঁধানো ফটো তোর মায়ের, কাঁচ ভাঙা, ধুলো পড়া। খাটের তলায় পড়ে ছিল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

দীপনকে ঢেকে দিচ্ছিল বৃষ্টি-কুয়াশা, চেষ্টা সত্ত্বেও দীপনের ঝাপসা দৃষ্টি আর চিন্তাতরঙ্গ কিছুতেই এঁকে উঠতে পারেনা কতদিনের অদেখা মায়ের মুখ—শুধু অস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে থাকে শিকড়হীন গাছ, গাছেরা।

জড়ানো গলায় ডাক দেয় দীপন, বাবা!

সেতুর অন্ধকারে

তারপর?

ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর!

চোপ!

চুপ করে যায় সেতুর অন্ধকার কিংবা অন্ধকার চাপা-পড়া সেতু। বাতাসে কি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ?

আর তখন হয়তো বহুদূর থেকে—ব-হু-দূ-র! কত শত আলোকবর্ষ পেরিয়ে কে জানে, পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এক প্রকান্ড প্রস্তরখন্ড, আমরা এই গ্রহের বাসিন্দারা যার নাম দিয়েছি গ্রহাণু, যার জন্ম সাড়ে-চারশো কোটি বছর আগে।

আপাতত থাক সে কথা, পরে বলছি। এ গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র রতন এখন অন্ধকারময় সেতুর মুখোমুখি।

· রতন, বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ, বেশ লম্বা; রোগা, কালো, সামনের দাঁতগুলো একটু উঁচু, মুখময় পাতলা দাড়ি। তালিমারা, ফ্যাকাশে বহু ব্যবহৃত জিনসের প্যান্টের ওপর ফিনফিনে আধময়লা টি সার্ট, বাঁ হাতে কবজিতে কালো ব্যান্ডের সস্তার ইলেকট্রনিকস্ ঘড়ি, পায়ে মোটা হাওয়াই চপ্পল, যদিও তার এক পাটি একটু দূরে ঝোপের ভেতর উল্টো হয়ে পড়ে আছে।

ক্ষয়া নদীর ওপর সেতুটা তৈরি হয়েছিল, তা প্রায় বছর কুড়ি-বাইশ আগে। তখন অবশ্য নদী এমন ক্ষয়া ছিল না। এখন নদী না বলে কচুরিপানার মাঠও বলা যায়।

কংক্রিটের সেতুর উদ্বোধন ঘিরে সেই কুড়ি বাইশ বছর আগে দু'পারের মানুষের কী উদ্দীপনা! আবছা মনে করতে পারে কি রতন?

কে একজন মন্ত্রীমশাই এসেছিলেন উদ্বোধন করতে, রতন তখন কি ক্লাস ফাইভ নাকি সিকস?

সেতুর দক্ষিণ প্রান্তে ভাঙা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রতন, ক্ষয়া চাঁদের বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় সেতুর অন্ধকার যেন আরও রহস্যঘন হয়ে ওঠে। পূর্ত দপ্তরের তৈরি সেতুটা আজ প্রায় একমাস অন্ধকারে ঢাকা। শোনা যাচ্ছে, লাইন কেটে দিয়েছে বিদ্যুৎ পর্ষদ। কারণ দীর্ঘদিন বিল বাবদ অনেক টাকা নাকি বাকি, ওদিকে পূর্ত দপ্তর বলছে তারা বিল মিটিয়ে দিয়েছে। জট আর খুলছে না। কবে খুলবে জট? আশায় বাঁচে চাষা—আশা অনেকেই করছে আর খুব বেশি দেরি হয়তো হবে না, অন্তত কাশ্মীর-সমস্যার জট খোলার অনেক আগেই যে ঝামেলা মিটে যাবে এ বিষয়ে বেশিরভাগই একমত।

তা, মালতীর ঘর থেকে হালকা নেশার ঝিম পোহাতে পোহাতে রতন সেতুর ওপার থেকে এপারে এসে সিমেন্ট-খসা শিক-বের-করা রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে,

কার সঙ্গে? হতে পারে সে অন্ধকার চাপা-পড়া সেতু অথবা সেতুর অন্ধকার, নাকি অন্য কেউ? নাকি আসলে রতন আপন মনেই বকবক করে যায়? নাকি মালতি?

ও হ্যাঁ, মালতি সম্পর্কেও দু-চার কথা জানিয়ে রাখি। নদীর ওপারে সেতুর গোড়ায় মালতির ছোট্ট বাসা। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে থাকে। জন্ম এক হাড়-জিরজিরে ঘেয়ো সংসারে। বাপ বিহারের গয়া না মুঙ্গের কোথা থেকে যেন এসেছিল, স্টেশনের ধারে জুতো সারাইয়ের দোকান, বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে বাংলারই মানুষ হয়ে গেল। প্রায় এক ডজন ভাই-বোনের মধ্যে মালতিই ছিল সবার বড়। ভ্যানচালক হারানকে ...না, এ পর্যন্তই থাক, বাকিটা ধীরে ধীরে গল্পের ভেতর দিয়েই আমরা জেনে নেব।

তা, রতনের মনে হল, আবার মালতির ঘরেই ফিরে যায়। দু পা এগোতেই সেতুর অন্ধকারে কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাঁক দেয়, অ্যা-ই, কেরে?

আমি।

মালতি?

ধূ ধূ অন্ধকার। কাঁপা কাঁপা বিষণ্ণ জ্যোৎস্নাও আপাতত মেঘের থাবায়।

বাড়ি যাও বাবু।

কেন? কে আছে বাড়িতে?

ঘুমোও গিয়ে, অনেক রাত হল।

এ মালতি—

কী?

মালতি রে?

কী হল?

তুই আমার বউ হবি!

উত্তর নেই। গনগনে অন্ধকারে কাউকে আর দেখতে পায়না রতন।

ঢেকুরের সঙ্গে টকজলে উঠে আসে গলায়। মাথার ভেতর কেমন যেন পাক খায়। ধপ করে বসে পড়ে। তারপর হাত পা ছড়িয়ে শোয়।

শ্যাওলা স্যাঁতসেঁতে উইধরা প্রায়-ভেঙেপড়া একটা একতলা বাড়ি। ছোট্ট দুটো ঘর। কাঁচা নর্দমার গন্ধে একটা ঘরের জানলা খোলা যায় না, সারারাত মায়ের অবিরাম কাশির খকখক, বাপের হাহুতাশ। ভাল্লাগে না, শালার এই বাড়ি, জীবন...শুয়ারের মতো...

কোত্থেকে এক বাজনা ভেসে আসছে, কেমন যে গা ছম ছম করে রতনের। আজ কি শনিবার? লোকাল কেব্‌লে ব্লু ফিল্ম দেখাচ্ছে?

আপন মনে হাসে রতন, ছাদ ভেঙে পড়ছে অথচ ঘরে টিভি, কেবল লাইন এসবের ঘাটতি নেই। একবেলা উপোস দেওয়া চলে, কিন্তু টিভি ছাড়া চলে না!

কেব্‌লের ব্লু ফ্লিম দেখে অবশ্য কোন স্বাদ পায় না রতন, বরং ভাড়া করা ভিসিপিতে থ্রি

একস মার্কা বইগুলোতে খানিকটা গরম হয় শরীর।

আচমকা, মনে পড়ল, কয়েকমাস আগে এক রাতে কেব্‌লে ব্লু ফ্লিম দেখছিল, শব্দহীন, ভল্যুমটা জিরো করে দেওয়া, হঠাৎ দরজার ওপাশে খসখস, বোধ হল ফুটোতে কে যেন চোখ রেখেছে, কে? তা হলে কি...অসম্ভব নয়, বোনটারও বয়েস কম হল না, মেয়ে বলে কি তেষ্টা নেই, ওই শুকনো দুবলা চেহারা—বিয়ে তো এ জন্মে আর হবে না।

পেটে চিনচিনে ব্যথা। আলতো করে প্যান্টের হুক খুলে জামা তুলে হাত বোলায় রতন। কী মনে করে তড়াক করে উঠে বসে।

মালতি তোর হারান কি ফিরবে?

কে জানে!

কে উত্তর দেয়? এতো মালতীর গলা নয়, নাকি মালতিই, কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে রতনের।

মরদটা তোর ভালো ছিল, না রে?

উত্তরহীন অন্ধকারে একঝলক অস্থির বাতাস পাক খেয়ে যায়। তারপর কে যেন একটানা বিলাপের মতো বলে চলে, নাকি রতনই প্রশ্নকর্তা আবার উত্তরদাতাও?

খাটত, খাওয়াত, সোহাগ করত, আবার পিটত, যেমন হয় সব মরদেরা। ভ্যান টানত, রোজগার? তা ধর দিনে নবুই-একশো, কেটে যেত একরকম।

এ সবই জানা কথা রতনের। তবু কেন সে জিজ্ঞেস করে? জয়ার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি, জয়ার চলে যাওয়া—এ সব কিছুর সঙ্গে হারান আর মালতিকে কি সে মেলাতে চায়?

কেটে যেত এরকম—অন্ধকারে কথাটা ঘুরপাক খায়। আসলে যে কোন একরকমভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে কি সবাই পারে? চারপাশে অল্প হলেও কিছু মানুষের উপচে পড়া সুখ বৈভব দেখতে দেখতে মনটা কি বিদ্রোহ করে ওঠে না? মোটা ভাত কাপড়, যেমন তেমন একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই এই কোন একরকমের জীবন যাপনের অসন্তুষ্টি থেকে চুঁইয়ে পড়া বিস্ফোরকে ক্রমাগত ঠাসা হতে থাকে কি পৃথিবীর অন্তর?

অন্ধকার সেতু থেকে আবার ভেসে আসে—ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর!

এই হারানের কথাই ধর, রিকশা ভ্যান চালিয়ে তোর যা হোক তা হোক করে একরকম চলে যাচ্ছিল, না কি? কিন্তু তোর মাথায় ভূত চাপল, টাকা চাই, আরও অনেক টাঁকা চাই—আরও পরিশ্রমী হয়ে সৎভাবে ভ্যান চালিয়ে সেটা সম্ভব নয়, এতো শিশুও বোঝে। আর সততা, পরিশ্রম ইত্যাদি গুণের কীর্তনমূলক উপদেশগুলি ধর্মগুরুরা কেবল নিচুতলার গরীবগুলো মানুষগুলোকেই দিয়ে গেছেন—এটাই বা কেমন ধারা বিচার?

তাহলে হাতে থাকল শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লব। এখন নাকি সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি বা ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের যুগ! তা এসব ঠিক হারান বোঝে না, তাই ভ্যান চালানো ছেড়ে ভিড়ল্‌ গিয়ে স্মাগলারদের দলে!

আর হারান সম্পর্কে প্রলেতারিয়েত থেকে আধা লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত হওয়া রতন কী ভাবছে?

রতন আপনমনে হাসে, হাসতে হাসতে টলে পড়ে যায়, বলে, হারানটা বোকা ছিল, একদম শালা গাধার বাচ্চা! ভালো চোর ডাকাত হওয়া কি অত সোজা? গরীব মানুষ কি ভালো ডাকাত হতে পারে? বড়জোর রংদার দাদাদের বোড়ে হবি, আর একদিন না একদিন ঠিক খরচের খাতায় চলে যাবি! তুই কী করে হেক্কারবাজ ডাকাত হবি রে ঢ্যামনা? তুই কি কোম্পানির মালিক? তুই কি ভোটে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী হতে পারবি? কিংবা শহরে নার্‌সিং হোম খুলতে পারবি? কিংবা সামনে পেছনে লাল আলো লাগানো গাড়ি চড়ে হুশ বেরিয়ে যাওয়া অফিসার? ঘাপলা লাইনে গিয়ে শুধু শুধু বেঘোরে প্রাণটা গচ্চা দিলি!

সেতুর উপর লুটোপুটি খেতে খেতে আবার উঠে বসে রতন। প্যান্টের পকেট থেকে সরু পলিথিনের প্যাকেট বের করে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নেয়, তরলটা গলগল করে ঢেলে দেয় মুখের ভেতর।

অ্যাই মালতি, তোর হারান একটা ঢ্যামনা বুঝলি? ও আর ফিরবে না, কিছুতেই ফিরবে না, শুনে রাখ আমার কাছে ও শালা বর্ডারে বি ডি আর কিংবা বি এস এফের গুলিতে খরচা হয়ে গেছে!

মেঘে মেঘে থমথমে আকাশ। বাতাসের গায়ে মরচে। দূরে একপাল কুকুরের হল্লা। একটা সওয়ারিহীন রিক্‌শা দ্রুত ছুটে গেল।

তারপর, অন্ধকার ঢাকা সেতু হিসহিসিয়ে ওঠে, তুই কি কম ঢ্যামনা? তোর জয়া তোকে ছেড়ে গেল কেন?

চোপ, চোপ! শুয়ার কা আউলাদ! দানা ভরে দেব।

রেলিঙের ধারে উঁচু ফুটপাতের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে রতন। পেটের চিনচিনে ব্যথাটা বাড়তে বাড়তে বুকের ভেতর উঠে আসছে।

জয়া ছেড়ে যাবে না তো কী করবে? ধুঁকে মরবে? ঠিক করেছে। কারখানা বন্ধ হওয়ার পর দু বছর কীভাবে কেটেছে আমার। জানে কেউ?

তারপর তুই কত খাটলি, কারখানা খোলার আশা ছেড়ে ব্যবসা শুরু করলি, মন্দ চলছিল কি?

ব্যবসা! বাড়ি বাড়ি বিছানার চাদর ফেরি করে কত টাকা হয় রে? তখন জয়াকে নিয়ে যে বাড়িতে থাকতাম তার ভাড়া ছিল সাতশো টাকা, একটা খুপরি ঘর, বাথরুম-পায়খানা আরও দুই ভাড়াটের সঙ্গে কমন—খাওয়ার খরচা, বাচ্চার স্কুল, বইখাতা—

চলে যেত তো?

ধুর শালা। চলে গেলেই হল? কীভাবে চলছে সেটা দেখবি না? আমাদের কারখানার ম্যানেজারের কটা বাড়ি ছিল জানিস্?

কটা?

শুনেছি তিনটে—ওর সল্টলেকের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম, পাঁচটা কুকুর এ—ই তাগড়া, রোজ কত কেজি যেন মাংস খায় ওরা—শালা, আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাও—রাতজেগে কতদিন পাহারা দিলাম, গোটা কারখানা ঘিরে রাখলাম—

জয়া কার সঙ্গে ভাগল রে?

আই চোপ! কে রে তুই? যার সঙ্গেই ভাগুক, তোর কী রে?

জমাট বাতাস থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়ছিল। দূর থেকে ভেসে আসে—বল হরি, হরি বোল!

বাপটাও মরে না! বাড়িটা বেচতে পারছি না, বাড়ির আর যা হোক পজিশান তো ভালই, একদম রাস্তার ধারে, বাড়ি জমি মিলিয়ে তা ধর তিনকাঠা জমি—এক মাল, প্রমোটার, কিনবে বলছিল, মালকড়িও ভালো দেবে, কিন্তু বাপ বেচবে না কিছুতেই, শকুনের মতো আগলে রেখেছে বাড়িটাকে, শকুনটার কপালে একদিন ঠিক দানা ভরে দেব আমি।

বাড়ি যাও বাবু।

চমকে ওঠে রতন। মালতি, ঠিক তার মাথার কাছে।

কেন রে মালতি? কী করব আমি বাড়ি গিয়ে?

ঘুমোবে।

তোর সঙ্গে তোর ঘরে ঘুমোবো।

সে হয় না।

ঠিক আছে, কিছু নোট দেব না হয়।

পাগলামি কোর না।

হারান তোকে ভালোবাসত?

জানি না।

জয়া আমাকে একটুও ভালোবাসেনি, তা হলে ছেড়ে যেত কি বল? খারাপ সময় কি চিরকাল থাকে, বল?

বাড়ি যাও বাবু, রাত অনেক —সেদিনের মতো নাইটগার্ড বাবুরা এলে ঝামেলায় পড়ে যাবে।

গুম মেরে যায় রতন। পেটে হাত বোলায়। হঠাৎ উঠে বসে হড়হড়িয়ে বমি করতে থাকে।

গল্প এখন একটু বাঁক ফিরবে। সেই গোড়ায় বলা গ্রহাণুর প্রসঙ্গে আসা যাক।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটা খবর পড়েছিলাম পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে একটা প্রকান্ড গ্রহাণু, সৌরজগত তৈরি হওয়ার সময় গ্রহাণু নামক ওই প্রকান্ড প্রস্তরখণ্ড তৈরি হয়েছিল। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে একটি অক্ষরেখায় এরকম লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু অবস্থান করছে। একটি গ্রহাণু অক্ষচ্যুত হয়ে নাকি নামছে পৃথিবীর দিকে, আছড়ে পড়তে

পারে। ২০১৪ সালে। তাতে পৃথিবীর ক্ষতি কতটা? গ্রহাণুটির অভিঘাতের ক্ষমতা হিরোসিমায় যে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল তার ২ কোটি গুণেরও বেশি। তবে হ্যাঁ, আছড়ে পড়ার ব্যাপারটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এখনও পর্যন্ত সম্ভাবনার স্তরে, নিশ্চিত করে বলার সময় এখনও নাকি আসেনি, লক্ষ রাখছেন বিজ্ঞানীরা।

যেদিন এই খবরটা পড়ি, তার দু-একদিন পরেই রতনের সঙ্গে দেখা। রতনের সঙ্গে প্রথম দেখা যেদিন ও আমাদের বাড়ি চাদর ফেরি করতে এসেছিল। প্রতিদিন এরকম কোন সেলস্ম্যান আসেই, কেউ ধূপকাঠি নিয়ে কেউ বা কোম্পানির সাবান নিয়ে নানারকম। স্বাভাবিকভাবে মাঝে মাঝে বিরক্ত হই, এদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই নাছোড়, খারাপ লাগলেও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই।

রতন যেদিন এসেছিল, তার আগের দিনই আমার গিন্নি একটা বেডকভার কেনার কথা বলেছিল, তাই গিন্নিকে ডাক দিলাম, যদি পছন্দ হয়। দামের সঙ্গে মিলিয়ে গিন্নির পছন্দ হল। রতনের কথাবার্তা ভারি সুন্দর, কী করে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে নানারকম রিবেটের কথা বলে, একটা নয় দু-দুটো বেডকভার কিনিয়ে ছাড়ল। সেই থেকে রতনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। ওর বাস যদিও আমার শহরে নয়। কিন্তু আড্ডা ছিল আমাদের রেলস্টেশন চত্বরে, প্রায়ই দেখা হয়ে যেত। জানলাম পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত, তারপর আর এগোয়নি, সেটা কতটা দারিদ্র্যের কারণে আর কতটা ওর আগ্রহের অভাব সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। রতনের আড্ডার সাথীদের কয়েকজনের সঙ্গেও কথাবার্তা চলত আমার। অঞ্চলে তাদের মোটেই ভদ্রছেলে হিসেবে সুনাম ছিল না, তবে আমার সঙ্গে এদের আচার-ব্যবহারে কোন দিন খারাপ কিছু দেখিনি। ক্রমশ রতনকে আমি অনুসরণ করতে লাগলাম, কখনও ওর জ্ঞাতে কখনও অজ্ঞাতে। কেন? বলা বাহুল্য বলেই আর বলছি না।

তা, চায়ের দোকানে বসলাম ওকে দেখে, দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে গ্রহাণুর খবরটা বললাম ওকে।

শুনতে শুনতেই বিস্ময় ও অবিশ্বাস মাখা মুখটা ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এল।

বলল, তা হলে কি ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী?

হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে!

চায়ে চুমুক দেয় না রতন, গুম মেরে বসে থাকে।

আমি বললাম, কেন? ধ্বংস হয়ে যাওয়াই তো ভাল, যে ভাবে বেঁচে আছি তুমি আমি আমরা!

ভারী ম্লান হাসল রতন বলল, কী যে বলেন দাদা, আপনার আর আমার বেঁচে থাকার কি তুলনা চলে!

গ্রহাণু সংক্রান্ত খবরটা শুনে আমার স্ত্রী ও পুত্রের প্রতিক্রিয়াটাও জানিয়ে রাখি আপনাদের। দুজনেরই এককথা—১৩১৪! অত দেরি কেন, এখন হলেই তো বাঁচা যেত! স্ত্রী বলল—

তোমার হাত থেকে বাঁচতাম আর ছেলে বলল, স্কুল পড়াশোনা আর স্যারেদের হাত থেকে বাঁচতাম!

যাক সে সব, গল্পের পরিধি আর বাড়িয়ে কাজ নেই। বরং মালতি-বৃত্তান্ত আরেকটু জেনে নেওয়া যাক।

হারান নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর দুটো বাচ্চা নিয়ে রেললাইন ধারের ঝুপড়িতে দিন কাটাচ্ছিল মালতি। তিন-চার বাড়ি ঝি-গিরি করে কোনক্রমে একবছর চালানোর পর, মাছের গন্ধে যেমন বিড়াল বা কাঁঠালের খোঁজে মাছি—সেভাবেই মালতিকে খুঁজে নিলে একজন। অযত্নে অবহেলায় সার-জল ছাড়াও যেমন কিছু কিছু গাছ কিংবা আগাছা লকলকিয়ে বেড়ে উঠে দিব্যি টিকে থাকে, মালতিও এত অভাব দুশ্চিন্তাতেও শরীরের আঁটোসাঁটো আকর্ষণীয় গড়নটি হারায়নি তখনও।

চার নং বাড়িটির কাজ সেরে ফিরছিল মালতি শেষ-বিকেলের নিভু নিভু আলোয়, লোকটি মালতির সামনে এসে বলল, হারান আমায় চিনত, আমার নাম রাঘব।

মরদহীন অরক্ষিতা মেয়েদের সামনে-পেছনে এরকম অনেক ব্যাটাই ঘুরঘুর করে, ভাব জমাতে চায়, তাদেরই একজন মনে করে মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে দ্রুত পা চালিয়ে চলে আসতে চেয়েছিল মালতি, লোকটি তাড়াতাড়ি পথ আটকে দাঁড়াল, বলল, শোন, আমি তোর ভালো চাই, এভাবে কদিন চলবে, কাম করবি?

কাজের কথা শুনে একটু থমকে দাঁড়ায়, এভাবে কাজের কথা নিয়ে কেউ আসে না সচরাচর।

শোন, হারানের আশা ত্যাগ কর, ফিরলে এতদিনে সে ফিরত, বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে গেলে তোকে কাম করতে হবে,' হারান আমায় চিনত, বন্ধুই বলা যায় একরকম, তাই বলছিলাম...।

বিকেলের নিভু নিভু আলো প্রায় মুছে আসছিল, পুরোনো ভাঙাচোরা মন্দিরের পাশে ডোবার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে রাঘব ভারি আপনজনের মতো কথা বলে যাচ্ছিল, কৃষ্ণচূড়া তখন লালে লাল!

তারপর ঘনঘন আসতে লাগল, একদিন মালতির হাতে একমুঠো টাকা গুঁজে দিয়ে মালতির গা-গতর জরিপ করে ঠিক শিয়াল যেন বাঘের অভিনয় করছে এভাবেই মাথা নাড়িয়ে বলল, তিন-চার বাড়ি ঝি-গিরি করে আর কত পাস! লাইনে তার পাঁচগুণ পাবি!

সেই থেকে নিয়ম করে সপ্তাহে তিন-চারদিন দুপুর-বিকেল-রাতে কলকাতায় 'কাম' করে মালতি। রতনের সঙ্গেও সেইসূত্রেই আলাপ, জয়া ভেগে যাওয়ার পর চাদরের ব্যবসা ছেড়ে এখন রতন রাঘবের চ্যালা, রাঘব বলেছে, বাতাসে টাকা উড়ছে, প্রচুর টাকা, শুধু ধরতে জানতে হয়।

ওদিক রেললাইন ধারের ঝুপড়িতে থাকা ক্রমশ অসুবিধাজনক হয়ে উঠছিল মালতির,

কলকাতায় 'কাম' নেওয়ার পর থেকেই ঝুপড়ির পাশে ছোঁক ছোঁক করে ঘোরে এলাকার কিছু বখাটে ছোঁড়া, মালতির 'কাম' জানতে আর বাকি নেই তাদের।

কিন্তু পেশাটা কলকাতাতেই রাখতে চেয়েছিল মালতি, থাকায় জায়গা পর্যন্ত ছড়াতে চায়নি। তাছাড়া, মেয়েটাও বারো পেরিয়েছে।

তা রাঘবের কাছেই কথাটা পাড়ল মালতি, শুনেই এককথায় এই সেতুর পাশে নদীর ধারে নিরালায় টালি ছাওয়া দুকামরার ঝুপড়িতে বন্দোবস্ত করে দিল। বলল, কেউ তোকে ডিস্টার্ব করবে না, অঞ্চলের দাদা কেলে, শ্যামল, আমাদের র‍্যাকেটের লোক, সব বলে রেখেছি আমি, মাস গেলে দুশো টাকা ওর লোকের হাতে দিয়ে দিবি, ব্যাস।

এখন সেতুর অন্ধকারে রতন আর মালতি। একপাল কুকুর হল্লা করতে করতে ওপার থেকে এগিয়ে এসে থমকে যায় ওদের সামনে।

বমি করে মালতির কোলেই নেতিয়ে ছিল রতন, বিড়বিড় বকছিল কী যেন...মালতি বলে, ওঠ চল বাবু, আমার ঘরে না হয়...

ওঠার কোন লক্ষণ নেই রতনের, সেতুর ধারে রাস্তার ওপরে মালতির কোলে শরীরটাকে ছেড়ে রেখেই সে যেন পরম নিশ্চিন্ত।

দূরে হুইশিল, মানে বারোটা বেজে গেছে, ভারী বিব্রত বোধ করে মালতি, এত রাতে এখানে এভাবে—নাইট গার্ড, পুলিশ, কেলে শ্যামলের দলবল, যে কেউ এসে পড়তে পারে।

হু হু করে দুটো মোটর বাইক পাশাপাশি দৌড়ে যায়।

রতনকে ফেলে রেখেই কি চলে যাবে, তাই উচিত, না হলে হাজার ঝামেলা, কেউ বলবে রাস্তায় ব্যবসা ফেঁদে বসেছিস, কাল উঠে যাবি বাড়ি ছেড়ে, কেউ বলবে রতনকে মাগনায় সব দিচ্ছিস যখন আমারই বা কি বিলা করলাম, দে খাই, চেখে দেখি।

মালতির নিরুচ্চার আশঙ্কা কি বুঝতে পারল রতন, মালতিকে ছেড়ে সে আস্তে আস্তে উঠে বসল—যা, ঘরে চলে যা।

তুমি?

জানিস। আর কয়েক বছর পরে পৃথিবীটা—হাতের মুদ্রায় সে 'ধ্বংস' ব্যাপারটা বোঝায়।

ওমা, সে কি গো!

হ্যাঁ, খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

তা হবে, এত পাপ—ভগবান সব দেখছেন।

গ্রহাণু না কি একটা দমাদম আছড়ে পড়বে!

হায় ভগবান!

এতো ভগবান, ভগবান করিস না তো, ভগবান শুদ্ধ সাবাড় হয়ে যাবে—এর নাম গ্রহাণু!

হায়! বাচ্চাগুলানের কী হবে!

আমিও তাই ভাবি—আমার থেকে ওর ওপর জয়ার টান বেশি নিশ্চয়, মা তো!

তারপর, চেনা জীবনের গল্পটা কি একটু অচেনা হয়ে গেল?

রতন বলে, তোর মেয়ের বয়েস কত রে?

কত হবে বারো পেরুল।

বেশ বড় দেখায় রাঘবদা বলছিল—

খবরদার! ছিটকে ওঠে মালতি।

অ-নে-ক টাকা, এই অ্যা-তো টাকা! সুখে থাকবে তোর মেয়ে।

কেমন যেন মিইয়ে যায় মালতি। চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে যায়। সেতুটা নেই! শূন্য গহ্বরে থকথকে অন্ধকার! অন্ধকারকে আরও এক অন্ধকারময় আলোয় ভরে দিয়ে সেই শূন্যে ভেসে বেড়ায় নারী-পুতুল পুরুষ-পুতুল—ওড়ে বাহারি গাড়ি, সুস্বাদু হুইস্কি, কতরকমের পারফিউম, ঘড়ি জুতো জামা...

পৃথিবীর অন্তর থেকে গ্রহাণুর মতো ছুটে যাচ্ছে কত অসংখ্য অনু-পরমাণু মহাশূন্যে আর মহাশূন্যেব কৃত্রিম কক্ষপথ থেকে অন্ধকারে অবিরাম ঝরে পড়ে গুমরে উঠছে—ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর:

বিষমানব

সেনা ডাকতে হল শেষে।

হোটেল ঘিরে ভিড় থিকথিক, টিভি ও খবরের কাগজের লোকজন, প্রশাসনের ছোট-মাঝারি কর্তাব্যক্তিরা, এ ছাড়া উটকো জনতা তো আছেই।

সুরম্য পাঁচিল ঘেরা পাঁচতারা হোটেল। মাত্র দিন কয়েক আগে ক্যামেরা-কলম পিটিয়ে উদ্বোধন হল। এয়ারপোর্ট থেকে মোটরগাড়িতে যানজট মুক্ত রাস্তা হলে মিনিট তিরিশ লাগে।

পেল্লায় গেটের সামনে নীল উর্দি পরা রক্ষী। চমৎকার বাগান, ফোয়ারা, রাতে আলোর বাহার। হোটেলের স্থাপত্যও নাকি ফরাসি দেশের কোন বিখ্যাত প্রমোদ ভবনের অনুকরণে নির্মিত। দেশের গরীব-গুর্বো জনতার স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে আলোচনা, গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ব্যয়বহুল আলোচনার পক্ষে খুবই উপযুক্ত স্থান, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশ-বিদেশের বাঘা বাঘা নাম। পরিবেশ বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ওষুধ কোম্পানির পরিচালকবর্গ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাতব্বর, দু-একজন শিল্পপতি—পাঁচতারায়, যাকে বলে পঞ্চাশ তারার ছড়াছড়ি! উদ্বোধন করেছেন বিশিষ্ট এক মন্ত্রী মহাশয়।

বিকেল পাঁচটায় আলোচনা সভা শুরু হয়ে সবে ঘন্টাখানেক গড়িয়েছিল, এর মধ্যেই বিপত্তি। মন্ত্রী মহাশয় পাঁচবার হোঁচট খেয়ে পনেরো মিনিটের লিখিত ভাষণ পাঠ করে মঞ্চেই নরম গদিতে পা এলিয়ে বসেছিলেন। বিশিষ্ট এক পরিবেশ বিজ্ঞানী তাঁর আলোচনাপত্রটি পাঠ করার আগে ভূমিকা-ভাষণ দিচ্ছিলেন—'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এমন কি হাসপাতালেও পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলি মানা হয় না। বিশেষত সংক্রামক আবর্জনা সম্পর্কে সচেতনতার খুবই অভাব। যত্রতত্র ফেলে রাখা হয় এইসব আবর্জনা, যা থেকে হাসপাতালের কর্মীরা সহ হাসপাতালে আসা সমস্ত মানুষজনের মধ্যে নানা মারাত্মক সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন ধরুন ইনজেকশনের ছুঁচ, সিরিঞ্জ ...

মুখে হাত দিয়ে হাই চাপার চেষ্টায় ছিলেন মন্ত্রীমশাই। এমন সময় তার ব্যক্তিগত রক্ষীদলের প্রধান কানে কানে কিছু বলতেই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে শীততাপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত সেই কক্ষে মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের কানে কানে ছড়িয়ে কেমন এক অস্বস্তির বাতাস জমাট বেঁধে উঠল।

বিপত্তিটা কী? তা হলে বরং একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

হোটেল থেকে একটু দূরে রাস্তার ধারে পড়েছিল লোকটি। লোক বলা ঠিক হল কী? আসলে ঠিক কত বয়েস হলে মানুষ ছেলে থেকে লোক হয়ে যায়? তাছাড়া এ ব্যাপারে বয়েস কি বিচারের মাপকাঠি, নাকি বেশভূষা চলন-বলন ব্যক্তিত্ব?

এবার বোধহয় রামগড়ুরের ছানারাও হেসে ফেলবে, ব্যক্তিত্ব! যাকে নিয়ে কথা তাকে ঠিক মানুষ বলে ভাবতেই যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, তার আবার ব্যক্তিত্ব!

যাক গে সে সব কচকচি, কাজ চালাতে আমরা না হয় লোকই বলি। লোক যখন, একটা নামও তো থাকা দরকার, নাকি? তবে সে নামটাও মানানসই হওয়া চাই।

পলকা হাড়গুলো চামড়ায় ঢাকা, চামড়ার ওপর ময়লা ধুলোবালির পুরু আস্তরণ, মুখময় দাড়িগোঁফের জঙ্গল, জট-পাকানো লম্বা চুল, খালি গা, খালি পা, কোমরের কাছ থেকে ঝুলছে ছেঁড়াফাটা হাফপ্যান্ট—এ লোকটির নাম সুমিতাভ কিংবা রজতশুভ্র হওয়া চলে না নিশ্চয়, বরং ভুতো, কেলে, ন্যাংটা, হাঁদা, পচা, গুবরে, হনু ইত্যাদি নামই মানিয়ে যায়, নাকি?

নাম যখন জানা যায়নি আমরা বরং ওপরের যে কোন একটা নামে, ধরুন পচা—পচা বলেই ডাকি।

তা, পচা হাঁটতো একটু কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে, পায়ের আঙুলগুলো কুঁকড়ে থাকত, কিছুদিন ধরে তার ডান পায়ের পাতায় একটা জবরদস্ত ঘা হয়েছিল, মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চিৎকার করত। হোটেলের আশেপাশে রাস্তায় তাকে আজকাল প্রায়ই দেখা যেত। পচার জন্ম কোথায়, পেশা কী, থাকত কোথায়—এসব বরং পচার মুখ থেকে জেনে নিই আমরা। পচার একটা কাল্পনিক সাক্ষাৎকার নেওয়া যাক।

আচ্ছা, মিস্টার পচা আপনার জন্ম কোথায় এবং কবে?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে পচা, উত্তর দেয়না।

এই, এদিকে শোন, তুই কোথায় থাকিস?

পচা সন্দেহের চোখে তাকায়, তারপর সরে পড়তে চেষ্টা করে। হাতে একটা এক টাকার কয়েন বের করে দেখাতে থমকে যায়। কয়েনটা ছুঁড়ে দিতেই এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে নিচু হয়ে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। উলটে পালটে দেখতে দেখতে বাঁ হাতের মুঠোয় ভরে ফেলে।

থাকিস কোথায় তুই?

পচা এবার একমুহূর্ত চোখে চোখ রেখে নামিয়ে নেয়, বিড় বিড় করে কী যেন বলে, শোনা যায় না। তারপর হাত দিয়ে রাস্তা থেকে আকাশ সব দেখিয়ে দেয়।

তুই কি ঈশ্বর নাকি রে, রাস্তার ধূলিকণা থেকে আকাশ পর্যন্ত বিরাজ করছিস! শুনে পচা আবার ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

কী করিস তুই সারাদিন?

পচা হাত দিয়ে রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা দেখিয়ে দেয়।

সাক্ষাৎকার চালানো যাচ্ছে না আর, কারণ পচা এতগুলো প্রশ্নের উত্তরে একটি কথাও বলে নি। আমরা বরং পচাকে যারা চেনে, রাস্তাঘাটে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখেছে, তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই পচা-বৃত্তান্ত।

রাস্তার ধারে চায়ের দোকান মন্টুর, বছর তিরিশের যুবক, চা বানায় যত দ্রুত তার থেকেও দ্রুত কথা বলে।

লিকার না দুধ, কী দেব?

লিকার। হ্যাঁ ভাই, লোকটিকে চিনতেন?

কে লোক? কোন লোক? লোক নেই কেউ সব পোক!

ওই, যে লোকটা কাল সন্ধে থেকে একটু দূরে রাস্তার পাশে পড়েছিল।

দেখুন স্যার, খাটি খাই কোন ঝামেলাই নাই, লোক-টোকের খবর রাখিনা আমি।

ঝামেলার কী আছে?

আমরা গবীর মানুষ, পুলিশের সঙ্গে কথা বললেই ঝামেলা।

আরে বাবা, আমি পুলিশের লোক নই।

তা হলে কি স্যার খবরের কাগজ...নাম যদি না ছাপেন তো বলি। খুব বেশিদিন নয়, এই ধরুন মাসখানেক ওকে এ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখতাম। ব্যাটা পাগলা, ভবঘুরে। রাতে দোকান বন্ধ করার সময় কোন কোন দিন আসত এখানে, ভাঙা বিস্কুট, পাঁউরুটির টুকরো—এইসব পেলে খুশি হত। আমিও এসব দিয়ে বিদায় করে দিতাম তাড়াতাড়ি, ও কাছে আসলে বিচ্ছিরি গন্ধ পেতাম স্যার, ওর পায়ে একটা ঘা—ময়লা নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করত, হোটেলের পেছন দিকে যে ময়লা ফেলার ভ্যাটটা থাকতো ওখান থেকে খাবার-টাবার খুঁটে খেত।

রাতে থাকত কোথায়?

সে বলা মুশকিল! এখান থেকে খানিকটা দূরে রাস্তার ধারে কয়েকটা ঝুপড়ি আছে, বোধহয় ওখানেই কোথাও—

এর থেকে বেশি কিছু মন্টু জানাতে পারে না।

সুতরাং পচা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে ঝুপড়ির দিকে হাঁটতেই হয় আমাদের।

রেল লাইনের পাড়ে যে ধরনের ঝুপড়ি দেখা যায়, রাস্তার ধারের এই ঝুপড়িগুলো তার থেকে আলাদা। রেল লাইনের পাড়ে জলাজমি, ডোবা বুজিয়ে কিংবা ফাঁকা জায়গায় ঘর বানাতে তুলনায় একটু বেশি জায়গা পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও যেমন ধরুন নিউবারাকপুর থেকে মধ্যমগ্রামের মধ্যে দেখেছি ঘরের পেছনে লংকা কিংবা কুমড়ো গাছ, গাঁদা কিংবা দোপাটির চাষ। ঘরের সংখ্যা একের বদলে দুইও হয়, সঙ্গে রান্নার জন্যে এক ফালি। কিন্তু রাস্তার ধারের এই ঝুপড়িগুলো বড়ই ছোট, হাইট খুব কম, ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। বেড়ার বদলে পলিথিনের শিটের ব্যবহার বেশি। কোন জানলা নেই।

পর পর এরকম দশ-বারোটা ঝুপড়ি। বাসিন্দাদের জীবিকা সম্পর্কে যা জানা গেল তাহল এরা কেউ কেউ কাগজ, পলিথিন, শিশি-বোতল, নানা জায়গায় এসব কুড়িয়ে বেড়ায়। বিক্রি করে ওজন দরে। কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা, এমন কি হাসপাতাল বা

নার্সিং হোমের আবর্জনা থেকে কিছু কিছু জিনিস সংগ্রহ করে বিক্রি করে।

তা, পচা সম্পর্কে অবশ্য কেউ কিছু মুখ খুলল না। ভয়ে এরা সব সিঁটিয়ে আছে। ধারে কাছে এত গাড়ি, পুলিশ-মিলিটারি—তাদেরই ঝুপড়ির কাউকে নিয়েই এত গোলমাল, এ কথা কেউ স্বীকার করতে চাইল না। পচা সম্পর্কে না জানা গেলেও ওর এক ঝুপড়ি-তুতো ভাই, লখাই, তার সঙ্গে কথা বলে পচার জীবন-যাপন বিষয়ে কিছুটা ধারণা লাভ করার চেষ্টা করা যাক।

তা, বাপু লখাই, তুমিও কি কাগজ কুড়াও?

আজ্ঞে, শুধু কাগজ নয়, যা পাই সব।

জন্ম কোথায় তোমার?

লিচ্চয় করে বলতে পারি না, বোধ হয় শ্যালদা ষ্টেশনে।

ঝুপড়িতে কি তুমি একাই থাক?

আজ্ঞে স্যার, এত পোস্‌নো কোচ্ছেন—সত্যি বলছি, চুরি-ডাকাতির মধ্যে নেই আমি, মা কালীর কিরা!

ভয়ের কিছু নেই ভাই, আসলে তোমাদের সম্পর্কে একটু আধটু জানতে চাইছি।

সত্যি বলছি সার, এখানে চুরি-পকেটমারির একটাও কেস পাবেন না!

আরে না—সে কথা কি বলেছি আমি?

দেখেন সার, আপনি এসছেন, দু-চারটে মন্দ লোক যা ছিল, সব ভেগে পড়েছে।

কেন?

যদি ধরে হাজতে ভরে দেন, আপনাদের চোর-ডাকাত কম পড়লে তো এখান থেকেই—

আরে বাবা, প্রথমেই বললাম তো আমি পুলিশের লোক নই, তোমার কোন ভয় নেই। কাগজ ছাড়া আর কী কুড়াও?

আজ্ঞে, পলি প্যাকেট, শিশি, ছেঁড়া কাপড়, পিচবোর্ড, মিষ্টির দোকানের বাক্স—যা পাই।

ইনজেকশনের সিরিঞ্জ?

চুপ করে যায় লখাই। সম্ভবত এ প্রশ্নে কোন বিপদ আঁচ করে। তারপর মাথা নেড়ে, না সার, ওসব কুড়োইনা আমরা।

লখাই গুম মেরে যায়, প্রশ্নের উত্তর দিতে আর কোন উৎসাহ দেখায় না, শেষে বলে, আমার কাজ আছে, আমায় ছেড়ে দেন সার!

তা, যে বিপত্তির কথা শুরু হয়েছিল, সেখানেই বরং ফিরে যাই আমরা।

হ্যাঁ, হোটেলের থেকে একটু দূরে রাস্তার ধারে আগের দিন সন্ধে থেকেই পড়ে ছিল পচা। ঝিরঝির বৃষ্টি ছিল, কুণ্ডলী পাকানো দেহটা নিথর। সারারাত, পরের দিন বিকেল পর্যন্ত ওভাবে ওখানে। হোটেলে গণ্যমান্য অতিথিরা যেহেতু এ রাস্তা দিয়ে আসবেন না,

তাঁরা আসবেন উল্টো দিক থেকে, তাই শৃঙ্খলারক্ষী বাহিনীও ব্যাপারটিতে নজর দেয় নি।

বিপত্তি বাধার পর, পুলিশ রিপোর্টে নাকি পচা সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য বিবরণ জানা গেছে। অবশ্য কলকাতার কিছু ছিটেল লোকের কাছেই সে রিপোর্টের কপি পৌঁছেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে 'রাস্তার ধারে পড়ে থাকা লোকটি খুব বিপজ্জনক এক সন্ত্রাসবাদী'।

যদিও এই সন্ত্রাসবাদীর নাম, ঘাঁটি, কী উদ্দেশ্য এবং কাদের নিয়ে সে সন্ত্রাস ছড়াতে নেমেছে সে সম্পর্কে এই রিপোর্টে বিশেষ কোন আলোকপাত করা হয় নি। তবে বলা হয়েছে, সে আগের রাতে বৃষ্টির সঙ্গে এবং রাস্তার ধারের ধুলো আবর্জনার সঙ্গে রহস্যজনক কথোপকথন চালিয়েছে। সে সব কথোপকথনের কিছু কিছু অংশ ধরা পড়েছে পুলিশ ওয়ারলেসে, প্রথমে তা এক পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিলেও এখন অবশ্য তার সাংকেতিক পাঠোদ্ধারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আবর্জনা, ধুলো-ময়লার সঙ্গে তার কথোপকথনের অংশটি নাকি এইরকম—

আমায় মেরে ফেললি?

মারব কী রে, তুই তো মরেই আছিস।

তোদের ঘিরেই তো বেঁচে ছিলাম আমি।

বটে!

ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, ছুঁচ, ছুরি, ব্লেড সব কুড়োতাম হাসপাতালে নার্সিং হোমে—কিছু পয়সা হত।

বটে! তা অকারণ ধুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতিস কেন?

ভয়ে, ধুলো কাদা মেখে ঘুরে বেড়ালে পাগল ভেবে ছেড়ে দেবে, কেউ কিছু বলবে না, তারপর পায়ে এই ঘা-টা হল, সেটা নিয়ে বাবুদের কাছে গেলেই তাড়ানোর জন্যে পয়সা ছুঁড়ে দিত বাবুরা।

ওই ঘা-ই তোকে মারল!

তোদের মধ্যে থাকতে থাকতেই আমার মরণ!

যে বাঁচায় সে-ই তো মারে, জানিস না!

আমার বাঁচতে বড় সাধ!

অনেকদিন বাঁচলি, আবার কী!

মানুষেরা এর থেকে ঢের ঢের বেশিদিন বেঁচে থাকে।

তুই কি মানুষ? মানুষের মতো দেখতে হলেই কি মানুষ হয়?

তা বটে। তবে কী আমি? কোন জানোয়ার?

তুই তো আমাদেরই মতো ময়লা, আবর্জনা।

তাই?

শুধু কি তাই? তুই মরণ ছড়াস, টিটেনাস, হেপাটাইটিস, এইডস্—আরও কতশত রোগ!

বেশ করি, আরও করব, আমি মরব আর মারব।

রিপোর্টে আশংকা করা হয়েছে, বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীটি সম্ভবত জীবাণুযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও শক্তিশালী কোন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক।

বৃষ্টির সঙ্গেও তার কথোপকথন রিপোর্টে লিখিত হয়েছে, সে কথায় আসছি পরে। হোটেলে আলোচনা সভা শুরু হওয়ার পরেই বাইরে যে ঘটনা ঘটেছিল, যা নিয়ে এত কাণ্ড, শেষে সেনাবাহিনী ডাকতে হলে, সে ঘটনাটা বলা যাক এবার।

রাস্তার ধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা সন্ত্রাসবাদী বা আমাদের পচা সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে একটু ফুলে উঠেছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে আরও ফুলে উঠতে লাগল। জনবহুল রাস্তা নয়, সেভাবে নজর করেনি কেউ, তা ছাড়া পাশেই বেশ কিছু আবর্জনার পাহাড় জমেছিল, দু'চারজন হয়তো পচাকেও আবর্জনার অংশ ভেবে নিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে এগিয়ে গেছে।

অথচ ঠিক বিকেল পাঁচটায় ফুলে ওঠা ওই শরীরটা উঠে দাঁড়ালো। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত, পুঁজ। চোখ নেই, নাক নেই, শুধু কয়েকটা ফুটো মাত্র।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে। প্রথম যে রক্ষী তাকে দেখল, সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে সরে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় এগিয়ে এল এক সার্জেন্ট, মোটর-সাইকেলে হেলান দিয়ে হোটেলের গেটের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বীভৎস মূর্তিটি দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণেই টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে সেই মূর্তি নাকি বিষমানবের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক মারতেই—বিষমানবের নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে আসা বিষ-নিঃশ্বাসে শরীর পাথর হয়ে গেল, নট নড়নচড়ন।

গেট খুলে অবলীলায় হোটেল চত্বরে ঢুকে পড়ে, সামনে এসে কে আর বাধা দিতে সাহস করে! গুলি চলে, পেছন থেকে, ফোয়ারার আড়াল থেকে, গাছের আড়াল থেকে।

অথচ কী আশ্চর্য! গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও আবার উঠে দাঁড়ায় সে বিষমানব, তার নাক-মুখের কোটর থেকে বেরোয় বিষাক্ত কালো গ্যাস! ঘন্টা বাজিয়ে ছুটে আসে হোটেলের নিজস্ব দমকল বাহিনী, ওয়ারলেসে খবর পেয়ে ছুটে আসে কয়েক ভ্যান পুলিশ, তবু সেই বিষমানবকে দমানো যায় না।

সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, কিছু সময় যেতেই টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে আবার।

সেনাবাহিনীকে খবর দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার ছিল?

বিষমানব কি ঢুকে পড়তে চেয়েছিল শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের সেই আলোচনাসভায়? দেশের গরীব জনতার স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার আলোচনায় সে কি বলতে চেয়েছিল কিছু? এ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে, টি ভি চ্যানেলে অবশ্য নানারকম জল্পনার শেষ নেই।

আর বৃষ্টির সঙ্গে পচা অথবা বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীর কথোপকথন?
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
বিষ ঢালছি মেপে।
হায় বৃষ্টি! তোর শরীরেও বিষ!
বাতাসে বিষ, জলে বিষ, আকাশে বিষ আর—
আর?
আর মানুষের মনের মধ্যে বিষ!
বাপরে!
মনের মধ্যে লোভের থলি, থলির মধ্যে বিষের খনি!
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে/বিষ দেব মেপে!
তারপর শুধুই বৃষ্টির শব্দ—টিপটিপ, ঝিরঝির, ঝরঝর।